কাচের দেওয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির আজ আঠারো।
আঠারো বছর বয়সটা বৃষ্টির কাছে এল সুকান্তর সেই কবিতার থেকেও যেন আরও দুঃসহ, আরও স্পর্ধিত এক চেহারায়। এল অদ্ভুত এক খেলার প্ররোচনা হয়ে।
মাকে না-মানার, বাবাকে যাচাই করার একরোখা এক খেলা। সেই খেলাতেই মাতবে এবার বৃষ্টি।
সেই বৃষ্টি, বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় জিতে যাকে নিজের হেফাজতে রাখাবার অধিকার অর্জন করে নিয়েছিল মা জয়া রায়। সেই বৃষ্টি, আলিপুর জজকোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যার বাবা সুবীর রায় শাসিয়েছিল জয়াকে— দেখে নেব, মেয়ের আঠারো বছর বয়স হলে কীভাবে তাকে তুমি আটকে রাখতে পারো।
সেই বৃষ্টির আজ আঠারো।
একদিকে আঠারো বছরের বৃষ্টি অন্যদিকে সম্পর্কছিন্ন দুই নরনারী ; একদিকে অনন্য জীবন, অন্যদিকে নিজেদের মতো করে সেই জীবনের মানে খুঁজে-ফেরা একদল মানুষ— এক আশ্চর্য টানাপোড়েনের টানটান কাহিনী 'কাচের দেওয়াল'। যেমন জোরালো কলম সুচিত্রা ভট্টাচার্যের, তেমনই বিরলস্বাদ এই উপন্যাস। সাম্প্রতিক হয়েও চিরন্তন।

আমার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com
ISBN 81-7215-221-3

জন্ম : মামার বাড়ি ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬।
পিত্রালয় : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। এখনও দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা।
পেশা : চাকরি।
এর আগে প্রকাশিত দুটি উপন্যাস : আমি রাইকিশোরী। যখন যুদ্ধ।
গল্পগ্রন্থ : রূপকথার জন্ম।
ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ। অবশ্য লেখালেখি শুরু করেছেন সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসটি বেরিয়েছে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে।
মেয়েদের হয়ে মেয়েদের নিজস্ব জগতের কথা, তাদের নিজস্ব যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথাই লিখতে আগ্রহী। লেখাতে বারবারই ঘুরে ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, নানান জটিলতা।

আমার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com
প্রচ্ছদ □ অনুপ রায়

কাচের দেওয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাচের দেওয়াল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা
প্রয়াত ধীশঙ্কর ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিল জয়া। এ সময়টা তার ধ্যানের সময়। প্রতিদিন এভাবেই চোখ বুজে শুয়ে নিজেকে খনন করার চেষ্টা করে সে। কাল রাত থেকে একটা ছবি ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না মাথায়। কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কোথায় যে ফাঁকটা? কোথায়? ছবির বিন্যাসে? না রঙে? নতুন করে কল্পনায় রঙগুলোকে সাজাতে চাইছিল জয়া।

ভেতরের প্যাসেজে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাজছে। বেজেই চলেছে।

ঘোর অন্যমনস্কতায় জয়ার প্রথমটা মনে হল বাইরের দরজায় কলিংবেল বাজাচ্ছে কেউ। একবার দুবার শোনার পর ভুল ভাঙল। এত সকালে কে ডাকছে টেলিফোনে! দিনের শুরুতেই বাইরের লোকের ডাকাডাকি জয়া একদম পছন্দ করে না।

ধাতব ঝংকার তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। ফোনটা কেউ ধরছে না কেন? সুধা গেল কোথায়? বিরক্ত মুখে জয়া বিছানায় উঠে বসল। নিজের অজ্ঞাতেই চোখ চলে গেছে পুরনো জার্মান দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। সাতটা দশ। মানে সুধা বাজারে। সকালে কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে বাড়ির বাজার সেরে ফেলে সুধা। বাবলুর ঘুম ভাঙলেও ভাঙতে পারে কিন্তু সকালে ধরে বসিয়ে না দিলে নিজে থেকে উঠতে নড়তে পারে না বাবলু। আর বৃষ্টি তো উঠবেই না!

শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নিয়ে জয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যথেষ্ট বিরস মুখে রিসিভার তুলেছে,

—হ্যালো!

ও প্রান্ত মুহূর্তের জন্য নীরব। মুহূর্ত পরে স্বর ফুটল,

—আমি সুবীর। সুবীর বলছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ এত সকালে সুবীর কেন ! জয়া সামান্য থমকাল ! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে। আজ বৃষ্টির জন্মদিন। প্রতি বছরই জন্মদিনে মেয়ে ঘুম থেকে ওঠার আগে সুবীরের ফোন আসে।

—বৃষ্টি ওঠেনি এখনও ?

জয়ার বুকের ভেতরটা কোন কারণ ছাড়াই কেন যে হু হু করে উঠল ! সক্কালবেলা আচমকা সুবীরের গলা শুনল বলেই কি ! নাকি আজ বৃষ্টির জন্মদিন বলে ! জয়া ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। একেক সময় নিজের মনকেও কেন যে এত অচেনা লাগে ! সংযত হতে সময় লেগে গেল বেশ কয়েক সেকেন্ড, তবুও গলার ভারী ভাবটাকে কাটানো গেল না,

—ধরো দেখছি। মনে হয় এখনও ঘুমোচ্ছে।

কথাটা বলেও একটুক্ষণ রিসিভার কানে ধরে রইল। আর কিছু কি বলবে সুবীর ? কিছু না হোক, নিছক কুশল জিজ্ঞাসা ? ছোট্ট দুটো শব্দ, কেমন আছ ? দুজন পরিচিত মানুষের সাধারণ সৌজন্য বিনিময় ? নাহ্, জয়া টেলিফোন ধরলে কখনই অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না সুবীর। দরকার ছাড়া একটি বাক্যও অপচয় করে না। কবেই বা করত ? চিরকালই তো এরকম আত্মসর্বস্ব।

জয়া নিঃশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল। গোটা বাড়ি ঘুমোচ্ছে অঘোরে। নিঝুম। এত নিঝুম যে নিজের নিশ্বাসের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায়। ঘর দিয়ে চতুর্দিক চাপা বলে ভেতরের এই প্যাসেজটাতে এমনিতেই আলো কম। দরজা জানলা সব খোলা থাকলে তাও একটু উজ্জ্বল লাগে। ছোটখাটো হলঘর সাইজের এই প্যাসেজটা বাবা মা বেঁচে থাকাকালীন ফাঁকাই থাকত। এখন জয়া নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। অনুজ্জ্বল বলে বেশি কিছু রাখেনি। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিলে চাইনিজ পেন্টিং করা একটা মাত্র চিনামাটির ফুলদানি। এধার ওধারে ছড়ানো পেতলের পট হোল্ডারে বাহারী জুনিপার, জেড, মনেস্টেরিয়া। সব একটা করে। দেওয়ালে ওল্ড মাস্টারস প্রিন্ট একটাই। ভ্যান গখের সূর্যমুখীর খেত। হঠাৎ তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায় এমন হলুদ। এই ছবিটার জন্যই জায়গাটা খানিকটা যা উজ্জ্বলতা পেয়েছে।

নিখিল সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গ করে,

—তোর এই একটা একটা করে সব কিছু রাখার ওপর ফ্যাসিনেশানটা কবে যাবে বল তো ? এখনও এত একাকিনী শোকাকুলা ভাব কেন ?

এত দিনের পুরনো, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও, নিখিল যে কেন এমন খোঁচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারে হঠাৎ হঠাৎ ! জয়া রেগে যায়,

—এটা যার যার পারসোনাল চয়েস্। এর মধ্যে অন্য ইঙ্গিত আনছিস কেন ?

বলে বটে, কিন্তু অন্তরে যেন নিখিলের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। অতীত তো একটা না একটা ছায়া ফেলবেই মানুষের ওপর। ইচ্ছে করলেই বা সেই ছায়াকে মুছে ফেলা যায় কই !

প্যাসেজ টপকে মেয়ের ঘরের ভেজানো দরজার পাল্লা ঠেলতেই জয়ার বুক ধক করে উঠল। বৃষ্টি ঘরে নেই।

চোখের সামনে শুধুই সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল একটা ঘর। আধো আলো আধো ছায়ায় ঘরময় যেমন তেমন ছড়িয়ে বৃষ্টির বইখাতা, গানের ক্যাসেট, জুতো। কাঠের বাক্সের ডালায় অজস্র জামাকাপড়ের অগোছালো স্তূপ। রঙিন সুজনি ঝুলছে খাট থেকে। সুবীরের কিনে দেওয়া বিদেশী ওয়াকম্যান বিধ্বস্ত বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে গোটা ঘর যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে কোন অপরিচিত দস্যু।

জয়ার ত্রস্ত চোখ নির্জন ঘরে পাক খেল কয়েক বার। ঘর জুড়ে, ওয়াড্রোবের গায়ে, দেওয়ালে, দরজায় সর্বত্র সারি সারি রঙিন পোস্টার। হাস্যমুখ বরিস বেকার, কপিলদেব, সুন্দরী ম্যাডোনা, ছলনাময়ী সামান্থা ফক্স, শচীন তেন্ডুলকার, গিটার হাতে জর্জ মাইকেল। এছাড়াও আছে আরও অনেকে, জয়া তাদের চেনে না। পোস্টারে পোস্টারে চারদিকের দেওয়াল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই প্রিয় মানুষদের বিচিত্র পোস্টার লাগানোর কি যে নেশা মেয়েটার !

বৃষ্টির বিছানার পাশের টেবিলে মস্কিউটো রিপেলেন্টের লাল চোখ স্থির জ্বলছে। পশ্চিমের জানলার পেলমেট থেকে ঝোলা ভারী পর্দা দুটোর গায়ে, বন্ধ কাচের শার্সিতে প্রভাতী আলোর আভাস। মন কেমন করা স্মৃতির মত। মনোরম কিন্তু বিষণ্ণ।

আবছা আলো, রঙিন পোস্টার, সবুজ পর্দা সব মিলিয়ে পুরো দৃশ্যটার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। কিন্তু জয়াকে এই মুহূর্তে তেমন করে টানতে পারল না ছবিটা।

গেল কোথায় মেয়েটা ! এ সময় ঘুম থেকে ওঠে না তো কখনও ! দ্রুত ভেতরের প্যাসেজে ফিরে জয়া বাথরুমের দিকে গেল। বাথরুমের দরজা খোলা ; বৃষ্টি সেখানেও নেই। বেরিয়েছে কোথাও, নাকি ছাদে উঠেছে ! এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন পর্যন্তও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদে একা দাঁড়িয়ে থাকত মেয়ে।

জয়া রাগারাগি করত, —লেখা নেই, পড়া নেই, যখনই দেখি বৃষ্টি ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা ওকে একটু বকাবকি করতে পারো না মা ?

মৃণ্ময়ী বলতেন, —সব সময় খিচখিচ করিস না তো। লেখাপড়া তো করেই, নইলে ভাল রেজাল্ট করছে কি করে ? ওখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখতে ভালবাসে, তাও বন্ধ করে দেব ?

আজকাল সেই মেয়ে বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ যে চারপাশের পৃথিবীতে চোখ বোলাবে ! একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই তো ছাদে ওঠার অভ্যাস চলে গেছে। এখন বাড়িতে থাকলেই সারাক্ষণ ঝমঝম করে বিদেশী বাজনা চালায়, নয়ত স্নায়ু টানটান করা ইংরিজি থ্রিলার পড়ে। এখনকার ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে নরমসরম ব্যাপারগুলোই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিও তার ব্যতিক্রম হল না। অথচ জয়ার বাবা মা মারা যাওয়ার আগেও এই মেয়ে কত নিরীহ ধরনের ছিল, কত শান্তও। কবে থেকে যে বদলে গেল বৃষ্টি ! জয়ার বাবা মা দুজনেই পর পর মারা যাওয়ার পর থেকে ! না সুবীর বিয়ে করার পর ! জয়া ঠিক ঠিক নজর করে উঠতে পারেনি। বদলটাই মাঝে মাঝে বড় চোখে লাগে তার। মেয়ের ভাবভঙ্গিতে ইদানীং কেমন যেন চাপা উগ্রতা।

ছাদে উঠতে গিয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ টাঙানো নিজের আঁকা পুরনো ল্যান্ডস্কেপটায় চোখ পড়ে গেল জয়ার। ছবিটাতে বেশ ধুলো জমেছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে সুধা কিছুই লক্ষ করে না। আজ একটু সুধাকে বকাবকি করা দরকার। এত অযত্ন কেন ! এত অবহেলা !

ছাদে উঠেই জয়া বৃষ্টিকে দেখতে পেল। আলসেতে ভর দিয়ে আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে সামনের পার্কের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়ে। ক্ষণিকের জন্য জয়া স্থির। বিহ্বল। মা নয়, যেন এক অপরিচিত নারী অন্য এক পরিপূর্ণ রমণীকে দেখছে। বিশাল আকাশের নীচে, ছাদে একা দাঁড়িয়ে থাকা ওই যুবতী কি জয়ারই মেয়ে ! পিছন থেকে কী বড়সড় লাগছে বৃষ্টিকে !

জয়া আড়ষ্ট গলায় ডাকল, —বৃষ্টি, তোমার ফোন।

বৃষ্টি শুনতে পেল না।

জয়া আবার বলল, একটু জোরে,

—অ্যাই বৃষ্টি, তোর বাবার ফোন এসেছে।

বৃষ্টি ঘুরে তাকাল। দৃষ্টি উদাস, ভাবলেশহীন। জয়া অবাক। বাবার নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনলেই তো মেয়ের মুখ চোখ ঝলমল করে ওঠে ! আজ ব্যাপার কি !

ধীর পায়ে বৃষ্টি সিঁড়ি দিয়ে নামছে, পিছন থেকে মেয়েকে দেখছিল জয়া। মেয়েটা তার ভারী সুন্দর হয়েছে। নরম। গোলাপি। মাথাভরা থাক থাক চুল। কালো চোখের পাতা। ছোট্ট চিবুক। ফোলা ফোলা গাল। অনেকটা রেনোয়ার পেন্টিং-এর মত। গড়নটাই যা একটু রোগাটে ; বেশি লম্বা নয় বলে ততটা রোগা লাগে না অবশ্য।

সুবীরের মা বলতেন, —নাতনি আমার বৌমার গড়ন পাবে, মুখ গায়ের রঙ সুবীরের।

জয়ার বাবা প্রিয়তোষ খুব মজা পেতেন শুনে, — কী করে যে আপনারা ওইটুকু বাচ্চার মুখ গড়ন কেমন হবে বুঝে ফেলেন ? আমার তো বাবা ওইটুকু শিশুদের সবাইকেই একরকম লাগে।

ওইটুকু শিশু দেখতে দেখতে কবে এত বড় হয়ে গেল ! এই তো সেদিন তিলে তিলে তৈরি হল জয়ারই শরীরের মধ্যে। অদৃশ্য তুলি দিয়ে জয়া মেয়ের চোখ এঁকেছে, মুখ এঁকেছে। লেওনার্দোর মোনালিসার থেকে তার সৃষ্টিই বা কম কিসে !

সেই বৃষ্টি এক দুই তিন করে আজ পুরো আঠেরো।

আঠেরো ! আঠেরো শব্দটা ঝন করে মস্তিষ্কে বেজে উঠল কেন ?

আলিপুর জজ কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে জয়াকে শাসিয়ে ছিল সুবীর, —দেখে নেব। দেখে নেব, মেয়ের আঠেরো বছর বয়স হলে কিভাবে তুমি তাকে আটকে রাখতে পারো।

সুবীরের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই-এর পর সেদিনই সদ্য কাস্টডির মামলার রায় বেরিয়েছে। হিংস্র আক্রোশে পরস্পরের দিকে প্রকাশ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি সেদিনই সবে শেষ।

সুবীরের উকিল বলেছিল, —মি লর্ড, এই ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এঁর পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা কত ? দুই ? পাঁচ ? দশ ? মনে হয় কড় গুনেও উনি শেষ করতে পারবেন না। উনি যখন স্বামীর বিনা অনুমতিতে মেয়ে ফেলে বিদেশ চলে গিয়েছিলেন তখন কজন পুরুষ বন্ধু ওনার সঙ্গী ছিল ? মেয়ের জন্য উনি দিনে কতটা সময় খরচা করেন ? আর কতটাই বা নিজের আঁকাঝোকার জন্য ? ছবি এঁকেই বা ক পয়সা ওনার রোজগার যে মেয়েকে প্রপারলি মানুষ করতে পারবেন বলে দাবি করছেন ?

জয়ার উকিলও কম যায়নি, —মি লর্ড, আমার মাননীয় বন্ধু আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লায়েন্টের বিদেশ যাওয়ার কথা তুলে অশোভন ইঙ্গিত করছেন। উনি বাইরে গিয়েছিলেন মাত্র দু মাসের জন্য, ছবির এগজিবিশন করতে, বিদেশী সরকারের ডাকে, ভারতের ডেলিগেট হয়ে যা কিনা যে কোন শিল্পীর কাছে খুবই সম্মানের ব্যাপার। মেয়েও সে সময় আমার ক্লায়েন্টের বাবা মার কাছে অতি আদরেই ছিল। আসলে ওই ভদ্রলোকই স্ত্রীর খ্যাতি, যশ, প্রতিভাকে সহ্য করতে পারেননি। ওনাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো কদিন উনি মদ্যপান না করে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন ? স্ত্রীকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে মেয়ের সামনে কোন আদর্শ স্থাপন করেছেন ? ঈর্ষাকাতর, মদ্যপ বাবার কাছে থাকা ভাল ? না দাদু-দিদার ছায়ায় থেকে শিল্পী মায়ের কাছে বড় হওয়া ভাল ?

তিক্ত সেই মামলায় জিতে পাওয়া মেয়ে আজ পূর্ণ যুবতী। বৃষ্টি নীচে এসে ফোন ধরেছে, জয়া একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বাপ মেয়ের কথা শোনার চেষ্টা করল। ডাইনিং টেবিলের কাছে রাখা রবার গাছের পাতা দেখার ভান করে ওদিকেই কান সজাগ।

বৃষ্টি একবার পিছন ফিরে জয়াকে দেখে নিল। বেশ নিচু গলায় কথা বলছে। যেন মাকে লুকিয়ে গোপন কথা সেরে নিচ্ছে বাবা নয়, নিষিদ্ধ কোন পুরুষের সঙ্গে। সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল না জয়া। টুকরো টুকরো দু একটা বাক্য কানে এল মাত্র।

...তুমি একা কিন্তু।

...দুপুরে হবে না। বিকেলে। আফটার ফাইভ।...

...কলেজেই এসো। কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং-এ।

নিম্ন স্বরে বললেও বৃষ্টির কথাবার্তা স্পষ্টতই কাঠ কাঠ। নির্লিপ্ত। কথা বলতে বলতেই দুম করে ফোন কেটে দিয়ে হনহন করে ঢুকে গেল বাথরুমে।

আশ্চর্য ! বাবার সঙ্গে তো এভাবে কথা বলে না বৃষ্টি ! জয়ার মনে পড়ল গত বছরও জন্মদিনে সুবীরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সন্ধের মধ্যেই বৃষ্টি বাড়ি ফিরে এসেছিল। জয়া জিজ্ঞাসা করেছিল,

—তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে ?

জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়ে।

সুবীরের সম্পর্কে কোন কথাই কখনও জয়াকে এসে বলে না বৃষ্টি। জয়ার মতই চাপা অন্তর্মুখী হয়েছে। এমনকি সুবীর যে আবার বিয়ে করেছে সে কথাও বৃষ্টির মুখ থেকে বেরোয়নি কোনদিন। ছেলে হওয়ার খবরও না। জয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছিল শিপ্রার কাছ থেকে। শিপ্রার দাদা সুবীরের কলিগ।

জয়া জুনিপার গাছের টবের দিকে এগিয়ে গেল। গোড়ার মাটি শক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ছোট্ট একটা লোহার শিক তুলে জয়া গাছটার গোড়া খোঁচাতে শুরু করল। বাবার ওপরও টান কি তবে কমে যাচ্ছে বৃষ্টির ? অথচ এই মেয়েই কী ছটফটই না করত বাবার জন্যে ! কোর্টের রায়ে সপ্তাহে একদিন মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পেয়েছিল সুবীর। একদিনই। রবিবার এলেই মেয়েও সকাল থেকে সেজেগুজে তৈরি। গাড়ির হর্ন শুনলেই ছুট্টে বেরিয়ে যেত বাইরে,

—বাবা এসেছে। আমার বাবা এসে গেছে।

জয়া কী যে কাঁটা হয়ে থাকত সেই সব দিনগুলোতে ! যদি বৃষ্টি আর না ফেরে ? যদি বাবার কাছেই থেকে যায় ? সুবীর আবার বিয়ে করার পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল।

মেয়ে বাথরুম থেকে বেরোতেই জয়া প্রশ্ন করল,

—তোর জন্মদিনে এবারও বন্ধুরা কেউ আসবে না সন্ধেবেলা ?

বৃষ্টি নিষ্পলক তাকাল জয়ার দিকে। যেন জরিপ করছে মাকে,

—শুনলেই তো সন্ধেবেলা থাকব না।

জয়া অপ্রস্তুত। মেয়েও তবে এতক্ষণ তাকে লক্ষ করছিল ! কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল,

—তোর জন্য কাল একটা ফিরহন্ কিনে এনেছি। দেখেছিস ?

—দেখিনি। দেখে নেব।

বৃষ্টি ঘরে ঢুকে গেল।

মেয়ের গলায় পরিষ্কার ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে এভাবেই মুখিয়ে ওঠে আজকাল। ভালভাবে কথাই বলতে চায় না।

নিখিল বলে, —ও কিছু না। এ বয়সে ওরকম একটু আধটু হয়। মা বাবার কথা শুনতে ভাল লাগে না, মনোমত সব কিছু না পেলে বিরক্তি আসে। নিজের কথাই ভেবে দ্যাখ্ না, ওই বয়সে বাবা মা'র কথা শুনে চলতে তোর ভাল লাগত ?

জয়া প্রতিবাদ করে না, কিন্তু জয়া জানে জয়া ছিল অন্যরকম। কারুর ওপর মেজাজ করা তার ধাতে ছিল না। সে ছিল অনেক ভিতু, অনেক নরম, খুব বেশি আবেগপ্রবণ। সে ছিল ফারকোটের পকেটে মানুষ হওয়া ডলপুতুলের মত। সামান্যতম নিষ্ঠুরতাও তার সহ্য হত না। একটা কুকুরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখলেও সে কেঁদে কেটে একসা হত।

সদরের ইয়েল লক খুলে সুধা বাড়িতে ঢুকল। জয়াকে টবের কাছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—কি হয়েছে গো গাছটার ?

—হবে আবার কি ? ভাল করে দেখাশোনা করিস না, গোড়াগুলো খুঁড়ে ঝুরো ঝুরো করে দিতে বলেছিলাম না ?

—সময় পাইনি গো। তুমি ছেড়ে দাও, আমি আজ খুঁড়ে দেব।

সুধা বাজারের থলি রান্নাঘরে রাখতে গেল। সেখান থেকেই মুখ বাড়িয়েছে,

—দিদি, চা দেব ?

এই সময় ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজে ডুবে যাওয়া জয়ার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সামনে অ্যানুয়াল এগজিবিশন। দুটো ছবি শেষ করতেই হবে। সুধাকে বলল,

—ওপরে দিয়ে যাস। শুধু চা। বিস্কুট-ফিস্কুট না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও জয়া ঘুরে দাঁড়াল,

—কি এনেছিস বাজার থেকে ?

—রুই মাছ আর মুর্গি।

—খেয়াল আছে মেয়েটার আজ জন্মদিন ? ফ্রাই-এর জন্য ভেটকি মাছের কয়েকটা ফিলেট আনতে পারতিস না ?

—এনেছি গো এনেছি। সুধা নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথা দোলাল, —সুধার সব খেয়াল থাকে। বৃষ্টির জন্মদিনের কথা আমাকে মনে পড়িয়ে দিতে হবে ? কার্তিক মাসের সাতাশ তারিখটা আমার ঠিক খেয়ালে থাকে। গতবারও তো আমিই মনে করে....

—থাম তো। জয়া খেপে উঠল। সুধা ইদানীং নিজেকে বড় বেশি বাড়ির গিন্নি ভাবতে শুরু করেছে।

—অত যদি সব দিকে খেয়াল, সিঁড়ির ছবিতে ময়লা জমে কি করে ? যেদিকে তাকাব না সেদিকেই...

সুধা কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরে পালাল। তাকে এখন মেল ট্রেনের গতিতে সকালের কাজ সারতে হবে। চা জলখাবারের পাট চুকলেই কুটনো কোটা, মশলা বাটা, রান্নাবান্না....। সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে জয়া বৃষ্টি দুজনেই যে যার কলেজে ছুটবে।

চিলেকোঠার স্টুডিওতে গিয়ে ক্যানভাসের সামনে বসল জয়া। কাল রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক আঁকা হয়েছে ছবিটা। মূলত প্রাথমিক রঙ দিয়েই এবার ছবিটাকে ফোটাতে চাইছে। লাল হলুদ আর নীল মিশিয়ে এক তীব্র একাকীত্বের অনুভূতি। হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না। তবে কি রঙগুলোকে ভেঙে দেওয়া দরকার ? জয়া নতুন করে অস্থির হয়ে উঠল। যে কোন ছবি নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে না মেলা পর্যন্ত এরকমই অতৃপ্তিতে ছটফট করতে থাকে সে। একবার ভাবল ক্যানভাসটাই মুছে ফেলে প্রথম থেকে শুরু করবে, পর মুহূর্তে মত বদলাল। হাতে ব্রাশ তুলে ক্যানভাসের নীল রঙটাকে গাঢ় করতে চাইল আরেকটু। বার দুয়েক আঁচড় টেনেই ব্রাশ ছুঁড়ে ফেলে দিল। মন বসছে না। একেক দিন এরকমই হয়। কিছুতেই ছবির মধ্যে পুরোপুরি ঢুকতে পারে না।

সুধা চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। টুলের ওপর কাপ রেখে চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল,

—কিছু বলবি ?

—দিদি, দাদাভাই-এর কোমরের ব্যথাটা তো আবার খুব বেড়েছে। কালকেও সন্ধেবেলা খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল।

জয়ার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। দু তিন বছর ধরে শীত আসার আগে বাবলুকে কোমরের ব্যথাটা খুব ভোগাচ্ছে। গত বছর তো আট দশ দিন একেবারেই শয্যাশায়ী ছিল ভাইটা। ডক্টর কয়াল বলছিলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ভোগান্তিটুকুও বাবলুর কপালে আছে।

ঊনসত্তর সালে, কলেজ স্ট্রিটে, দু দলের বোমাবাজির মাঝখানে পড়ে মেরুদণ্ডে স্প্লিন্টার ঢুকেছিল বাবলুর। তখন বাবলু সবে হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে, জয়া আর্ট কলেজের ফোর্থ ইয়ারে। নিজেদের যথাসর্বস্ব দিয়ে প্রিয়তোষ মৃণ্ময়ী চিকিৎসা করিয়েছিলেন ছেলের। সুবীর তখন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। জয়ার সঙ্গে সদ্য পরিচয় হয়েছে তার। জয়ার ভাইকে সারিয়ে তোলার জন্য সেও অসম্ভব দৌড়াদৌড়ি, পরিশ্রম করেছিল সে সময়। শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও নিম্নাঙ্গ প্রায় অসাড় হয়ে গেল বাবলুর। কোনদিন আর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারল না। একখানা পোর্টেবল টিভি, বই, ম্যাগাজিন, আর বড়সড় একটা অ্যাকোয়ারিয়াম নিয়ে নিজস্ব জগতে নির্বাসিত হয়ে থাকে সে। সেই জগতে সময় স্থির হয়ে আছে প্রায় একুশ বছর। নিস্তরঙ্গ সেই জীবনে বিন্দুমাত্র আলোড়ন উঠলে বাবলু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। মেজাজ দিনকে দিন আরও তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। বৃষ্টির সঙ্গে তো ইদানীং মোটেই বনে না। কথায় কথায় খিটিমিটি, ঝগড়া, চিৎকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেঁচামেচি। অথচ ছোটবেলায় এই ভালমামা বলতে বৃষ্টি প্রায় অজ্ঞান ছিল।

জয়া সুধাকে বলল, —ঠিক আছে, আজ ফেরার সময় ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আসব।

সুধা চলে যাওয়ার পর জয়া আরেকবার ছবিতে মন বসানোর চেষ্টা করল। ঘণ্টা দেড়েক মগ্ন রইল রঙ তুলি ক্যানভাসে। স্টুডিও বন্ধ করে যখন নীচে নেমে এল তখন তার মন অনেক প্রফুল্ল। ছবিটার পূর্ণ চেহারা চোখের সামনে এসে গেছে, আজ রাতে কাজ করলেই শেষ হয়ে যাবে।

ঘরে এসে ঘড়ি দেখে জয়া চমকে উঠল। নটা চল্লিশ। এগারোটা থেকে ক্লাস আজ। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটল,

—সুধা আমার ভাত বেড়ে ফ্যাল। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

স্নান সেরে, চিরুনি হাতে ভাই-এর ঘরে ঢুকল একবার। বিছানায় আধশোয়া হয়ে বাবলু খবরের কাগজ পড়ছে। হুইল চেয়ারটা একেবারে দরজার সামনে পড়ে। আস্তে করে খাটের দিকে সেটাকে ঠেলে দিল জয়া,

—কি রে, আজ ব্যথাটা কেমন ?

বাবলু কাগজ থেকে চোখ ওঠাল না—ঠিক আছে।

—আজ ডক্টর কয়ালকে বলছি একবার এসে দেখে যাক।

—কি হবে দেখে ? বাবলু গোমড়া মুখে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো, আরও কড়া কিছু পেইনকিলার দেবে এই তো।

জয়া কথা বাড়াল না। ভাই-এর মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি সে চেনে। বাবলু ভীষণভাবে চাইছে একবার ডাক্তারবাবু এসে তাকে দেখে যাক কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করবে না।

ডাইনিং টেবিলে যেতে গিয়েও কি মনে করে একবার বৃষ্টির ঘরেও ঢুকল।

সকালবেলার লণ্ডভণ্ড ঘরখানা ফাঁকা, শুনশান। চতুর্দিকের দেওয়াল জুড়ে বোবা যন্ত্রণার মত শুধুই অজস্র কালশিটে। একটাও রঙিন পোস্টার নেই কোথ্থাও।

জয়া স্তব্ধ হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ২ ॥

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শব্দটা শুনতে পেল বৃষ্টি। ন'টা চৌত্রিশের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। বৃষ্টি একটু অসহায় বোধ করল। আজ সে অন্য দিনের মত তাড়াহুড়ো করে নামতে পারবে না। শাড়িতে সে কোন সময়ই খুব স্বচ্ছন্দ নয়। স্কার্ট ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ বা প্যান্ট শার্টই তার নিত্য দিনের পোশাক। আজ সে ইচ্ছে করেই শাড়ি পরেছে। আজকে সে অন্য দিনের থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখবেই।

আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বৃষ্টির। মধ্য হেমন্তের ভোরে তখনও ঘর জুড়ে ছড়িয়ে ছিল আগের রাতটা। দিন আসার আগে রাত শেষবারের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নিচ্ছিল সব কিছু। ভোরের দিকে এ সময় বেশ হিম হিম ভাব। এখনও যদিও সেভাবে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েনি, আসি আসি করেও শীত রোজ দোমনা হয়ে একটু করে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে তবু সে যে আসছে সেটা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এ সময় ভোরের পৃথিবী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকে। এ সময় পৃথিবীতে সব কিছুই বড় পবিত্র। এরকমই একটা সময়ে বাইরে পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট পাখি পিকপিক ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকেই চমকে বিছানায় উঠে বসেছিল বৃষ্টি। ঘুমের শেষ রেশটুকু কাটার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। মুহূর্তেই শরীর জুড়ে অচেনা শিহরন, আশ্চর্য অনুভূতি।

... শী উইল বি ইন দা কাস্টডি অফ হার মাদার টিল শী অ্যাটেইনস হার এজ অফ এইট্টিন.....

যত দিন না বৃষ্টির আঠেরো বছর বয়স হয় ততদিন সে মায়ের হেপাজতে থাকবে। যত দিন না বয়স আঠেরো বছর হয়। যতদিন না..... তারপর ? আঠেরো বছর বয়স হলে ?

ওই শব্দ কটা এখনও বৃষ্টির মনের ভেতর ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে বার বার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে কথাটা। আজকেই। তবে কি কথাটার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে ! নইলে অত ভোরে আজ ঘুমই বা ভাঙবে কেন ? জীবনে খুব কম দিনই এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছে বৃষ্টি।

স্কুলে নবনীতা বলত,

—ঘুম হ্যাজ ফোর স্টেজেস। প্রথম রাতে নন্ র‍্যাপিড আই মুভমেন্টের ডিউরেশন বেশি, র‍্যাপিড আই মুভমেন্টের কম। ক্রমে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রোলঙড় হতে থাকে, শেষ রাত্তিরে গিয়ে....

ভোরের বেলা প্রতিদিনই তো সে গভীর ঘুমে। নবনীতার ভাষায় পুরো নন্ র‍্যাপিড আই মুভমেন্টের স্টেজ। বেশির ভাগ দিনই আটটা নাগাদ সুধামাসি ঠেলেঠুলে তোলে তাকে।

নবনীতার কথা মনে পড়তেই বৃষ্টির অল্প মন কেমন করে উঠল। নবনীতা জে এন ইউতে চলে গেছে। অনেক দিন ওর কোন চিঠি আসছে না। বিজয়া গ্রিটিংসও আসেনি। নতুন বন্ধুবান্ধব পেয়ে বৃষ্টিকে ভুলেই গেছে হয়ত। স্কুলে থাকতে ওই যা একটু কাছাকাছি ছিল বৃষ্টির। তার বাইরে আর বিশেষ কেউ বৃষ্টির নিষেধের কাঁটাতার টপকে তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি কখনও।

মন্থর পায়ে বৃষ্টি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। একটা ট্রেন চলে যাওয়ার পর দু-চার মিনিটও খালি থাকে না প্ল্যাটফর্ম। বিশেষ করে অফিস টাইমে। ডাউনের এদিকটা গিজগিজ করছে মানুষে। তার মধ্যেই ক্লোজ সার্কিট টিভিগুলোতে যথারীতি রঙিন নাচাগানা চলেছে। ব্যস্ত সমস্ত অফিসযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য গিলে নিচ্ছে গভীর আবেগময় প্রেমের দৃশ্য। বৃষ্টি মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওই সব ন্যাকা ন্যাকা জড়াজড়ি করা প্রেমের নৃত্য তার একদম সহ্য হয় না। প্রেম শব্দটাতেই এক ধরনের শারীরিক বিতৃষ্ণা আছে তার। এলোমেলো পায়ে সামনে একটু এগোতেই বৃষ্টির চোখ আটকে গেল আরেকটা টিভির ঠিক নীচে। সকালের সেই বিদ্‌ঘুটে ছেলেটা না! হ্যাঁ, ওই তো। ছেলেটা পাড়ায় নতুন এসেছে। বেশ ম্যাচো টাইপ ফিজিক, রুক্ষ তামাটে মুখ, সলিড গোঁফঅলা। নামটা জানা হয়নি এখনও। রনি পিকলুদের সঙ্গে দারুণ দোস্তি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

টিভি-র দিকে না তাকিয়ে ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির দিকেই। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। অন্যমনস্কতার ভান করছে! বৃষ্টির হাসি পেয়ে গেল। এ সমস্ত ভান রাস্তাঘাটে পুরুষের চোখে অহরহ দেখে আজকাল। সব সময়ে যে খারাপ লাগে তাও নয়। স্বাভাবিক নারীর মত পুরুষের দৃষ্টি মাঝে মাঝে উপভোগও করে সে। তবে কেউ কেউ যা গোগ্রাসে গেলে! ভাবতেই অবাক লাগে এই সব হ্যাংলা লোকগুলোই যখন বাড়িতে যায় তখন তারা কত সভ্য, ভদ্র। বাবা, দাদা, ভাই, পিসেমশাই, মেসোমশাই। একই মানুষের কতরকম যে চেহারা থাকে! কোনটা যে মুখোশ! কোন্‌টা মুখ!

যেমন তার মা। বাড়িতে সব সময় কী গম্ভীর, দাপুটে। নিজে যা চাইবে সেভাবেই হতে হবে সব কিছু। না হলেই তুলকালাম। সুধামাসিকে বকছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির ওপর মেজাজ, ভালমামাকে পর্যন্ত ছাড়ছে না। কখনও একেবারেই চুপচাপ, নিজের খেয়ালে একটানা ছবি এঁকে চলেছে। খেয়াল। খেয়াল। এই খেয়ালেই কখনও একগাদা প্যাকেট বুকে চেপে ঢুকছে বাড়িতে,

—বৃষ্টি দ্যাখ্ এই মেখলাটা কি গরজাস্ না? পিংক-এর সঙ্গে ব্লু-এর কনট্রাস্ট। এটা তোকে খুব ভাল মানাবে।

কখনও,—এই ধোতি সালোয়ারটা পরে কামিজের কাঁধটাঁধ দেখে নে তো। আর এই রাখ একশ টাকা। তোর হাতখরচ।

বৃষ্টি আদৌ পিংক বা ব্লু ভালবাসে কিনা, ধোতি সালোয়ার পছন্দ করে কিনা, তা নিয়ে এক বিন্দু মাথাব্যথা নেই মা'র। এই মা'ই আবার নিজের লোকজন বাড়িতে এলে একদম অন্যরকম। হাসিখুশি, উচ্ছল।

—অ্যাই বৃষ্টি, এদিকে শুনে যা তোকে দেবযানী ডাকছে।

উফ্! কী রিপাল্সিভ মহিলা ওই দেবযানী। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বৃষ্টির। আহ্লাদী আহ্লাদী। আমাদের বরোদাতে বাবা আর্টিস্টদের মধ্যে এত প্রফেশনাল জেলাসি ছিল না। দীপক বলে, কলকাতার সব কিছুর মধ্যেই বড্ড বেশি পলিটিক্স! নেকু। নিজে যেন কখনও পলিটিক্স করে না! এই তো রমেন সাহাই সেদিন মাকে এসে বলছিল তাঁদের নিউজ্ পেপার অফিসে গিয়ে দেবযানীমাসি নাকি চুকলি খেয়ে এসেছে। রমেন সাহারই নামে। মার সঙ্গে বেশি ভাব বলে রমেনমামা নাকি মা'র ছবির বেশি বেশি প্রশংসা করে আর দেবযানী ড্রিঙ্কস্ অফার করেনি বলেই কাগজে বিশ্রী সমালোচনা করেছে তার এগ্জিবিশনের। এর পরও নাকি ওর স্বামী দীপক বলে, তোমাদের ক্রিয়েটিভ আর্টের ওয়ার্ল্ডটা বড় নিষ্ঠুর! সব সময়ে ল্যাং মারামারি! সারাক্ষণ বরের কোটেশন ঠোঁটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীপক কা জরু কাঁহিকা। কি যেন বলে এদের? কক পেক্ড! বরসোহাগী!

শিপ্রা হাল্দার তাও একরকম। যদিও অনর্গল বকবক করেই চলে, কারুর কথা শোনে না, কেউ শুনছে কিনা পরোয়াও করে না। অবিরাম সিগারেট খেয়ে চলেছে। চেইন স্মোকার!

আর ফিরোজ আঙ্কল্ যে কখন সেন্সে থাকে, কখন থাকে না! সব সময়ই অ্যালকোহলের গন্ধ ছুটছে মুখ দিয়ে। ছোটবেলায় কি জোর জোর চুল টানত, আদর করত গাল টিপে টিপে। আজকাল দেখলেই, হাই ইয়াং লেডি, তুই তো রোজ একটু একটু করে ব্লুম করছিস্ রে! মাতালের প্রলাপ। পুজোর আগে একদিন তো এসে ড্রয়িংরুমের কার্পেটে পড়ে কি গড়াগড়ি। কোন্ ক্রিটিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে নাকি ঝামেলা হয়েছে। গড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে, আমার ছবিতে ডেপথ্ কম ? দাঁত ভেঙে দেব শালাদের। তোর চোদ্দপুরুষ আর্টের কিছু বোঝে, অ্যাঁ ? সজ্ঞানে থাকলে এই ফিরোজ আঙ্কল একেবারে ভিন্ন মানুষ। কত মার্জিত, ভদ্র, স্নেহশীল।

বাবাই বা কম কিসে ! এমনিতে কত হাসিখুশি, দিলদরিয়া। সব সময় একটা মিষ্টি ভালবাসার গন্ধ যেন বাবার গায়ে। অথচ এই বাবাই রীতাআন্টির সামনে টুক্ করে কেমন খোলসের মধ্যে।

ভাবতেই পুরনো অভিমানটা সারা বুকে ছেয়ে গেল বৃষ্টির। সেই পুরনো পাথরচাপা অভিমান। জমাট। শীতল।

বৃষ্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারল না। হুড়হুড় করে পাতাল ট্রেন ঢুকে পড়েছে। ভিড় ঠেলে সামনের কামরায় উঠে বৃষ্টি সিটের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই গেটের কাছে হাসির রোল দেখে ঘাড় ঘুরে গেছে। গেট বন্ধ হওয়ার সময় গেটে আটকে গেছে। আর কেউ নয়, সেই ছেলেটাই। গেট থেকে ছাড়া পেয়ে দ্বিতীয় চেষ্টায় ভেতরে আসতে পারল। অপ্রতিভ মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সব সময়ই বোধহয় অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করতে ভালবাসে ছেলেটা। ভোর থেকেই যা কমিক সিন্ দেখিয়ে চলেছে। বৃষ্টি বেশ কৌতুক বোধ করল।

নির্জন ভোরে, সুধাকে ঘুম থেকে না তুলে, বৃষ্টি পায়ে পায়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল। ছাদের দরজার ছিটকিনি খুলতেই বুক ছলাৎ। গাঢ় মেঘের মত কুয়াশা চতুর্দিকে, কুয়াশা জড়িয়ে ঘুমিয়ে সামনের পার্ক, রাস্তাঘাট। একটু দূরের সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট। বাড়ি ঘরগুলো ঝাপসা হতে হতে অদৃশ্য ক্রমশ। ফিরোজ আঙ্কলের মিস্টিক পেন্টিং-এর মত। রহস্যময়। গোটা ছাদ শিশিরে, রেণুতে মাখামাখি হয়ে আছে। পিছল ছাদে পা টিপে টিপে আলসেতে এসে দাঁড়াতেই সামনের পার্কে ছেলেটা। জগিং করতে করতে গোটা পার্ক শুধু চক্কর দিয়ে চলেছে। পিঠে হ্যাভারস্যাকের মত ভারী এক কিটস্ ব্যাগ। ঘন কুয়াশার মধ্যে কী কিম্ভূতই না দেখাচ্ছিল ছেলেটাকে। পিঠে বস্তা নিয়ে যেন ধোঁয়ায় নাচছে এক রঙিন রোবট। হাল্কা নীল ট্র্যাকস্যুট পরা। আচমকা মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্রেকডান্সের মত ঘাড় ঘোরাতে শুরু করল। বৃষ্টি থ। কাঁধ থেকে ব্যাগ নামায় না কেন ! ঘাড়ে ব্যথা হয়ে মরবে যে ! এক্সারসাইজ থামার পর পিঠ থেকে কিট্স্ ব্যাগ নামল। ব্যাগ্ থেকে বেরোল ইয়া এক ক্রিকেট ব্যাট্। ব্যাটসুদ্ধ অত বড় ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দৌড়োয় ! ওয়েট্ ট্রেনিং !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুহাতের গ্রিপে ব্যাট ধরে শ্যাডো প্র্যাকটিস্ শুরু হল তারপর। অদৃশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কখনও ফরোয়ার্ড খেলছে, কখনও ব্যাকফুট। কখনও স্কোয়্যার কাট্ করছে, কখনও ড্রাইভ।

হাঃ, কলকাতার কপিলদেব। বৃষ্টির ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। কত আজব চিড়িয়াই যে আছে এই শহরে!

এসপ্ল্যানেডে, পাতাল থেকে মাটিতে উঠে ট্রামলাইনের ধারে দাঁড়াল বৃষ্টি। কাঁধের ব্যাগ বুকের কাছে জড়ো করে একবার আকাশের দিকে তাকাল। সূর্যের কোন চিহ্ন নেই কোথথাও। সূর্য বোধহয় আজ আর উঠবেই না। যেদিন সে জন্মেছিল সেদিনও নাকি সারাদিন সূর্যের দেখা মেলেনি। নভেম্বরে কোন কারণ ছাড়াই বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল কলকাতা। বৃষ্টির দাদু প্রিয়তোষ বলেছিলেন, আমাদের বাড়িতেও বৃষ্টি এসেছে।

বৃষ্টির মুখে মাথার ওপরের ধূসর আকাশটার ছায়া! তার কোন জন্মদিনই কখনও কোন আনন্দের দিন হতে পারে না। আঠেরো বছরও না। তার জন্মটাই একটা দুর্ঘটনা মাত্র। বার্থ বাই মিয়ার চান্স্। দুটো মানুষের মুহূর্তের আনন্দের বাই প্রোডাক্ট। কিম্বা ভুলের। আনন্দ ফুরিয়ে গেছে, ভুল ভেঙে গেছে। খেলা শেষ।

কলেজ স্ট্রিট মুখো আধ ফাঁকা ট্রামে উঠে বসবার জায়গা পেয়ে গেল বৃষ্টি। বিষণ্ণ মুখে জানলা দিয়ে কর্মব্যস্ত শহরটাকে দেখছে। তার আজকের জন্মদিনটাও কি একটু অন্য রকম হতে পারত না? চারদিক রোদ্দুরে ভেসে যেতে পারত, একটা হৈ-চৈ আমোদ আহ্লাদের সাড়া পড়ে যেতে পারত পৃথিবীতে, ঝকঝকে নীল আকাশ ঘোষণা করত বৃষ্টি রায় আজ থেকে সাবালিকা।

আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত বৃষ্টি রায় শুধু মায়ের হেপাজতে থাকবে। আদালতের এই রায়েই কেমন একটা বন্দীজীবন বন্দীজীবন ভাব। বন্দীই তো। একা থাকলেই বৃষ্টি নিজের বন্ধ ঘরে নির্জন সেলের কয়েদী। জানলার মোটা মোটা লোহার গরাদগুলো বলবান পুরুষ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে পাহারায়। কেন যে সেই লোকটা এমন একটা শাস্তি দিয়েছিল বৃষ্টিকে? লোকটার মুখ চেষ্টা করলেও বৃষ্টি ভুলতে পারে না। মাঝবয়সী গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, অনেকটা তাদের পাড়ার কাউন্সিলার সুরেন ভড়ের মত দেখতে। এরই এক কলমের খোঁচায় নাকি টুকরো টুকরো হয়ে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। বৃষ্টিরা হয়ে যায় ভাঙা ঘরের শিশু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়ে ছ' বছরের বৃষ্টিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে লোকটা ;

—তোমার নাম কি মা ?

—বৃষ্টি। উহু, শিঞ্জিনী রায়।

—বাহ্, কি মিষ্টি নাম। কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি ?

—ক্লাস টু।

—বাহ্, তা তুমি কাকে বেশি ভালবাস মামণি ? বাবাকে ? না মাকে ?

—তোমাকে বলব কেন ?

—বাহ্, আমাকে তো বলতেই হবে। না হলে আমি জানব কি করে তুমি কার কাছে থাকতে চাও।

বৃষ্টি গুম্।

—বলো মা, কাকে বেশি ভালবাস ?

—দুজনকেই।

—কিন্তু তোমার মা বাবা যে এখন থেকে আলাদা আলাদা থাকবে। তুমি কার কাছে থাকতে চাও ?

—দুজনের কাছেই।

—কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে যে দুজনের একজনকে বেছে নিতে হবে। বাবা, কিম্বা মা।

বৃষ্টি সেই মুহূর্তে একটা ছোট্ট চারাগাছ। জীবন্ত কিন্তু অসহায়। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে থর থর কাঁপছে।

—আমি কাউকে চাই না, কাউকে না।

দৌড়ে বাইরে এসে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে, বাবা নয়, মা নয়, দাদুর কোমর। দাদুকে আঁকড়ে ধরে আশ্রয় খুঁজছে।

টানা এক বছর বৃষ্টিকে নিয়ে লড়ে গিয়েছিল বৃষ্টির মা বাবা। বৃষ্টিকে নিয়ে লড়াই ? না নিজেদের জেদের লড়াই ? কী আতঙ্কেই না তখন দিন কেটেছে বৃষ্টির। কোর্ট কেস নিয়ে কেউ আলোচনা করলেই কান খাড়া করে থেকেছে। দাদু যেদিনই তার জন্য বাবল্‌গামের প্যাকেট কিনে এনেছে, দিদা তৈরি করেছে তার প্রিয় এলাচের গন্ধভরা রসগোল্লার পায়েস, সেদিনই বুঝেছে কেসের ডেট্ আছে। কি হবে শেষ পর্যন্ত ? আর কি কোনদিন সে বাবাকে দেখতে পাবে না ? নাকি মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরদিনের মত ?

বোকা। বোকা। কী বোকাই না ছিল তখন। নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবলে এখন নিজের ওপরই রাগ হয় বৃষ্টির। এই রাগটা যদি সবার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে দেওয়া যেত ! মা, বাবা, ভালমামা, রীতাআন্টি সবাইকে যদি সমঝে দেওয়া যেত একবার !

রীতার নামটা মনে আসতেই দপ করে বৃষ্টির মাথা আরও গরম হয়ে গেল। বাবা তোমাকে বিয়ে করেছে, তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাকো, বৃষ্টিকে নিয়ে আদিখ্যেতা করার চেষ্টা কেন ? মহিলাকে দেখলেই বৃষ্টির গা জ্বলে যায়। এরই গলা শোনানোর জন্য সকালে টেলিফোনে বাবার কী অনুরোধ উপরোধ !

—বৃষ্টি লক্ষ্মীসোনা, এক সেকেন্ড একটু ধর্। রীতা তোকে বার্থডে উইশ করতে চাইছে।

ভাগ্যিস ঝপ্ করে নামিয়ে দিয়েছিল ফোনটা। নইলে হয়ত ফোনে বাবার পুচকে ছেলেটার গলাও শুনতে হত।

এবার বৃষ্টির রাগ গিয়ে পড়ল বাবার ওপর। বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে গত বছর জন্মদিনে কি আক্কেলে ওই মহিলাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল ! গোটা সন্ধেটাই তেতো হয়ে গিয়েছিল গতবার। মহিলাকে জব্দ করার জন্য বাবাকে আজ পুরো সন্ধেটাই আটকে রাখতে হবে।

পাশের সিটে এক বিপুলকায় মহিলা ক্রমাগত বৃষ্টিকে ঠেলে ঠেলে নিজের জায়গা বাড়িয়ে চলেছেন। জানলা থেকে মুখ সরিয়ে বৃষ্টি ভদ্রমহিলার দিকে কটমট করে তাকাল,

—ঠিক হয়ে বসুন। আমাকে তো কোণে চিপে ফেলছেন।

মহিলার বয়স বছর পঞ্চাশেক। দেখেই বোঝা যায় নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে থাকেন সব সময়। বৃষ্টির কথার রূঢ়তায় কিছুটা আহত ভাব তাঁর মুখে,

—কি করব বলো ? দেখতেই তো পাচ্ছ নিজেই কেমন সিট্ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছি।

মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, খেয়ে দেয়ে গায়ে গর্দানে এত বড় শরীরটা তৈরি করার সময় মনে ছিল না ? পর মুহূর্তে সামান্য মায়াও হল মহিলার ওপর। অনেকে তো অসুখেও এ রকম মোটা হয়ে যায়। তবে শারীরিক অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করতে অনেকেই দ্বিধাবোধ করে না। নিজেকে ছাড়া অন্যের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়ও না চট করে। তার ভালমামাই তো সারাদিন হয় হুইল চেয়ার, নয় খাটে পড়ে আছে। পান থেকে চুন খসলেই চিল চিৎকার। সুধামাসির সঙ্গে কি বিশ্রী ভাষায় কথা বলে একেক সময়। একমাত্র মা'র সামনেই অতটা মেজাজ দেখানোর সাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় না। সাহস পায় না ? নাকি সামনেই পায় না মাকে ? কতটুকু সময়ই বা মা বাড়িতে থাকে ! সারাদিনই ঘুরছে বাইরে বাইরে। কলেজ, এগজিবিশন, সেমিনার, বন্ধুবান্ধব। আর বাড়ি থাকলে তো হয় মেজাজ, নয় নিজের ইজেল, ক্যানভাস, ব্রাশ, তুলি নিয়েই ধ্যানস্থ। একেক দিন তো সারা রাত ধরে চিলেকোঠার স্টুডিওতে বসে ছবি এঁকে যায়। সে সময় মা'র সামনে পৃথিবীটারই কোন অস্তিত্ব থাকে না। বিশ্বসংসার ধ্বংস হয়ে গেলেও মা তখন ফিরে তাকাবে না। এমনকি বৃষ্টি মরে গেলেও না।

বৃষ্টির দিদা তখন সদ্য মারা গিয়েছেন। বারো বছরের বৃষ্টি একা বিছানায় শুয়ে। মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে বিছানায় উঠে বসেছে বাচ্চা মেয়েটা। চোখ টিপে দৌড়েছে পাশের ঘরে। মা নেই। নিঃশ্বাস চেপে, তীর বেগে অন্ধকার টপকে ছুটেছে ছাদের স্টুডিওতে। হাঁপাচ্ছে,

—আমার ভয় করছে।

মা শুনতেও পেল না। টেম্পেরায় কতগুলো বাঁকাচোরা মানুষের মুখ ফুটিয়ে তুলতে মগ্ন তখন। সাংঘাতিক রাগী মুখ সব। কেউ কেউ ভৌতিক মুখোশ পরা। লাল কালো বেগুনি মুখোশ।

বৃষ্টি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢোক গিলছে বার বার। তারপর নিঃশব্দ পায়ে নেমে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে। সোজা সুধামাসির ঘরে, মেঝেতে পাতা মাদুরের বিছানায়।

—সুধামাসি, ও সুধামাসি...

—কে ? কে ? কি হয়েছে ? সুধামাসি ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

—আমি তোমার কাছে শোব।

বৃষ্টির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সেই সব দিন কি সে ভুলে যেতে পারে ? কি ভাগ্য যে মার মনে আছে আজ তার জন্মদিন। নিজেকে নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকে অন্যের কথা ভাবার তাদের সময় কোথায় ?

মারা যাওয়ার আগে দিদা প্রায়ই বলত,

—মার ওপর এত অভিমান করিস কেন ? সারা দিন ধরে মাকে কত খাটাখাটুনি করতে হয় বল্ তো ? সবই তো তোর জন্য।

কচু। যত সব আলগা সান্ত্বনার কথা। বৃষ্টির জন্য কেউ কিছু করেনি কোনদিন। করবেও না। ছোটবেলায় মিছিমিছি কিছু কষ্ট পেয়েছে বৃষ্টি। সারাক্ষণ বোকার মত ভেবেছে কখন মা ফিরবে কাজ থেকে।

আর্ট কলেজে লেকচারারশিপ পাওয়ার আগে ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন নিয়ে মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেতেছিল খুব। নিখিল দত্ত রায়ের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা। এই একটা অফিস সাজাচ্ছে, ওই একটা শোরুম করছে। সকাল না হতেই নিখিলমামা হৈ হৈ করে হাজির বাড়িতে,

—জয়া, মার্কোনিদের অর্ডারটা পেয়ে গেলাম বুঝলি। ব্যাকসাইডটা যদি মিরর দিয়ে কভার করা যায়, দুপাশেও দেওয়াল জোড়া আয়না, তাহলে দোকানটাকে বেশ ইলংগেটেড্ লাগে।

—বাইরে কয়েকটা মিউরালস্ও দেওয়া যেতে পারে। আর ডলফিনের মোটিফটা যদি...

ড্রয়িংরুমের দরজার পাশে তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকত বৃষ্টি। কতক্ষণে নিখিলমামার চোখ পড়বে এদিকে, কাজ থামিয়ে চোখ পিটপিট করবে,

—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে...

বৃষ্টি সুড়ুৎ করে একেবারে নিখিলমামার গায়ের কাছে। তখন থেকেই নিখিলমামার মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল। এত দাড়ি যে চোখ কপাল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। চুল পর্যন্ত আঁচড়ায় না কখনও।

বৃষ্টি চোখ পাকিয়ে শাসন করত,—আজও তুমি চুল আঁচড়াওনি ?

সঙ্গে সঙ্গে নিখিলমামা বৃষ্টিকে উঁচু করে তুলে দোলাতে শুরু করত,

—আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো...

—নো ক্ষমা। নিলডাউন হও।

—কান ধরে ? না, না ধরে ?

নিখিলমামা হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ত। তাই দেখে মার কী বিরক্তি, কী বিরক্তি !

—বৃষ্টি এখন যাও তো ঘর থেকে। দেখছ না আমরা কাজের কথা বলছি।

—আহা, থাক্ না একটু। খামোকা বকছিস্ কেন ?

—তুই আর ওকে মাথায় তুলিস না তো। ভীষণ অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে। কারুর কথা শোনে না। ওইটুকু মেয়ের কী জেদ।

জেদের দেখেছেটা কি ? বৃষ্টি বলেই এতদিন সহ্য করে গেছে সব কিছু। আর নয়। আঠেরো বছর বয়স একটা মাইলস্টোন। আজ থেকে জীবনটাকে আমূল বদলে ফেলতে হবে। তাই করবে যা করতে নিজের ইচ্ছে করে। আর কোন ছেলেমানুষি নয়। কোনও উচ্ছ্বাস নয়। মিছিমিছি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে নিজেকে শুধু খেলো করাই হয়। সকাল থেকেই নিজেকে বদলাতে শুরু করে দিয়েছে। সব পোস্টার খুলে ঢুকিয়ে দিয়েছে খাটের নীচে। মনটা একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনচিন করেছিল ; প্রশ্রয় দেয়নি। বেডসাইড টেবিলে এক বছরের বৃষ্টির দারুণ মিষ্টি ছবি ছিল একটা। দুহাত বাড়িয়ে গাবলু গুবলু মেয়েটা কারুর কোলে উঠতে চাইছে। ছবিটাকেও সরিয়ে দিয়েছে চোখের সামনে থেকে।

মেডিকেল কলেজ আর ইউনিভার্সিটির মাঝখানে ট্রামটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে মুখ বার করে বৃষ্টি দেখল ট্রামের তার ছিঁড়েছে। একগাদা বাস, গাড়ি জমে গেছে চারপাশে। বৃষ্টি মনে মনে হাসল। আজ যে তার ছিঁড়বে সেটা তো অবধারিত। আজ যে দিনটাই অশুভ। ভাগ্যিস ট্রামের আর কেউ জানে না আজ অপয়া মেয়েটার জন্মদিন বলেই ট্রামটা এখানে এভাবে আটকে গেল !

বৃষ্টি ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কলেজের গেটের কাছে আসতেই শুভর সঙ্গে দেখা। শুভ বৃষ্টিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল,

—আই ব্বাস্, আজ কি ড্রেস দিয়েছ বস্ ! লুকিং ডেঞ্জারাসলি গরজাস্ ! মাধুরী দীখ্শিতের বাজার ফিনিশড্।

আগুন রঙ রাজকোট শাড়িতে, কপালের লাল টিপে, চুলের বাহারে, অঙ্গে বিভঙ্গে বৃষ্টির এখন মরালীর ভাব। শুভর কথায় অহংকারী স্বর ফোটাল গলায়,

—তুলনা করার আর লোক পেলি না ? শেষ পর্যন্ত হিন্দী ফিল্মের হিরোইন ?

—কি করব বল্, হলিউডের হিরোইনরা তো আর শাড়ি পরে না। শুভ হাত ওল্টালো,—যাবি নাকি আজকে গ্লোবে ? স্ট্যালোনের একটা ভাল বই এসেছে।

বৃষ্টি ঠোঁট টিপে হাসল —সরি, পারলাম না। আজ একটু কাজ আছে।

—কাজ ? তোর ? ফিল্ম দেখা ছাড়া তোর আর কোন কাজ থাকে নাকি ? তোর জন্যই তো এস্প্ল্যানেডে ইংলিশ বইগুলো চলে।

—ফালতু বকিস্ না। আমারও কাজ থাকে।

শুভ ফিসফিস করে উঠল—অ্যাপো ট্যাপো আছে নাকি ?

বৃষ্টি উত্তর দিল না। মনে মনে বলল, অ্যাপো তো আছেই। বাবার সঙ্গে। শুধু অ্যাপো নয়, বোঝাপড়াও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৩ ॥

সুবীর মুগ্ধ চোখে দেখছিল মেয়েকে। শাড়ি পরে বৃষ্টি আজ একদম অন্যরকম। প্রথমটা তো দূর থেকে দেখে চিনতেই পারেনি সুবীর। এই বয়সের মেয়েরা হঠাৎ শাড়ি পরলে কেমন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। একটা সম্পূর্ণ নারী যেন। জীবনের সব রূপ রস বর্ণ গন্ধে ভরা।

অনেক দিন পর গোপন অভিমানটা লম্বা নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এল সুবীরের বুক থেকে। এই মেয়েকে পৃথিবীতে আনতে চায়নি জয়া।

হাল্কা সুরে পশ্চিমী সঙ্গীত বেজে চলেছে শৌখিন রেস্তোঁরায়। সন্ধেবেলা পার্ক স্ট্রীটের এই ছোট্ট বিলাসপুরীতে আলো-ছায়ার মায়া। রঙিন আলোর আবছা বিচ্ছুরণ, এয়ারকন্ডিশনারের কৃত্রিম পাহাড়ী শীতলতা, সব মিলে মিশে এক স্বপ্নের পরিবেশ। এত চাপা আলো যে পাশের টেবিলের মানুষগুলোকেও পরিষ্কার বোঝা যায় না। একই ছাদের নীচে, পাশাপাশি থেকেও যে যার মত পৃথক এখানে। অচেনা।

সুবীর মেন্যুকার্ড এগিয়ে দিল বৃষ্টির দিকে,

—মেন্যুকার্ড কি হবে ? বলো না যা হোক কিছু।

সুবীরের এতক্ষণে খটকা লাগল, এত চুপচাপ কেন মেয়ে ? গাড়িতে আসতে আসতেও কথাবার্তা বলেনি বিশেষ। সুবীরের কথার উত্তরে হুঁ হাঁ করে গেছে মাত্র। এখনও স্বর যথেষ্ট নিরুত্তাপ। অথচ অন্যান্য দিন খেতে ঢুকে বৃষ্টিই আগে মেন্যুকার্ড পড়তে শুরু করে দেয়। হঠাৎ হঠাৎ কোন অদ্ভুত খাবারের নাম বার করে জিজ্ঞাসা করে,

—আজ এটা ট্রাই করলে কেমন হয় বাবা ? বেকড্ অ্যাভোক্যাডো উইথ্ ক্র্যাব্ ? স্যালাড নিকয়েস খাবে ? হোয়াইটিং বার্সি ?

সব সময় নতুন কিছু খুঁজে বার করার চেষ্টা। আগে আগে সুবীরও মেয়ের সঙ্গে মেন্যুকার্ড পড়ে যেত সমান তালে। আজকাল আর সবসময় তাল রাখতে পারে না।

—সিজ্‌লার খাবি ? উইথ কাশ্মিরী নান্ ?

বৃষ্টি কাঁধ ঝাঁকাল, যার অর্থ হ্যাঁও হয়, না'ও হয়। যেন কোন খাবারেই আজ তেমন আসক্তি নেই তার।

ওয়েটারকে নিচু গলায় খাবার অর্ডার দিয়ে মেয়ের মুখোমুখি হল সুবীর,

—কি হয়েছে রে তোর ? মন খারাপ ? আজকের দিনে আমার ছোট্ট সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুড়িয়াটা এত গ্লুমি কেন ?

—কিছু হয়নি তো।

বৃষ্টির মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটল ; হাসল না,

—তুমি ট্যুরে যাবে বলছিলে না ? কবে যাচ্ছ ?

—দেখি। নেক্সট্ উইকে যেতে পারি।

—কদ্দিনের জন্য ?

—এবার গেলে দিন পনেরো তো বটেই। কম্পানি নতুন ব্রাঞ্চ খুলছে ফরিদাবাদে।

—ও।

নিজের মনে নেলপালিশের রঙ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বৃষ্টি। সুবীর বুঝতে পারল তার ট্যুরে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে মোটেই তেমন আগ্রহী নয় মেয়ে। নেহাত কথা বলার জন্যই প্রশ্ন। হলটা কি ! গত বছরের জন্মদিনের রাগটা কি এখনও পুষে রেখেছে মনে ?

সুবীর মেয়েকে খোশামোদ করতে গেল,

—আজ তুই দুপুরে এলি না কেন ? কাল আমি অফিসের সবাইকে বলে রেখেছিলাম, আজ থেকে আমার মেয়ে অ্যাডাল্ট হচ্ছে, শী ডিজার্ভস্ এ ফুল ডেজ কম্পানি উইথ্ মি।

বৃষ্টি সুবীরের দিকে তাকালই না। ভীষণ মনযোগ দিয়ে হাতের নখ দেখেই চলেছে।

—বাড়িতে আজ কোন প্রোগ্রাম নেই তো ? চল্, আজ তাহলে তোকে নিয়ে গোটা কলকাতাটা চক্কর দিয়ে ফেলি।

পাশের টেবিলে পুতুলের মত একটা বাচ্চা বাবা মা'র মাঝখানে বসে স্যুপ খাচ্ছে। মা চামচে করে তুলে দিচ্ছে মুখে, বাবা রুমালে মুখ মুছিয়ে দিল। বৃষ্টির চোখ আঙুল থেকে উঠে সেদিকে স্থির। স্থির চোখেই বলে উঠল,

—আমাকে নিয়ে যতক্ষণ খুশি ঘুরবে ? রীতাআন্টিকে বলে এসেছ তো ?

সুবীরের আদর মাখানো হাসি ভরা মুখে একটা পিন বিঁধে গেল যেন। কথাটা কি বৃষ্টি সরল ভাবে বলল ? না ইচ্ছে করে আঘাত করার জন্য ? সুবীর ধরতে পারল না। ইদানীং সব সময় সব জায়গায় ঠিক ঠিক মাথাও কাজ করে না। দিন রাত সহস্র সমস্যা ঘুরছে মস্তিষ্কে। অফিসে এম ডি সর্বদা কাঁটার ওপর দিয়ে দৌড় করাচ্ছে। বাজার ডাল্ বলে আমাদের বসে থাকলে চলবে রায় ? রিসেশান থাকবেই। কম্পানিকেও তো থাকতে হবে। ডু সামথিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়। অবিরাম পাগলাঘন্টির মত বেজে চলেছে এম ডির বাণী...তোমার মত এফিশিয়েন্ট মার্কেটিং ম্যানেজার... ! কি করবে সুবীর ? আবার কাঁধে প্রোডাক্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়বে রাস্তায় ? একুশ বছরের সুবীরের মত ? যে কিনা ন্যায়রত্ন লেনের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাবা মা দাদা কারুর কথা ভাবেনি ? পরোয়া করেনি ঠুনকো বংশমর্যাদার ? অনামী কম্পানির আলতা সিঁদুর ফিরি করা থেকে শুরু করে আজ পৌঁছেছে মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজারে ? এখন চব্বিশ ঘন্টা মাথার ভেতর শুধুই টার্গেট, মান্থলি প্রোজেকশন, রিসেশান...। এরই সঙ্গে রক্তচাপ ওঠা নামা করার মত দিনভর মাথা বেয়ে উঠছে নামছে শেয়ারের দর। কখনও দুচার হাজার আসে না তা নয় কিন্তু চাপা উত্তেজনা ঘুসঘুসে জ্বরের মত শরীর ছেয়ে থাকে সর্বক্ষণ। অফিস থেকে মাঝে মাঝেই ডায়াল ঘোরায়,

—হ্যালো মিত্তালজি, আভি হাল কেয়া হ্যায় ?

—ঠিক হ্যায়। প্রাইস্ ইজ সোরিং আপ্।

একটু রিলিফ্। একটুই। এর পরই হয়ত এম ডির ডাক, ডু সামথিং রায়।

বাড়িতেও ঠিক মত সময় দিতে পারে না। রীতা অনুযোগ করে,

—একটা দিনও কি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো না ? ছুটির দিনেও এত কিসের কাজ তোমার ?

সুবীর করবেটা কি ? প্যাডকে চলে এলে ঘোড়াকে ছুটতেই হয়। জকিই ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

তার মধ্যেও কখনও একটু জিরোতে পারলে, সামনে বসে থাকা মেয়েটা বুকের ভেতর বিব্ বিব্ করে বেজে ওঠে। নিজের সঙ্গে একা হলেই বৃষ্টি এসে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে সুবীরের মনে। দু বছরের দামাল পায়ে হাঁটা বৃষ্টি, পাঁচ বছরের অবিরাম পাকা পাকা কথা বলে যাওয়া বৃষ্টি, সাত বছরের ঠোঁট ফোলানো অভিমানী বৃষ্টি, বারো বছরের আহত চোখে তাকিয়ে থাকা বৃষ্টি, নানান বয়সের বৃষ্টিরা এসে তালগোল পাকিয়ে দিতে থাকে সব কিছু। ভীষণ ভাল লাগাতে বুক থৈ থৈ করে ওঠে। তার সঙ্গে একটা যন্ত্রণাও কুরে কুরে খেতে থাকে সুবীরকে। গোপন এক রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা। সব বাবারই কি এমন হয় ? নাকি সুবীরের মত বাবাদেরই শুধু ?

জয়া নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। প্রিয় সম্পদ হারিয়ে ফেলার পর তার অভাব দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে বাজতে থাকে বুকে। প্রথম প্রথম তাও এই অভাবটাকে অনুভব করতে সময় লেগেছিল কিছুদিন। তখনও একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেদ, একটা অসহ্য রাগ, পরাজয়ের অপমান সুবীরকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। নিস্ফল ক্রোধে বুনো ষাঁড়ের মত লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছে করত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তবে রাগের আয়ু আর কতদিন ? সময়ের নিয়মে ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছিল সুবীর। তখনই অভাববোধটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় তাকে। একটা মানুষ সারাদিন পর খেটেখুটে বাড়ি ফিরছে, কেউ তার জন্য কোথ্থাও অপেক্ষা করে নেই, এই চিন্তায় নিঃসঙ্গ মানুষ নিঃসঙ্গতর হয়। সেই সময়ই রীতাকে না পেলে...। রীতাকে বিয়ে করার আগে লক্ষবার ভেবেছে সুবীর। আবার ভুল হচ্ছে না তো ?

বৃষ্টির দিকে সুবীর নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। পুরনো সেলস্‌ম্যানটা মনে মনে কথা সাজিয়ে নিচ্ছে।

মেয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে। এদিক ওদিকের লোকজন দেখছে।

সুবীর টেবিলের সামনে ঝুঁকল,

—রীতা আজ তোকে একবার নিয়ে যেতে বলেছিল ; যাবি,

চকিতে মুখ ফিরিয়েছে বৃষ্টি,

—কেন ?

—বারে, জন্মদিনে একবার বাড়িতে যাবি না ? তোর ভাইটারও তো দিদিকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে।

—ভাই ভাই করছ কেন ? আমার কোন ভাই টাই নেই।

বৃষ্টির ফর্সা মুখ পলকে থমথমে লাল। রাগ, দুঃখ, অভিমান বড় সহজেই তার মুখে ছাপ ফেলে দেয়।

সুবীর বুঝল কথাটা বলা ঠিক হয়নি। বৃষ্টি রীতা রাজাকে এখনও মেনে নিতে পারেনি। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে নিল,

—জন্মদিনে কি নিবি বল্ ? ক্যামেরা ? ফরেন রিস্টওয়াচ্ ? পারফিউম ?

বৃষ্টি সন্ন্যাসিনীর মত নির্লিপ্ত,

—দিও যা হোক কিছু।

মেয়ের কথার ভঙ্গিতে হঠাৎ ধৈর্য হারাল সুবীর। কি এমন অপরাধ করেছে সে ? নিজের ইচ্ছে মত জীবন বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও তার থাকবে না ?

—ওভাবে কথা বলছিস্ কেন ? কোন্ দিন কি দিইনি তোকে ? যখন যা চেয়েছিস্ তাই দিয়েছি। জার্মান টেপ, জাপানি ওয়াকম্যান, ফ্রেঞ্চ পারফিউম, ইটালিয়ান সিল্কের ড্রেস মেটিরিয়াল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি দমল না,

—সে তো ঘুষ দিয়েছ।

—ঘুষ !

—নয় তো কি ? বৃষ্টির গলা বরফের ছুরির মত ধারালো,

—তুমি দিয়েছ, মা দিয়েছে...। দেবে নাই বা কেন ? নিজেদের সুখটুকু বজায় রেখে বৃষ্টিকে ভালবাসতে গেলে তার মাসুল দিতে হবে না ? দশ টাকা চাইলে তখখুনি একশ টাকা বার করে দাও, ভাবো কিছু বুঝি না ?

সুবীর স্তম্ভিত। এই কি তার সেই আদরের ছোট্ট গুড়িয়া ! বার্বিডল আর আইসক্রিম পেলে যে বাবাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিত ! মেয়ের ঔদ্ধত্য দেখে ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও কিছুতেই তেমনভাবে রাগতে পারল না সুবীর। রাগের সঙ্গে একটা চাপা ভয়ও আঁচড় টানছে বুকে। বৃষ্টি যে তার দুর্বলতম জায়গা। গলাটাকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল,

—খুব রাগ করে আছিস্ মনে হচ্ছে ? বোকা মেয়ে, বাবা মার উপহার কি কখনও ঘুষ হতে পারে ? ছাড়্, ও সব কথা। আজ তুই কি নিবি বল্। আজ তুই যা চাইবি, তাই দেব।

মেয়ে এবার একটু গলেছে,

—যা চাইব তাই দেবে ?

—চেয়ে তো দ্যাখ্। সুবীরের গলা মায়ায় ভরে এল।

কি একটা কথা বলতে চেয়েও বলতে পারছে না বৃষ্টি। চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে ধরল। ঢোঁক গিলল ঘন ঘন। তারপর দুম করে বলে ফেলেছে,

—যদি বলি তোমাকে চাই ?

সুবীর হেসে ফেলল। মেয়ের পলকে রাগ, পলকে আবদার। সুবীরের কাছেই।

—পাগলি কোথাকার। আমাকে আবার চাওয়ার কি আছে ? আমি তো আছিই।

—এভাবে নয়। বৃষ্টি এবার স্পষ্টভাবে কেটে কেটে বলছে কথাগুলো, —অন্য কারুর সঙ্গে শেয়ার করে নয়। আমি এখন অ্যাডাল্ট। ইচ্ছে করলে মার কাছে না থেকে তোমার সঙ্গেও থাকতে পারি। শুধুই আমরা দুজন।

চূড়ান্ত ধাক্কাটাতে সুবীরের মুখ নিমেষে রক্তশূন্য। মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, তা কি করে হয় ? ঝানু মার্কেটিং ম্যানেজার সুবীর রায় দ্রুত গিলে ফেলেছে কথাটা। মুখে হাসি ফোটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হল। সামনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা যেন এতদিনকার চেনা বৃষ্টি নয়, অন্য কোন বৃষ্টি, যার বীজ বোনা হয়েছিল প্রায় এক যুগ আগে, কোর্টরুমে, যে সম্ভবত ভূমিষ্ঠ হয়েছে আজই, সে এ কোন্ খেলায় মেতে উঠতে চাইছে ? সুবীরকে কি যাচাই করতে চায় সুবীরের মেয়ে ?

ওয়েটার খাবার নিয়ে এসেছে। সামান্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারল সুবীর। গরম তাওয়া বসিয়ে দিয়ে গেছে দুজনের মাঝখানে। শব্দ করে ধোঁয়া উঠছে।

বৃষ্টি প্রশ্ন করল, —কি হল ? কিছু বললে না যে ?

—হুঁ...দেখছি...তুই যখন বলছিস্...সুবীর মেয়ের প্লেটে নান্ তুলে দিল, —নে, খেয়ে নে তো আগে। পরে কথা হবে।

সিজলার কেটে মুখে পুরল বৃষ্টি। আয়েস করে চিবোচ্ছে মাংসটা। টেরচা চোখে তাকিয়ে আছে সুবীরের দিকে। সুবীরের মনে হল, মাংস নয়, মেয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে তারই অস্বস্তিটুকু।

মাথা নামিয়ে সুবীর খাবারে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। বৃষ্টির চোখ দুটো কী অসম্ভব তীক্ষ্ণ। সুবীর বুঝি ধরা পড়ে যাচ্ছে। একটা দৃশ্য পলকে চোখের সামনে দুলে উঠল সুবীরের।

...একজন চব্বিশ বছরের যুবক পার্ক স্ট্রিটের পরিত্যক্ত কবরখানায়, ভাঙা বেদির ওপর বসে, গোগ্রাসে মুড়ি চিবোচ্ছে। চারদিকে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মাঝে দুশো বছর আগের অসংখ্য কবর। গাছগাছালি কাঁপিয়ে মাঝে মাঝেই চৈত্রের বাতাস উঠছে এলোমেলো। পাতায় পাতায় শন্ শন্ শব্দ বাজছে। যুবকটি মুড়ি খেতে খেতে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা তরুণ তরুণীদের। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না তো ! দেখতে দেখতেই চোখ আটকেছে রাধাচূড়া গাছের নীচে বসে থাকা শ্যামলা রঙ মেয়েটির দিকে। মেয়েটির চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল, ঘন। সামান্য লম্বাটে মুখ। নাক খুব তীক্ষ্ণ নয়। ঠোঁটের কাছটা অল্প উঁচু। সব মিলিয়ে একটা মায়াজড়ানো ভাব। হাঁটু মুড়ে বসে থাকার জন্য উচ্চতা আন্দাজ করা যাচ্ছিল না ; খুব একটা লম্বা নয়। যুবক লক্ষ করল মেয়েটি ছবি আঁকতে আঁকতে ফিরে ফিরে তার দিকেই তাকাচ্ছে। চোখ দেখে মনে হয় সে যেন এই জগতেই নেই। একবার করে যুবককে দেখেই নিজের স্কেচ্-বুকে ডুবে যাচ্ছে। যুবক চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। মেয়েটি তাকেই স্কেচ্ করছে নাকি ? উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটির আত্মমগ্নতা কেটে গেছে। মুখে অপ্রস্তুত হাসি। যুবক সোজা এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। একেবারে সামনে গিয়ে ঝুঁকেছে স্কেচ্ বুকের ওপর। হ্যাঁ, সেই তো। জুতোশুদ্ধ পা ছড়ানো, গলায় টাই, নিভাঁজ শার্ট প্যান্টের ক্রিজ্, পাশে ব্রিফ কেসটা পর্যন্ত পড়ে আছে। শুধু মুখটাই তার নয়, কোন ভিখিরির যেন। ঠোঙায় মুখ ডুবিয়ে গোগ্রাসে মুড়ি খাচ্ছে। ভিখিরির দু চোখে বিশ্ব গিলে ফেলার খিদে।...

নিজের ভেতর সুবীর আজও স্পষ্ট দেখতে পায় সেই ধোপদুরস্ত ভিখিরির স্কেচটাকে।

জয়া কি করে যে প্রথম দিনই সুবীরের আসল চেহারাটা ধরে ফেলেছিল ?

জয়া বড় বেশি দেখে ফেলেছিল তাকে।

জয়ার চোখের সঙ্গে বৃষ্টির চোখের এত মিল !

বৃষ্টি আবার জিজ্ঞাসা করল, —চুপ করে গেলে কেন ? কি ঠিক করলে ?

—দাঁড়া, একটু তো সময় দিবি। সুবীর ঢোঁক গিলল।

বৃষ্টির মুখে তবু মরিয়া ভাব। যেন একটা দ্ব্যর্থহীন উত্তর ছাড়া সুবীরকে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

—তবু কদ্দিন ?

—অন্তত দু এক মাস। যা মুখে এল বলে ফেলল সুবীর। চকিতে উল্টো প্রশ্ন এসে গেল মাথায়, —তুই আমার সঙ্গে থাকতে চাইছিস্ কেন ? মার সঙ্গে কিছু হয়েছে ?

—নাআ।

—তোর মা জানে, তুই আমার সঙ্গে থাকতে চাস্ ?

—না।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? আমি এটাই চাই।

—তোর মা আপত্তি করতে পারে...

—হু কেয়ারস্।

—দুঃখ পেতে পারে ?

বৃষ্টি ফিক করে হেসে ফেলল।

—মার কথা ছাড়ো। তোমার অসুবিধে আছে ?

কোন উত্তর না দিয়ে করুণ মুখে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল বৃষ্টির বাবা। বৃষ্টি বিন্দুমাত্র নরম হল না,—মার দুঃখ কষ্ট নিয়ে তোমার খুব ভাবনা, তাই না ? বিদ্রূপটা তীক্ষ্ণ ফলার মত বিঁধল সুবীরকে। শেষ চেষ্টা করল তবুও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওভাবে নিচ্ছিস কেন? ছোট থেকে তুই মার সঙ্গে রয়েছিস, একটা এতদিনের অ্যাটাচমেন্ট, তুই চলে এলে মা কষ্ট পাবে না?

বৃষ্টি ন্যাপকিনে হাত মুছে নিল ভাল করে, —আমি কি চাই, আমি তোমাকে বলে দিলাম। এখন তুমি কি করতে পারবে সেটা তোমার ব্যাপার।

সুবীরের মনে হল এই মুহূর্তে তার চারপাশটা বড় বেশি অন্ধকার। নিজের মেয়ের মুখটাও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না সে। আন্দাজে হাত নেড়ে শুধু ওয়েটারকে ডাকতে পারল সুবীর।

॥ ৪ ॥

.....দাস্ দা ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন হ্যাড ডিফারেন্ট স্টেজেস্। ফার্স্টলি ইট ওয়াজ অ্যান অ্যারিস্টোক্র্যাটিক মুভমেন্ট লেড বাই দা....

একটানা ভরাট গলায় লেকচার দিয়ে চলেছেন পি কে সি। লেকচারটা বৃষ্টিকে এক অন্য জগতে নিয়ে চলে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ, সেখানকার দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, কামনাবাসনা ভরা সে এক অন্ধকার সময়। একটা যুগ চলে যাচ্ছে, আরেকটা যুগ আসছে। মাঝের সময়টা বড় নিষ্ঠুর। যুগ পরিবর্তনের ধারাই এরকম।

শুনতে শুনতে বৃষ্টির ডিকেন্সের উপন্যাসটার কথা মনে পড়ে যায়। ...দোজ ওয়্যার দা বেস্ট অফ টাইমস, দোজ ওয়্যার দা ওয়ার্স্ট অফ টাইমস.... মানুষের হিংস্রতা, ক্রূরতা, অব্যক্ত ভালবাসা, মহত্ত্ব....

দেবাদিত্য কিছুতেই বৃষ্টিকে শান্তিতে তার এই প্রিয় ক্লাসটা শুনতে দেয় না। পিছন থেকে অবিরাম ফিসফিস করে চলেছে। কি না বলছে বৃষ্টিকে! মিনার্ভা, এথেনা, উর্বশী। বৃষ্টি বারকয়েক কটমট করে পিছন ঘুরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামিয়ে নিচ্ছে। মাথা নিচু করে নোট নেওয়ার ভান করছে। পেন বন্ধ করেই।

বৃষ্টি আবার সামনে তাকাল। পি কে সি ছড়ানো লেকচার গোটাতে শুরু করেছেন। পিরিয়ড শেষ হয়ে এল।

....বুর্জোয়াজি এবং পুরোহিত সম্প্রদায় তৎকালীন ফ্রান্সের কৃষকদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন...

পি কে সির কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে কার যেন খুব মিল! ভালমামার! এক একদিন মনমেজাজ ভাল থাকলে ভালমামা এভাবেই সুন্দর করে ইতিহাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শোনায় বৃষ্টিকে। সে সব দিন যদিও এখন বিরল। ভালমামার জীবনে দুর্ঘটনাটা না ঘটলে ভালমামাও পি কে সি হতে পারত। ডিগ্রি ছাড়াই হিস্ট্রি, ফিলজফি, পলিটিক্সের ওপর যা দখল। সারাদিনই মোটা মোটা বই ঘাঁটাঘাটি করছে। বৃষ্টির বুকটা টনটন করে উঠল। কি মরতে যে ভালমামা কলেজ স্ট্রীটে এসেছিল কোন এক উগ্রপন্থী নেতার বক্তৃতা শুনতে! তখন নাকি বেশিরভাগ কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরই রক্ত বিপ্লবের নামে চনমন করে উঠত। বিপ্লব তো হয়েছে ছাই। মাঝখান থেকে ভালমামার জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। কেউ কেউ বোধহয় এভাবেই ছিটকে যায় স্বাভাবিক জীবন থেকে।

ঘণ্টা পড়েছে। পি কে সি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেই দেবাদিত্যর দিকে ঘুরে দাঁড়াল বৃষ্টি,

—তুই কি রে? একটা দিনও পি কে সির লেকচার মন দিয়ে শুনতে দিবি না?

দেবাদিত্যর মুখে নকল গাম্ভীর্য—তুই পি কে সির ক্লাস শুনিস?

—তো কি করি?

—খালি তো ওই মুখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস? কেন রে? আমরা নেই? আমাদের দিকে তাকাতে পারিস না?

দেবাদিত্যটা এরকমই বিশ্ব ফাজিল। সারাক্ষণ হ্যা হ্যা করে বেড়াচ্ছে। কলেজের যে কোন জায়গায়, পাঁচ সাতটা মেয়ের জটলায় একটা ছেলে দেখলে দূর থেকেও বলে দেওয়া যাবে ওটাই দেবাদিত্য। সব সময় সখী পরিবৃত। বৃষ্টি ভাবতেই পারে না যে ছেলের বাবা মারা গেছে আট বছর বয়সে, মা চোদ্দ বছরে, মানুষ হচ্ছে কাকার কাছে, সে কাকাও নাকি এমন কিছু রাজার হালে রাখে না ভাইপোকে, সেই ছেলের এত লাইফ ফোর্স আসে কোত্থেকে?

তৃষিতা একদিন বলছিল,—দেবাদিত্যর ব্যাপারই আলাদা। ওর পাঁচটা ফুসফুস আছে। একেকটা ফুসফুস একেকটা মেয়ের জন্য রিজার্ভড। একসঙ্গে ও পাঁচটা মেয়ের জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। ফুসফুসগুলোর নেচারও আলাদা আলাদা। শান্ত নরম মেয়ের জন্য শান্ত নরম ফুসফুস, এই ধর্ বালিহাঁস টালিহাঁস টাইপের, উদ্দাম বন্য মেয়ের জন্য একটা নেপোলিয়ানিক ফুসফুস, ফাজলামির জন্য মোল্লা নাসিরুদ্দিনের...

পরভিন প্রশ্ন করেছিল,—আর ওই যে ইনা বলে মেয়েটার সঙ্গে ঘোরে, যাদবপুরে জিওলজি না কি পড়ে, মেয়েটার তো হেভি ফান্ডা...ওর জন্য?

মীনাক্ষী বলে উঠেছিল,—ওর জন্য একটা বিক্রমাদিত্যের ফুসফুস আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ফুসফুসের কিছুটা সেডিমেন্টারি রক, কিছুটা গ্রানাইট। নইলে জিওলজির সঙ্গে খাপ খাবে কি করে ?

রণজয় বলেছিল,—আসলে চার পাঁচটা ফুসফুসের কমে ও বাঁচবেও না। যা বীভৎস জায়গায় থাকে ! একদিন ওর বাড়ি গিয়েছিলাম...প্রথমে তো কিছুতেই নিয়ে যাবে না, ট্যাগুাই ম্যাগুাই করছে...তারপর সে কি গলি ! গলির পর গলি, তস্য গলি, জীবনে কোনদিন সেসব জায়গায় রোদ্দুর ঢোকে না, স্কটিশচার্চ স্কুলের পেছনে, বিশ্রী চাপা দুর্গন্ধ, ভ্যাটে নোংরা পচে আছে, জাস্ট মনে মনে হেল ভিশুয়ালাইজ কর, তা হলেই বুঝে যাবি। ওখানে থাকতে গেলে দুটোর বেশি ফুসফুস লাগবেই, নইলে টিবি হয়ে মরতে হবে। তার ওপর ওর কাকিটার যা পচা মেজাজ...

বৃষ্টি চুপ করে শুনছিল। ওরকম অন্ধকার স্যাঁতসেতে গলির বাড়িগুলো কেমন হয় সে জানে। তার ঠাকুর্দা ঠাকুমাই তো থাকে ওরকম বাড়িতে। খুব ছোটতে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গিয়েছে সে। দাদু, ঠাকুমা, জেঠু, জেঠি বাদে আর সবাই কেমন মিন টাইপের। মানে বাবার জ্যাঠা কাকার দল। হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার ঘুপচি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি জেরাই না করত।

—তুই সুবুর মেয়ে ?

বৃষ্টি ভয়ে ভয়ে বলত,—হুঁ।

—তুই তো সুবুর কাছে থাকিস না, তাই না ?

বৃষ্টি রা কাড়ত না।

—তোর মা চাকরি বাকরি করছে ?

বৃষ্টি গম্ভীর হয়ে যেত,—মা এখন বিজনেস করে। নিখিলমামার সঙ্গে।

শুনে টাকমাথা লুঙ্গিপরা বাবার জাড়তুতো দাদাটার কি খ্যা খ্যা হাসি। ঘরে ঢুকে জোরে জোরে বউকে বলত,— অনু, সুবুর মেয়ের কথা শুনেছ ? ওর মা নাকি এখন বিজনেসে নেমেছে।

বৃষ্টি তখন হাসিটার অর্থ বুঝতে পারেনি। বাবাকে বলেছিল, মা বিজনেস করে শুনে ওরা অত হাসাহাসি করছে কেন ?

বাবা বলেছিল,—ওদিকে যেতে হবে না। ঠাকুমার কাছে যা।

ওরকম দম চাপা শ্যাওলাধরা বাড়িতে থাকলে মনটাও বোধ হয় ছোট হয়ে যায়। দেবাদিত্যর কাকি নাকি রণজয়কে শুনিয়েই বলে উঠেছিল, —বন্ধুবান্ধবের চা বিস্কুটের পয়সা কি তোমার বাবা ধরে দিয়ে গেছে ?

দেবাদিত্য হাতের মুদ্রায় বোঝাতে চেয়েছিল, কাকি পাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারা। বৃষ্টির দেবাদিত্যর ওপর মায়া হয়েছিল খুব। ওরকম একটা সংসারে আরশোলা টিকটিকির মত থাকতে হয়, বাবা মা কেউ নেই। থাকলেও কি খুব ভাল হত ? কে জানে ?

হাতের ব্যাগ দিয়ে দেবাদিত্যর পিঠে ঠোক্কর দিল বৃষ্টি, —তোর দিকে তাকাতে যাব কেন রে ? নিজের মুখ কখনও আয়নায় দেখেছিস ?

সঙ্গে সঙ্গে ফাজিল ছেলেটা একেবারে কাছে এসে বৃষ্টির চোখে চাখ রেখেছে,—দেখেছি। তোদের চোখের আয়নায়। চপ খাওয়াবি ?

বৃষ্টি হেসে ফেলল। এমন মজার কথা বলে দেবাদিত্য ! তার কলেজের বন্ধুগুলো স্কুলের বন্ধুদের থেকে এত আলাদা। নিষেধের কাঁটাতার তুলতে চাইলেও হেঁচকা টানে সেটাকে উপড়ে দেবে এই সব বন্ধুরা। টাটকা বাতাসের ধাক্কায় বৃষ্টির মনে একটু আগেও জমে থাকা মেঘটা উধাও।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রনিদের বাড়ির সামনে আসতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল বৃষ্টির ! কী তুমুল চিৎকার, তর্জনগর্জন ! রনির মা বাবা অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তিখেউড় করছিলেন পরস্পরকে। এমন চেঁচামেচি যে বাইরেও লোক দাঁড়িয়ে গেছে দু একটা।

এমনিতে বৃষ্টিদের পাড়ায় অন্যের বাড়িতে সচরাচর উঁকি দেয় না কেউ। আধুনিক সভ্যতার নিয়ম মেনে প্রতিটি বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে উদাসীন স্ট্রীটলাইটের মত। কখনও কখনও একটা বাতি নিভু নিভু হলে অন্যের আলো এসে পড়ে তার ওপর। সৌজন্যের। তার বেশি কিছু করা এসব পাড়ায় প্রাচীন গ্রাম্যতা বলে মনে করা হয়। কৌতূহল এখানে ভীষণ চাপা। চাকরবাহী। তবে কলহের মাত্রা বস্তির পর্যায়ে নামলে একটু চাঞ্চল্য তো জাগবেই।

মোড়ের মাথায় পিকলু টুকুনকে দেখে বৃষ্টি জিজ্ঞাসা করেছিল, —কি ব্যাপার রে ? সাতসকালে ষাঁড়ের মত চেল্লাচ্ছে কেন দুজনে ?

পিকলু বলে উঠেছিল,—রনির বাবা মাসের দু সপ্তা যেতেই সব টাকা ঘোড়ার পেছনে ঢেলে আসে ; কোন বউ সহ্য করবে ?

টুকুন বলল,—বাজে বকিস না। রনির মার বাতিক আছে। রনির বাপটাকে সবসময় এমন সন্দেহ করে...ভাষা শুনেছিস ? দিনের পর দিন রনিটা কি করে যে বরদাস্ত করে !

কি ব্যাপার কে জানে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কি শুধু এই পরিণতি ? রনির মা কী ভালই না বাসতেন বৃষ্টিকে ছোটবেলায়। একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরস্বতী পুজোর দিন রাস্তার মাঝখানে বৃষ্টির শাড়িটাড়ি খুলে বিদিকিচ্ছিরি অবস্থা। মাসিমা কী যত্ন করে কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন। রনির সঙ্গে খেলতে গিয়ে ঝগড়া হলে সব দোষ রনির। বৃষ্টি খুব লক্ষী মেয়ে। রনির জন্মদিনে কী সুন্দর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাতেন। সেই মাসিমা ওরকম নোংরা ভাষায়.... !

দেবাদিত্য আবার খোঁচাচ্ছে বৃষ্টিকে,

—এই বৃষ্টি, খাওয়া না মাইরি। অতগুলো স্কলারশিপের টাকা ড্র করলি...

—অ্যাই না। তৃষিতা পিছন থেকে গলা ওঠাল—বৃষ্টি কদিন ধরে যা ড্রেস মারছে, ক্যান্টিনে ওর নো অ্যাডমিশান হয়ে গেছে। গেলেই হাইজ্যাকড। আর তোরাও সব এমন কিছু মেডিভাল নাইট নো'স যে ওকে উদ্ধার করে আনতে পারবি।

কালো লঙস্কার্টের ওপর মিশকালো টপে বৃষ্টি আজ ভিক্টোরিয়ার পরী। কালো রঙই তার সব থেকে প্রিয়।

নাইটদের নাম শুনে শুভ ফিচেল হাসি হাসল,—নাইটরা কি শুধু মেয়েদের উদ্ধারই করত রে ? চেস্টিটি বেল্টের গল্প জানিস না ? সেই ক্রুসেড লড়তে যাওয়ার সময় নাইটরা বউদের চেস্টিটি বেল্ট পরিয়ে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়ে যেত। অন্য নাইটদের ভয়ে। তার মানে বুঝলি তো ? নাইটমাত্রই সাধুসন্ত নয়। আমরা যদি সেরকম নাইট হই সেটা কি ভাল হবে ? তা বস্, রোজ রোজ তোমার এরকম খুনখারাবি ড্রেসই বা কেন ? এনিথিং ঢুকুঢুকু ?

দেবাদিত্য বৃষ্টির হাত ধরে টানল,—ঢুকুঢুকু কেন ? ওপেন। আমার সঙ্গে। চল্ তো বৃষ্টি আমরা নিমতলায় যাই।

কলেজ ক্যান্টিনে ঢুকতে গেলেই প্রথম যে অনুভূতির সম্মুখীন হতে হয় সেটা হল অন্ধকার। তারপর মোহনদার উনুন আর অজস্র সিগারেটের ধোঁয়া মিলেমিশে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ। একসময়ের সাদা দেওয়াল বিবর্ণ বাদামী। এটাই দেবাদিত্যর নিমতলা।

প্রথম প্রথম এখানে ঢুকতে বৃষ্টির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। চোখমুখ জ্বালা করত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

সুদেষ্ণা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঢুকেছে যথারীতি,

—শুভ, একটা সিগারেট দে তো।

শুভ প্যাকেট খুলে সিগারেট গুনল। বেজার মুখে বলল, —তুই তো তিনটে টান মেরে ফেলে দিবি, কি লাভ হয় এরকম সিগারেট খেয়ে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদেষ্ণা শুভর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট প্রায় ছিনিয়ে তুলে নিল, —ধোঁয়ার গন্ধটা কম লাগে।

বৃষ্টি মুখ বেঁকাল। হুঁঃ, ধোঁয়ার ভ্যাক্সিনেশান! কত ঢংই না জানে সুদেষ্ণা।

সুদেষ্ণাকে বন্ধুবান্ধবরা প্রায় কেউই পছন্দ করে না। সে কলেজে এসে প্রথমদিনই জানিয়েছে তার বাবা বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর অসিত দাস। তার মা তিনটে নামকরা সোশাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট কিংবা ভাইস প্রেসিডেন্ট। সে পর-পর দুদিন এক রঙের গাড়ি চড়তে পারে না। দরকারে অদরকারে লোকজনকে দেদার টাকা বিলোয় সে। কলেজের দারোয়ানের মেয়ের বিয়েতেও অবলীলায় তিনটে একশ টাকার নোট বার করে দিয়েছিল। সে অর্থ দিয়ে কুর্নিশ কিনতে ভালবাসে। তার দুটো সেকেন্ড জেনারেশান অ্যালসেশিয়ান, একটা খাঁটি বিদেশী স্প্যানিয়েল আর একজন টল ডার্ক হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেণ্ড আছে।

ক্যান্টিনের দরজায় দরজায়, সিঁড়িতে দল বেঁধে বসে ছেলেমেয়েরা। গোছায় গোছায়। আলাদা আলাদা। বাংলার শিক্ষাসংস্কৃতির পীঠস্থান ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেরই নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে। চট করে কেউ তার বাইরে যায় না। আবার সব নিয়মেরই তো কিছু ব্যতিক্রম থাকে। দেবাজিত্য সেই ব্যতিক্রম। সুদেষ্ণাও।

শুভ হাঁক মারল, এই বাচ্চা, কি আছে রে?

এতটুকুন একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে, টেবিলের পাশে। হাইট টেবিলের মাথায় মাথায়। খালি গা, কালো রঙ, দেবশিশুর মত মুখ। কি করে যে মোহনদা ঠিক একটা করে বাচ্চা জোগাড় করে ফেলে! এই চার মাসে কম করেও গোটা পাঁচেক বাচ্চা বদল হতে দেখল বৃষ্টি। শিশুশ্রমিক নাকি এদেশে বেআইনি।

বাচ্চাটা গড়গড় করে ধারাপাত মুখস্থ বলে চলেছে,—চা, চপ, ডিমের ডিবিল, মাপলেট...

একদম উল্টোদিকে, কোণে, ফিলজফির অর্চিতা এক গণ্ডা বাউল নিয়ে বসে! নিজেই মাঝে মাঝে তাদের গুপীযন্ত্র নিয়ে পিড়িং পিড়িং বাজাচ্ছে। একটা বাউল তো বেশ বুড়ো। লোকটার সামনের প্লেটে চারখানা চপ। কী বিদঘুটে শখ যে অর্চিতার! বাউল ধরে গান শোনার!

বৃষ্টি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,— কিরে, এবার কোন ডিস্ট্রিক্ট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বাঁকুড়া। ওন্দার কাছে হেতমপুর গ্রাম থেকে। শুনবি ? এর গান শুনবি ?

বৃষ্টি মুখে বলল,—পরে। মনে মনে বলল, রক্ষে করো।

কে যে কিসে আনন্দ পায় !

রণজয় ব্যস্তসমস্তভাবে ক্যান্টিনে ঢুকে বৃষ্টিদের টেবিলে এসে বসে পড়ল,—অ্যাই, ডেট ফেট ফাইনাল। স্যারের সঙ্গে কথা হয়ে গেল। তিনটে জায়গার অপশন আছে। রাজগীর, নেতারহাট, শিমলিপাল। চুজ করো কোথায় যাবে।

—রাজগীর ঠিক হয়েছিল না ?

—দুটো অপশন বেড়েছে। চারদিনের ট্যুর। বাজেট পার হেড চারশ টাকা।

শুভ হৈ হৈ করে উঠল,—শিমলিপাল, শিমলিপাল।

রণজয়ের কথাটা কানে বাজল বৃষ্টির। রাজগীর, নেতারহাট, শিমলিপাল। নেতারহাট নামটা বড় চেনা চেনা ! নেতারহাট না মাদারিহাট কোথায় শেষবারের মত বেড়াতে গিয়েছিল বাবা মার সঙ্গে ? দূর, মাদারিহাট তো নর্থ বেঙ্গলে। নেতারহাটেই গিয়েছিল। বাবার কাছে শুনেছে আরও ছোটতে নাকি ওয়ালটেয়ার গিয়েছিল তারা। আরেকবার সিমলা। সেই জায়গাগুলোর কথা কিছুই মনে নেই। বরং আবছাভাবে মনে আছে নেতারহাটের কিছু কথা। নীল আকাশ ছোঁওয়া উঁচু উঁচু গাছ, যতদূর চোখ যায় সবুজ এক উপত্যকা, একটা টলটলে জলের হ্রদ, গাঢ় সোনালি রঙ রোদ্দুর।

—কিরে সুদেষ্ণা, তুই কি ঠিক করলি ?

—শিমলিপাল নয়, রাজগীর চলো। হটস্প্রিং আছে, নালন্দা আছে...

—টি এমও সেই কথাই বলছিলেন। আরও কত ধ্বংসাবশেষ...

—ছাড় তো, টি এম-এর ধান্দা অন্য। ওখানে জরাসন্ধর কুস্তির আখড়া আছে না ? টি এম তো প্রতি বছরই নেতাজি ইনডোরে টিকিট কেটে কুস্তি দেখতে যান। ধোবি প্যাঁচ, এরোপ্লেন স্পিন প্যাঁচ সব কিছুরই তো অরিজিন জরাসন্ধ।

বিক্রমের রসিকতায় হাসির হল্লা উঠল।

—কিরে বৃষ্টি, তুই কিছু বলছিস না যে ?

বৃষ্টি অন্যমনস্ক। স্কুল থেকে কতবার বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বৃষ্টি কোনও এক্সকারশানেই যায়নি। বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলেই একটা চাপা অস্বস্তি হত তার। যদি কেউ বাবা মার কথা তোলে! বাবা মার ডিভোর্সের ব্যাপারটা স্কুলের সকলেই জানত যে। ছোটখাটো খোঁচাও সে কম খায়নি।

শম্পা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলত ; —তোর তো মজা রে শিঞ্জিনী, দুটো বাড়ি, ডবল আদর, তার ওপর তোর মা আর বাবা যদি আবার বিয়ে করে তা হলে মোট দুটো মা, দুটো বাবা। তুই কি লাকি রে!

ওই বয়সের ছেলেমেয়েরা এমন নির্মম হয়! কলেজে ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে কেউ কারুর বাবা মার অতীত নিয়ে সেভাবে কৌতূহলী নয়। অন্তত বৃষ্টির তাই ধারণা।

তৃষিতা ঠেলল বৃষ্টিকে,—এই বৃষ্টি, কোথায় হারিয়ে গেছিস? ফের। ফের। নেতারহাট ভোটে জিতছে। এনি অবজেকশন?

বৃষ্টির মনে তবুও দ্বিধা। গেলে হয়।

—কিরে, যাচ্ছিস তো তুই?

—দেখি, পরে জানাব।

—নো পরে ফরে। পরশু টাকা ডিপোজিট করতে হবে। কিরে দেবাদিত্য তুইও চুপ যে?

তৃষিতার প্রশ্ন দেবাদিত্যও যেন এড়ানোর চেষ্টা করল, —আগে তো চপের অর্ডারটা দে। এই শুভ, দ্যাখ না।

শুভ গলা ওঠাল,—এই বাচ্চা, সাতটা ভেজিটেবল চপ। সঙ্গে সাত কাপ গরম জল।

সুদেষ্ণা রসিকতা পছন্দ করে না,

—নারে। সাতটা চপ। সাতটা চা।

শুভ আয়েস করে আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ফট করে তার হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। শুভর মতই আরাম করে টান দিল। আআহ্। ধোঁয়াগুলো মাথায় ঢুকে কারুকার্য শুরু করে দিয়েছে। জন্মদিনের দিন প্রচণ্ড জোরে টেনে ফেলেছিল। জীবনের প্রথম টান। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কী জোর ধাক্কা! কাশতে কাশতে চোখ মুখ লাল। কাশি থামার পর কনুই দুটো টেবিলে রেখে চুপচাপ মাথা চেপে বসেছিল অনেকক্ষণ। ক্রমে মাথার ভেতরটা কি আশ্চর্য রকমের হাল্কা!

বিক্রম চোখ গোল করে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির দিকে,

—বস্। তুমি তো বেশ ওস্তাদ হয়ে গেছ! কাউন্টারটা আমায় দিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি মনে মনে হাসল। তাকে তো ওস্তাদ হতেই হবে। সে এখন আঠেরো।

দূরের টেবিলে একজনকে হাত নাড়ল দেবাদিত্য। বৃষ্টি ঘুরে তাকাল। অরিজিৎ রোজকার মতই একলা এসেছে চা খেতে।

—এই অরিজিৎ, ওখানে কেন ?

অরিজিৎ টেবিলের কাছে এল কিন্তু বসল না।

—বোস্।

—নারে, আমি একটু লাইব্রেরি যাব।

—এক্সকারশনে যাচ্ছিস তো ? কদিনের জন্য তোর লাইব্রেরি কিন্তু বন্ধ থাকবে।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না অরিজিৎ,—ইচ্ছে তো আছে। পরশুই দেখতে পাবি যাচ্ছি কিনা।

সুদেষ্ণা বৃষ্টির কানে কানে বলল, —বাবার পারমিশন পাওয়ার আগে পর্যন্ত ও ডিসিশন জানাতে পারবে না। পিতৃভক্ত রামের এক কাঠি বাড়া। পিতৃভক্ত রামপ্রসাদ। বউ নিয়ে বিছানায় শোওয়ার আগেও বাবার অনুমতি নেবে।

সারাক্ষণ বই-এর পাতায় মুখ গুঁজে থাকে অরিজিৎ। হাই মাইনাস পাওয়ারের চশমা। বয়সের তুলনায় মুখটা বেশ ভারিক্কি। দেখলে মনে হয় যেন কনফুসিয়াসের জীবনপঞ্জি, লাইব্রেরি আর আলাউদ্দিন খিলজির ওপর সেমিনার অ্যাটেন্ড করার জন্যই অনেক কষ্টে বেঁচে রয়েছে সে।

বৃষ্টির সুবীরের মুখটা মনে পড়ে গেল। তার জন্মদিনের পর পরই ফরিদাবাদ চলে গেছে। যাওয়ার দিন সকালে ফোন করেছিল। গলায় নকল উচ্ছ্বাস ফোটালেও বাবার ঘাবড়ানো ভাবটা এখনও যায়নি। মেয়ের একটামাত্র আক্রমণেই অবস্থা বেহাল ? হায় রে।

বাচ্চা ছেলেটা সাতটা ডিশ অদ্ভুত কায়দায় ব্যালেন্স করতে করতে টেবিলে এনে রাখল। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেন ভাসতে ভাসতে এল ছেলেটা।

—বাচ্চাগুলো তো সার্কাসে যেতে পারে রে, তবু একটা হিল্লে হয়। দুহাত নেড়ে বাচ্চাটার হাঁটার ভঙ্গি বন্ধুদের নকল করে দেখাচ্ছে দেবাদিত্য,—কি হাতের ব্যালেন্স দেখেছিস ?

শুভ কথাটাকে খুব একটা আমল দিল না। চপে কামড় বসিয়ে প্রশ্ন করল,—ড্রিঙ্কস কি কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হবে ? বিহারে নাকি দাম কম ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষিতা আঁতকে উঠল,—তুই ড্রিঙ্ক করবি ?

—করি তো মাঝে মাঝে। একটু একটু। বাবার বোতল থেকে।

—ধরা পড়ে যাস না ?

—যতটা খাই ততটা জল ঢেলে রেখে দিই। বাবাটাও হেভি সেয়ানা। বোতলে দাগ মেরে রাখে আজকাল। সেদিন মার ওপর খুব হম্বিতম্বি করছিল, স্কচ এত লাইট হয় কি করে ? এ নির্ঘাত তোমার গুণধর ছেলেদের কাজ। যেদিন হাতেনাতে ধরব...

বৃষ্টি লক্ষ করল হাসতে হাসতে শুভর চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। মুখ চোখ টানটান,

—তুমি শালা নিজে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাল খেয়ে হল্লা করবে, রাতদুপুর অবধি ব্লু দেখবে, আর ছেলেদের বেলায় নীতি ঝরে পড়ছে। হিপোক্রিট। দেব একদিন একখানা ক্যাসেট হাপিস করে... রাজীবদের ফ্ল্যাটটা তো ফাঁকাই....

—অ্যাই। কি হচ্ছে কি ? রণজয় ধমকে থামানোর চেষ্টা করল শুভকে।

—হবে আবার কি। আমার কাছে কোন রাখঢাক গুড়গুড় নেই। শুভ বেপরোয়া,—নিজের বাপ বলে কি ধোওয়া তুলসীপাতা নাকি ? যা ফ্যাক্ট শুভ সেটা বলবেই।

অবাক চোখে শুভকে দেখছিল বৃষ্টি। অনেকটা যেন তার মনের কথাই বলছে শুভ।

মিনিট খানেক টেবিলে সবাই নীরব। থমথমে আবহাওয়াটা কাটাতেই বোধ হয় বিক্রম বলে উঠল—রণজয়, পরভিন যাবে না ?

রণজয় চোখ কুঁচকে তাকাল বিক্রমের দিকে,—আমি কি করে বলব ?

বিক্রম আবার জিজ্ঞাসা করল, ও আজকে কলেজে আসেনি কেন রে ?

চপে কামড় দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রণজয়।

—আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

—ওর বাড়ি থেকে ওকে ছাড়বে ? বিক্রমের মুখে তবু নিরীহ জিজ্ঞাসা।

তৃষিতা, সুদেষ্ণা, দেবাদিত্য সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। বৃষ্টি বুঝল একটা নাটক চলছে, কিন্তু কি যে ঘটছে সে ঠিক ঠিক ধরতে পারছে না। বোকা বোকা মুখে তৃষিতার দিকে তাকাল।

তৃষিতা বৃষ্টির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, —সেদিন রণজয়কে আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে বললাম, গেল না, মনে আছে ? সেদিনই সন্ধেবেলা নিউ এম্পায়ার থেকে পরভিনের সঙ্গে বেরোচ্ছিল, মীনাক্ষি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছে। বেকবাগানের মোড়েও পরশু বিকেলে...

রণজয় তৃষিতার ফিসফিস কথায় হঠাৎ ভীষণ খেপে গেল,— তোদের কি আর কোন টপিক নেই ? সব কিছুর একটা লিমিট আছে।

দেবাদিত্য আর চুপ থাকতে পারল না, —ঠিকই তো। এমনভাবে সবাই রণজয়কে আঙুল দেখাচ্ছে যেন রণজয় একাই মাছরাঙা। এদিকে আমি যে অবিরাম পুকুরে ঠুকরে যাচ্ছি, সেটা কেউ পাত্তাই দেয় না !

ঘন গুমোট আবহাওয়াকে ফুরফুরে করে তুলতে সত্যিই দেবাদিত্যটার কোন জুড়ি নেই। গুম হয়ে যাওয়া শুভ পর্যন্ত হেসে ফেলল।

ঠিক এই মুহূর্তে যে ঘটনাটা ঘটলে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যেত, সেই ঘটনাটাই ঘটল। ক্যান্টিনে ঢুকছে পরভিন স্বয়ং। সঙ্গে মীনাক্ষি। এদিক ওদিক তাকিয়ে বন্ধুদের খুঁজছে।

দেবাদিত্য সুর ভেঁজে উঠল, —এই মাছ এসে পড়, টেবিলেতে বসে পড়...

রণজয় আর থাকতে পারল না, হিংস্র চোখে সবার দিকে তাকিয়ে উঠে গেল টেবিল ছেড়ে।

পরভিন সরল মুখে জিজ্ঞাসা করল, —আমাদের দেখে রণজয় উঠে গেল কেন ?

—ও কিছু না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল দেবাদিত্য, —ওই নেতারহাটে এক্সকারশানে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে কটা বোতল যাবে, তাই নিয়ে রণজয়ের সঙ্গে শুভর ঝগড়া হচ্ছিল।

—বোতল ? কেন ? পরভিনের চোখে অপার বিস্ময়।

—ছিপি খুলে খাওয়ার জন্য ভাই। তুমি ড্রিঙ্কস-এর নাম শোননি ?

দেবাদিত্যর ঠাট্টায় পরভিন হোঁচট খেল। নিচু গলায় প্রশ্ন করল, —ড্রিঙ্ক করলে মুখ থেকে খুব গন্ধ বেরোয় না ?

বিক্রম হা হা করে হেসে উঠল, —নিশ্চয়ই বেরোয় খুকুমণি। তুমি খাবে ? পাঁচদিন মুখ থেকে গন্ধ বেরোবে। মিনিমাম।

সুদেষ্ণা বলল, —কেন এত ভয় দেখাচ্ছিস ওকে ? নারে পরভিন, তুই জিন খেয়ে দেখতে পারিস ? জিনের গন্ধ বেশিক্ষণ থাকে না। চল, নেতারহাটে তোকে টেস্ট করাব।

পরভিনের মুখটা হঠাৎ কেমন কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল। তার গলায় মিনতির সুর,—অ্যাই বৃষ্টি, তৃষিতা, তোরা একবার আমার বাড়িতে গিয়ে বলবি ? ছেলেরা যাচ্ছে সে কথা বলার দরকার নেই। বলবি কমপাল্‌শন। লেডি প্রোফেসররাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে।

পরভিনের কথায় শুভ বিরক্ত হল,—কেন ? আমরা কি বাঘ ভালুক নাকি ? মেয়ে দেখলেই গপ করে খেয়ে ফেলব ?

পরভিনের চোখে অসহায় ভাব, —দ্যাখ, সব বাড়ি তো একরকম হয় না। আমি তো তোদের বলেইছি আমাদের বাড়ি কিরকম কনজারভেটিভ। এই কো-এড কলেজে পড়ি বলে এখনও কম কথা শোনায় দাদাসাহেব ! আমি জোর না করলে...

বৃষ্টি পরভিনের পিঠে হাত রাখল,—ডোন্ট ওরি। আমরা এমনভাবে তোর বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসব যেন না গেলে কলেজ থেকেই তোকে...

—তার সঙ্গে বলে দিস নেতারহাটে মোঘল পিরিয়ডের প্রচুর রেলিক্স আছে। দেবাদিত্য ফুট কাটল, —নতুন খোঁড়াখুড়ি শুরু হয়েছে...

—যদি জানতে পারে গুল মারছি ?

—ছাড় তো। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে নতুন জায়গায় গাঁইতি মারা শুরু হয়, নইলে আমাদের বইগুলো অত মোটা হয় কি করে ?

সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়াল,—আমি চলি রে, জয়ন্ত ব্রিটিশ কাউন্সিলের গেটে ওয়েট করবে। ওর কাছে আজকের ফিল্মের কার্ড আছে।

—কি বই ?

—দা স্প্রিং। রোমান্টিক। জয়ন্ত রোমান্টিক ফিল্ম ভীষণ পছন্দ করে।

রোমান্টিক ? না উদ্দাম জড়াজড়ি ? বৃষ্টি দেবাদিত্যর দিকে বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শুভ বলল, —কিরে, তুইও সুদেষ্ণার সঙ্গে চললি নাকি ?

—ধুস। ওরা হাত ধরাধরি করে চাঁদ দেখুক। আমার খেয়েদেয়ে অনেক কাজ আছে।

কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে এসে একটু দাঁড়াল বৃষ্টি। পুরনো আমলের ভারী থামগুলোর পাশে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা প্রেমের ক্লাসে মগ্ন। কি যে এত কথা থাকে এদের ? তিন-চারটে জোড়াকে বৃষ্টি চিনতে পারল। তুখোড় প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে এদের বেশ নাম হয়েছে কলেজে। শেষ থামের পাশে বসা ভাস্বতী আর সন্দীপকে নিয়ে উপকথাও চালু হয়ে গেছে। মীনাক্ষি বলছিল অর্চিতা নাকি গান বেঁধেছে ওদের নিয়ে। গ্রামেগঞ্জে বাউলদের দিয়ে গাওয়াবে সে গান।

সন্দীপ নাকি ভাস্বতীকে বলে, —আমি তোমাকে ভালবাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাস্বতী বলে, —জানি।

সন্দীপ বলে,—তোমার ফিলজফির নোটটায় ভুল আছে।

ভাস্বতী বলে,—জানি।

সন্দীপ বলে, —তোমার বাবা আমাকে দেখলেই চটে যায়।

ভাস্বতী বলে, —জানি।

সন্দীপ বলে, —তোমাকে নিয়ে একটু ঝোপের আড়ালে যেতে ইচ্ছে করছে।

ভাস্বতী বলে, —জানি।

তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে যায়। তারপরের দৃশ্যগুলো অ্যাডাপ্ট। এই নিয়েই হবে অর্চিতার গান। ময়মনসিংহ গীতিকার সুরে।

বৃষ্টি ঠোঁট কামড়াল। প্রেমের শেষ দৃশ্য তো রনির মা-বাবা। কিংবা তার নিজের। রোমিও জুলিয়েটের বিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত হয়ত একই অবস্থা হত। জুলিয়েট কৌটো ছুঁড়ছে, বাসন ভাঙছে; রোমিও রাগে গরগর করতে করতে হিংস্র নেকড়ের মতো গোটা বাড়ি দাপাচ্ছে। আর শহরের লোক তালি দিয়ে মজা দেখছে। হাহ্।

হাঁটতে হাঁটতে কলেজের বাইরে এল বৃষ্টি।

ভবানীপুরের নীলামাসির বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই বৃষ্টি বুলবুলদির গলা পেল। চোস্ত হিন্দিতে দক্ষিণ বারাসতের কাজের লোকটাকে ধমকাচ্ছে। বৃষ্টি ঢুকতেই গলার স্বর বদলে ফেলল,

—ওমা তুই এসে গেছিস? আমি আজ সন্ধেবেলা ঠিক তোদের বাড়ি যেতাম।

বৃষ্টি বলল, —ছাড়ো তো, সেই আমাকে ফাঁসালে...? এখন বই দুটো চটপট দিয়ে দাও। না হলে আজ বাড়ি ঢোকা যাবে না।

—কেন রে? বাবলুমামা খুব রেগে গেছে?

—রাগবে না? জানো না ওগুলো ভালমামার হাড়পাঁজরা? কাল বাড়িতে এই নিয়ে তুলকালাম হয়ে গেছে। তোমাকে নাকি তিন-চার বার ফোন করে দিয়ে যেতে বলেছিল...

কাজের মেয়েটা কথার ফাঁকে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, তার মুখ থেকে খবর পেয়েই বোধহয় নীলামাসি বেরিয়ে এসেছে,

—এই তো বৃষ্টি এসে গেছে। বৃষ্টি, তুই একটু বোস তো, চিংড়িমাছের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নতুন প্রিপারেশন করেছি চিলি সস, সয়া সস আর ধনেপাতা দিয়ে, এরা কেউ খেতে চাইছে না, তুই একটু টেস্ট করে দ্যাখ তো।

বৃষ্টি ভাবল কী কুক্ষণেই না এসে পড়েছে সে। মার এই মাসতুতো দিদিটির অদ্ভুত সব কুখাদ্য রান্না করার বাতিক আছে। এই ভয়ে বুলবুলদির বন্ধুরা এ বাড়ির পথ মাড়ায় না, আত্মীয়স্বজনরা আঁতকে ওঠে। বৃষ্টিও আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে। তাও কিনা ফেঁসে গেল আজ ?

কাজের মেয়েটা স্যুপ খাওয়ার বাটিতে একটি ঘন কালো মণ্ড এনে টেবিলে রাখল। সেদিকে তাকিয়েই বৃষ্টির গা গুলিয়ে উঠল। বুলবুলদি সামনের সোফায় বসে দিব্যি মিটিমিটি হাসছে।

বৃষ্টির একটু রাগই হল এবার,— তুমি কি গো ? ভালমামা তোমায় ফোন করল আর তুমি ডুব মেরে বসে রইলে ?

বুলবুলদি বলল, —যাহ্ বাবলুমামা ফোন করেছে না হাতি। একবার করেছিল তাও কথা বলতে না বলতেই লাইন কেটে গেল। তোদের কলকাতায় কি এক বাড়িতে তিন-চারবার ফোন পাওয়া যায় ?

বৃষ্টি বুলবুলদির মুখ দেখেই বুঝতে পারল বুলবুলদি মিথ্যা কথা বলছে। বুলবুলদি লেখাপড়ায় এত ভাল, সোশিওলজিতে পি.এইচ.ডি. করছে, এত সুন্দর দেখতে, তবু দুটো যা বদভ্যাস আছে! এক, মিথ্যা কথা বলতে চোখের পাতা কাঁপে না, দুই, যে কোন কথা শুরু করলেই তা শেষ করে কলকাতার নিন্দা দিয়ে।

বুলবুলদি বৃষ্টির গম্ভীর মুখ দেখে কি বুঝল কে জানে, গলা নরম করল একটু, —কাল সন্ধেয় ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার সময় ভাবলাম তোদের বাড়ি যাই, এমনভাবে লোডশেডিং হয়ে ট্রামগুলো সব দাঁড়িয়ে পড়ল...সত্যি, তোদের জন্য কষ্ট হয়, কি বিচ্ছিরি শহরে যে মানুষ হয়েছিস তোরা। আমাদের দিল্লিতে বাবা...

নীলামাসি বলল, —থাম্ তো। দিল্লিতে তো শুধু অফিস, বিজনেসডিল্ আর ভাও। ছ্যা ছ্যা ওখানে মানুষে থাকে ? কলকাতায় লোডশেডিং হয় বলেই তো লোকে জ্যোৎস্না দেখতে পায়, চাঁদের দিকে তাকায়, কবিতা লেখে...।

নীলামাসির কথায় কৃতজ্ঞ বোধ করল বৃষ্টি। গপগপ করে উৎকট ঝাল খাবারটাও গিলে নিল। নীলামাসি ভীষণ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল,

—কেমন হয়েছে রে ?

বৃষ্টির বলতে ইচ্ছে করছিল, এক গ্লাস জল ; মুখ দিয়ে বেরল, —ভাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলামাসি গজগজ করতে শুরু করল, —তাও তো তুই কিছু বললি, যেমন বজ্জাত হয়েছে বুলবুলের বন্ধুরা, তেমন হয়েছে তোর মা। কিছুতেই এদিক মাড়ায় না। তোর মেসো এই বয়সে আর কত রকম খাবার খাবে বল।

বীরেনমেসো দিল্লিতে অডিট সার্ভিস থেকে রিটায়ার করার পর গত বছর কলকাতায় সপরিবারে পাকাপাকি ফিরে এসেছেন। বুলবুলদি কিছুতেই আসতে চায়নি, নীলামাসি আসার জন্য পাগল। বীরেনমেসোর কাস্টিং ভোট নীলামাসির দিকে পড়েছিল। সেই নিয়ে বুলবুলদির রাগ এখনও যায়নি।

নীলামাসি বলল, —জানি বলে লাভ নেই, তবু জয়াকে বলিস পারলে একবার যেন আসে।

বৃষ্টি ঘাড় নাড়ল। মনে মনে বলল, মাকে বলতে আমার দায় পড়েছে। তোমার যদি টান থাকে, নিজে গিয়ে বোনকে হাত ধরে নিয়ে এসো। সে নিজেই আবার কবে এবাড়িতে আসবে তার ঠিক নেই। কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যেতেই তার ভাল লাগে না। এরকম ম্যানিয়াক মাসি আর কুচুটে দিদির বাড়িতে তো নয়ই। সেবার দিল্লিতে গিয়ে নেহাত দায়ে পড়ে...।

মা-র সঙ্গে বছর তিনেক আগে শেষবারের মতো বেড়াতে গিয়েছিল বৃষ্টি। শুধু মা-র সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া সেই একবারই। বেড়াতে যাওয়া না বলে বৃষ্টিকে নীলামাসির বাড়িতে জমা রেখে দিল্লিতে মা নিজের কাজ সারতে গিয়েছিল বলাই ভাল। সাতদিনের সাতদিনই মা ব্যস্ত ছিল নিজের ছবির এগজিবিশন, রিভিউ, সেল নিয়ে। সারাদিন ধরে আর্টিস্ট ফোরাম, গ্যালারি আর আর্ট প্রোমোটার। বৃষ্টি যেন বাড়তি লাগেজ। স্টেশনের ক্লোকরুমে জমা থাকার মতো পড়ে রইল নীলামাসির বাড়িতে।

ভালমামার বই দুটো ব্যাগে পুরে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নীলামাসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল বৃষ্টি।

বাড়িতে ঢুকে বৃষ্টি বাবলুর ঘরে উঁকি দিল। খাটের কাছে রাখা নিজস্ব পোর্টেবল টিভিতে মন দিয়ে সাড়ে সাতটার খবর শুনছে বৃষ্টির ভালমামা। বার্লিনের প্রাচীর ভাঙার পর এখন রোজই কোন নতুন চমকের প্রত্যাশা। এ সময়ে কেউ কথা বললে সে খুব রেগে যায়।

বৃষ্টি খাটের ওপর বই দুটো রাখল। বাবলু একবার সেদিকে তাকিয়ে আবার মন দিয়েছে খবরে।

বৃষ্টির হঠাৎই একটু ভালমামার পিছনে লাগতে ইচ্ছে হল,

—তোমার ভি পি সিং-এর খবর কি? ইস্ট ইউরোপের কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়াল-টেওয়াল আর ভাঙল ?

বাবলুর ভুরু জড়ো হল।

বৃষ্টি ভালমামার খাটে বসে পড়ল,

—কোল্ড ওয়ার-টোয়ার আর চলবে না বুঝলে। এবার ভাঙাভাঙির পালা। সব ভেঙে যাবে।

খুব একটা কিছু ভেবে নয়, এমনি বলার জন্যই কথাটা বলেছে। দুটো মতবাদের লড়াই শুরু হয়ে গেছে, বিভিন্ন দেশগুলোর দেওয়াল টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে দিন দিন। বৃষ্টির ভালমামা এসব নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত থাকে আজকাল। কাউকে ডেকে যেচে কথা বলার অভ্যাস তার বহুকাল চলে গেছে।

সুধা দরজায় এসে প্রায় ফিসফিস করে ডাকল বৃষ্টিকে। বাবলুর প্রয়োজন ছাড়া সে এ ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

—জলখাবার খাবে কিছু ?

বৃষ্টি মাথা দোলালো।

—চা, কফি ?

বাবলু টিভি থেকে চোখ না সরিয়ে বলে উঠল, —আমাকে এখন চা কফি দেবে না। সন্ধে থেকে আমার তিন-চারটে চোঁয়া ঢেঁকুর উঠেছে।

বাবলুর স্বর এমনই রূঢ় যে সে ঘরে অন্য যে কেউ বসে থাকতে অস্বস্তিবোধ করবে। বৃষ্টি তবু বসে রইল।

এতক্ষণে বাবলু যেন মৃদু সচেতন হয়েছে, —সোজা বুলবুলদের বাড়ি থেকে ফিরছিস ?

—হুঁ।

—ও। তাই এত তাড়াতাড়ি ! অন্য দিন তো ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক শুরু হওয়ার আগে ফেরাই হয় না।

ভালমামা কি কখনও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না ! বৃষ্টিও এরকম লোককে জব্দ করতে জানে।

—বুলবুলদি বলছিল তুমি নাকি মাত্র একবার ফোন করেছিলে ? তাও নাকি কথা হয়নি ? লাইন কেটে গিয়েছিল ?

বাবলু তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত, —বুলবুল ডাহা মিথ্যেবাদী। আর কোনদিন আমার কাছে বই চাইতে আসুক।

—তোমারও বলিহারি যাই, বই দুটো দিয়েই ফেরত চাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ?

—সে কৈফিয়ত কি তোকে দিতে হবে নাকি ? যা, এখান থেকে। কেউ কিছু বলে না বলে দিনকে দিন...

বৃষ্টি খাট থেকে নেমে পড়ল। এ ঘরে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। বৃষ্টি কিছুতেই ভেবে পায় না এত সামান্য কথায় কি করে একটা মানুষ এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে ! আর যদি হয়ে পড়েও বৃষ্টি তাকে থোড়াই কেয়ার করে।

নিজের ঘরে এসে বৃষ্টি কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে, পা দোলাতে দোলাতে, হার্ডরকস্ শুনছে ! এ সময়ে তার চোখের সামনে থেকে বিশ্বসংসার ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায়। আকাশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়লেও এখন সে খেয়াল করবে না। কখনও কখনও তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, হাত মুঠো করছে, কখনও বা সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে শুয়ে থাকছে বিছানায়। যে কেউ এখন তাকে দেখলে উন্মাদিনী ছাড়া কিছু বলবে না।

হঠাৎই দরজায় চোখ পড়তে বৃষ্টি চমকে উঠল। মা তার দরজায় দাঁড়িয়ে। মা কখন এল ! আজ এত তাড়াতাড়ি !

মাকে দেখেই মস্তিষ্কে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। কদিন ধরেই মা যেন নজর করছে তাকে ! শুধু বাবা কেন, এই মহিলারও কিছু শিক্ষা পাওয়া দরকার। জয়ার মুখ একঝলক দেখে নিয়েই বৃষ্টি আবার পা নাচাতে শুরু করল।

জয়া কি একটা বলল, বৃষ্টি শুনতে পেল না। পা দোলাতে দোলাতেই কান থেকে ওয়াকম্যান সরাল। বাজনার বিটগুলো মৃদু হয়েছে,

—কিছু বলছ আমাকে ?

—বলছি গান শোনা ছাড়া কি আর তোমার কোন কাজ নেই ? পড়ছিস না যে ?

—ইচ্ছে। জোরের সঙ্গে বলতে গিয়েও গলাটা কেঁপে গেল। বৃষ্টি বুঝতে পারল মা-র সম্পর্কে ভয়টা তার কাটতে সময় লাগবে। তবু জোর করে পা দোলাতে চেষ্টা করল। আবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৫ ॥

কিছু কিছু দৃশ্য ছবি হয়ে বুকে গেঁথে যায় চিরদিনের মতো। দাঁতে দাঁত চেপে ভুলতে চাইলেও আচমকা চোখের সামনে এসে অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মায়ের মুখের ওপর সেদিন বৃষ্টির ওভাবে পা নাচানোর দৃশ্যটা জয়ার বুকে বিঁধে ছিল বহুদিন। স্টাফরুমে বসে কথা বলতে বলতে, একা স্টুডিওতে ছবি আঁকতে আঁকতে, ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পড়াতে, কোন প্রস্তুতির অবকাশ ছাড়াই, হঠাৎই ছবিটাকে দেখতে পেত জয়া। একটা উজ্জ্বল ঘর, পোস্টার ওপড়ানোর ক্ষত-চিহ্নে ভরা দেওয়াল, পুরনো আমলের একটা সিঙ্গল-বেড খাট, সেই খাটে শুয়ে বৃষ্টি অদ্ভুত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পা দোলাচ্ছে। ভীষণ সচেতনভাবে উপেক্ষা করছে তাকে। উপেক্ষা ? না অপমান ? দৃশ্যটা বোধহয় আমৃত্যু জয়ার বুকে রয়ে যাবে।

এ ছাড়াও আরও কিছু দৃশ্য প্রতিটি মানুষের মনে জমা থাকে। মানুষ ভাবে ভুলে গেছে। অথবা সময় সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে দৃশ্যটা। বাস্তবে তা হওয়ার নয়। অবচেতন মনে ছবি রয়েই যায়। সামান্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে, অবচেতনের পর্দা সরে গিয়ে, ছবিটা জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে নড়াচড়া করতে থাকে। অ্যাকাডেমির সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ছাত্ররঞ্জন হালদারের আঁকা পেন্টিংটা দেখতে গিয়ে সেরকমই একটা আন্দোলন হৃদয়ে অনুভব করল জয়া।

অন্ধকার গুহায় এক চিলতে সূর্যের আলো টেরচাভাবে এসে পড়েছে, আলোটুকু ছাড়া গুহাতে আর কিছুই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। প্রধানত হলুদ আর খয়েরি মিশিয়ে দৃশ্যটা ধরার চেষ্টা করেছে রঞ্জন। তেলরঙের কাজ, রঙে তেমন গভীরতা আসেনি, রেখাগুলোও তত পরিণত নয় কিন্তু ছবিটা দেখেই সুবীরদের ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িটা নিখুঁতভাবে জয়ার চোখে ফুটে উঠল।

সুবীরের সঙ্গে জয়া প্রথম দিন গেছে ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িতে। গলির পর গলি পেরিয়ে জীর্ণ বাড়িটাতে ঢোকার সময়, আজন্ম বালিগঞ্জে মানুষ হওয়া মেয়েটার প্রথমটা মনে হচ্ছিল বুঝি কোন কোটরে ঢুকছে। প্রাচীন গাছের কোটর। অথবা ওই ছবিটার মতোই কোন ধসে পড়া পাহাড়ের গুহায় ঢুকছে জয়া। সামনেই কালচে সবুজ স্যাঁতসেঁতে উঠোন, উঠোন ঘিরে কোম্পানির আমলের সাবেকি খিলান। উঠোনে পা রাখতেই জয়ার চোখ আটকে গেল সুবীরদের দোতলার বারান্দার স্যান্ড কাস্টিং করা রেলিং-এ। কোন এক অজানা ফাঁক দিয়ে এককুচি সূর্য এসে পড়েছিল রেলিং-এর গায়ে। চতুর্দিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা-কালো আলোছায়ার মাঝখানে ওই জায়গাটুকু কী তীব্র উজ্জ্বল। গগন ঠাকুরের ছবির আভাস যেন। জয়া মন্ত্রমুগ্ধ। মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল,—অসাধারণ! দ্যাখো, দ্যাখো ওই রোদ্দুরটুকু ওখানে কী এক্সকুইজিট্!

সুবীর হেসে উঠেছিল,—ওই রোদ্দুরটা ওখানে তিন মিনিট থাকে। ওটা আমার জ্যাঠামশাই-এর ভাগের আলো।

সুবীর কিছু ভেবে কথাটা বলেনি ; আজ জয়ার মনে হয় পৃথিবীতে সবার ভাগেই বোধহয় ওরকম পৃথক পৃথক আলোর টুকরো থাকে। বাদবাকি সবটাই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। ওই আলোটুকুর জন্যই তো বেঁচে থাকে মানুষ। বৃষ্টিকে একদিন যদি দৃশ্যটা দেখানো যেত! কী সুন্দর একটা পালঙ্কও ছিল ও বাড়িতে। মেহগনি কাঠের। বিডে অ্যাকেনথাস্ পাতার কারুকাজ। পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানার গথিক প্যাটার্নের সমাধিগুলোর মাথায় যেরকম হেলেনিস্টিক কাজ আছে, ঠিক সেরকম।

ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী দেখতে এলেই জয়া সব সময় চাপা রোমাঞ্চ অনুভব করে। পাশ করার পর ঠিক এভাবেই সে, নিখিল, শিপ্রা আর শ্যামাদাস মিলে প্রথম এগজিবিশন করেছিল। নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে কার্ড ছাপিয়েছে, প্রেসের লোকদের ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। সমালোচকরা আসতে পারে, সিনিয়ার আর্টিস্টদের কেউ যদি এসে পড়েন, মাস্টারমশাইরাও আসবেন হয়ত, চিন্তায় চিন্তায় জয়ার পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। বুকের মধ্যে অবিশ্রান্ত ড্রাম বেজে চলেছে।

—অ্যাই, বলো না কি হবে? সবাই যদি গালাগাল করে? যদি বলে কিচ্ছু হয়নি?

সুবীর তার সমস্ত ভয় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল,— আমার বউ-এর ছবির নিন্দে করবে! বুকের পাটা আছে কারুর?

সত্যিই খুব সাহস দিয়েছিল সুবীর। সুবীরের ওপর নির্ভর করতে ভালও লাগত তখন। সেই লোকই উদ্বোধনের দিন কি ডোবান ডুবিয়েছিল। কি অবুঝ সব ধারণা নিয়ে যে চলত সুবীর! শিল্পীর স্বামীকেও শিল্পের সমঝদার হতে হবে!! তা না হলে সানগ্লাস পরে হলের ভেতর এগজিবিশন দেখতে দেখতে দুম করে ওরকম একটা মন্তব্য করে বসে! জয়ারই ছবি দেখিয়ে!

—কি দারুণ কাজ দেখেছেন? ভ্যান গখের টাচ্ আছে না?

তিনজন মাত্র শিল্পীর নাম জানত সুবীর। ভ্যান গখ, মাতিস্ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেমব্রান্ট্।

সবাইকে সব জানতেই হবে তার কোন মানে নেই। জয়া কতটুকু জানে সেলস্ প্রোমোশন সম্পর্কে ? এ কথাটাই কোনদিন সুবীরকে বোঝাতে পারেনি জয়া। সুবীর তাকে এক দিনের জন্যও মানুষ বলে গণ্য করল না। তার শুধু শো-কেসে রাখার জন্য একটা বউ-এর দরকার ছিল। দরকার মতো চাবি খুলে তাক থেকে নামিয়ে আদর-ফাদর করে আবার তাকে তুলে রেখে দেবে। আর সে ঘরে না থাকলে পুতুল তাক থেকে নেমে তার ঘরদোর সামলাবে। এবার হয়ত বিয়ে করে আগের আফশোস মিটেছে।

—দিদি, আমার ছবিগুলো একটু দেখবেন না ?

জয়া চমকে তাকাল। সেই থেকে রঞ্জনের ছবিটার সামনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হাসার চেষ্টা করল একটু,

—নিশ্চয়ই।

শুধু রত্নাবলী নয়, সৌমেনও রয়েছে তার সহপাঠিনীর পাশে,—দিদি, আপনাকে আমি এগজিবিশনের আগে অনেক খুঁজেছিলাম।

—কেন ?

—আপনি যদি পেন্টিংগুলো আগে একটু দেখে দিতেন...

—বেশ তো হয়েছে।

—তবু দিদি আপনি দেখে দিলে...

—দূর। আমি পড়াই বলে কি ছবির এক্সপার্ট নাকি ? কতটুকু জানি ছবি সম্পর্কে ? আসল ব্যাপারটা হল ফিলিংস্। অনুভূতি। তুমি কিভাবে তোমার চারদিককে দেখছ, সেই দেখার রঙ কিরকম, রূপ কিরকম, সবটাই তোমার নিজের ব্যাপার। দিনে, রাতে, প্রতি মুহূর্তে আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি জিনিসের, মানুষের, জীবজন্তুর চেহারা বদলে যায়। তখন তুমি তাকে কিভাবে দেখছ, তোমার দেখার আনন্দ, তোমার দেখার যন্ত্রণা সব মিলিয়েই তো ছবির নিজস্ব চরিত্র তৈরি হবে।

জয়া তার ছাত্রছাত্রী মহলে বেশ প্রিয়। এদের মধ্যেই সব থেকে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে সে। বৃষ্টিটাও কি সুন্দর ছবি আঁকতে পারত। চমৎকার রঙ চেনার ক্ষমতা আছে। অথচ একদিনের জন্যও সেভাবে তুলি ধরল না।

ছেলেমেয়েগুলো এখনও জয়াকে ঘিরে আছে। ফিরোজ একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল,—তুই কখনও একা হস্ না কেন বল্ তো ? যখনই দেখি চ্যালাচামুণ্ডা ঘিরে রয়েছে। তোকে একটু ফাঁকা পাওয়ার চান্সই পেলাম না কখনও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পেলে কি করতিস ?

—টুক করে মনের কথাটা বলে ফেলতাম।

—ইয়ার্কি হচ্ছে ?

—নারে, ইয়ার্কি নয়। তোকে দেখে সত্যিই হিংসে হয়। কলেজে ছেলেমেয়েদের নিয়ে রয়েছিস, বাড়িতে দিব্যি নিজের রাজত্ব, ভাবনাচিন্তা নেই, মনের সুখে ছবি আঁকছিস, বৃষ্টির মতো একটা লাভলি মেয়ে পেয়েছিস...

ফিরোজের গলায় বিষণ্ণতার সুর চাপা ছিল না। সে এমনিতে দিলখোলা, আমুদে, বোহেমিয়ান টাইপের। প্যারিসে দু বছর থাকার সময় তার পরিচয় হয়েছিল এডার সঙ্গে। জার্মান মেয়ে। ব্রুনেট্। মডেলিং করত। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, সেখান থেকে লিভ টুগেদার। ফিরে আসার পরও বহুদিন দুজনের যোগাযোগ ছিল। বিয়েও করবে ঠিকঠাক। এডা এ দেশে এলও একবার কিন্তু দেশটা তার একদম পছন্দ হল না। এত লোডশেডিং। এত বিশ্রী উষ্ণতা ! ফিরোজকে বলেছিল তার সঙ্গেই প্যারিসে গিয়ে থাকতে ! সে মডেলিং করবে, ফিরোজ ছবি আঁকবে, দিব্যি চলে যাবে দুজনের। ফিরোজ রাজি হয়নি। এডা ফিরে গেল। ফিরোজ হয়ে উঠল দশগুণ বেশি বোহেমিয়ান। সারাক্ষণ হাসছে, নাচছে, গাইছে, মদ খেয়ে ধুম হয়ে পড়ছে। কিন্তু ছবির ভেতর আসল ফিরোজ ঠিক ধরা পড়ে যায়। তার সব আঁকাতেই রহস্যময় বিষাদ। কোন উজ্জ্বল রঙ সে ব্যবহার করে না।

জয়া ফিরোজকে বলেছিল,—তুই কাজটা ঠিক করিসনি। তোর তো প্যারিস সুট্ করে গিয়েছিল ; ওর এ দেশটা ভাল নাও লাগতে পারে। ওখানে চলে গেলে তোরও ফ্যামিলি হত, বৃষ্টির থেকেও হয়ত লাভলি মেয়ে থাকত।

ফিরোজের মুখচোখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল,—কিন্তু আঁকতে পারতাম নারে।

—কেন ? ওদেশে কি ক্যানভাস পাওয়া যায় না ?

—ক্যানভাস আছে। কিন্তু আমার তো রুট নেই সেখানে। শিকড় ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে ? বাদ দে, তুই আমার কথা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন ? একা আছি, তোফা আছি। একা থাকার যে কি আনন্দ তোর মতো সংসারীরা বুঝবে কি করে ?

জয়া ফিরোজের কথা শুনে কষ্ট পেয়েছিল। একা কে নয় ? ফিরোজই কি একা ? এই যে অ্যাকাডেমির সেন্ট্রাল গ্যালারিতে একঘর লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এখনও তো একাই সে।

রঞ্জন জয়ার কাছে দৌড়ে এল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দিদি, দারুণ খবর আছে। এইমাত্র আমার একটা ছবি বিক্রি হয়ে গেল।

—তাই! কত'তে?

—বারোশো। টুয়েলভ হানড্রেড।

ছেলেটার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল। ছাত্রের খুশিতে শিশুর মতো উচ্ছল জয়াও।

—ওমা তাই নাকি? এক্ষুনি কিছু খাওয়াও।

—কি খাবেন বলুন...

—যা খাওয়াবে। চপ, কাটলেট, কফি, কোল্ডড্রিঙ্কস, নিদেনপক্ষে এক কাপ চা।

ছেলেটা লজ্জা পেয়েছে, —আপনি এখনও চা পাননি?

বলেই দৌড়েছে চা আনতে। খুব ভিড় না হলেও বেশ কিছু লোকজন এসেছে ছবি দেখতে। ওপাশের গ্যালারিতে ফোটোগ্রাফির এগজিবিশন চলছে। জয়া কোণে পাতা চেয়ারে বসে পড়ল। এই যে জীবনের প্রথম এগজিবিশনে একটা ছবি বিক্রি হওয়া, এর যে কি আনন্দ...ছবির গায়ে ছোট্ট লাল টিপ পড়া...!

জয়ার প্রথম ছবি বিক্রি হয়েছিল পাঁচশো টাকায়। এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব কিনেছিল। আজও জয়া পরিষ্কার ছবিটাকে দেখতে পায়। শীতের কুয়াশায় একটা একলা মোরগ ডেকে ডেকে পৃথিবীর ঘুম ভাঙাচ্ছে। ছবিটার নাম দিয়েছিল, —ডন। সে'ও ঠিক এভাবেই সেদিন ছুটে গিয়েছিল তার মাস্টারমশাই-এর কাছে। ছটফট করেছিল সুবীরকে খবরটা দেওয়ার জন্য।

সুবীর নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিল। এই যে মেয়েটা তার সঙ্গে রয়েছে, নরম-সরম ছোট্টখাট্টো শ্যামলা মেয়ে, যে কি না তার সামান্য আদরেও মোমের মতো গলে পড়ে, সারারাত্রি তাকে না আঁকড়ে ঘুমোতে পারে না, যার ছবি আঁকাটাকে একটা শৌখিন খেয়াল বলে সে হেসে হেসে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, মনে করেছে আহা, একটা কিছু নিয়ে তো থাকবে, তার প্রথম ছবির দাম পাঁচশো টাকা! টাকা এত সহজেও রোজগার হয়! নির্ঘাত মন খচখচ করে উঠেছিল সুবীরের। তবে নিজেকে চাপাও দিয়ে দিয়েছিল,

—কি খাবে? কোথায় খাবে?

বলেই জয়াকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

রঞ্জন সত্যি সত্যি চা এনে ফেলেছে। কোনরকমে কাগজের কাপটা ধরিয়ে দিল জয়ার হাতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দিদি, রমেনবাবু এসেছেন। আমি একটু যাই ?

কেন উনি তো ভেতরেই আসবেন ? বলতে গিয়েও সংযত হয়েছে জয়া। প্রথম এগজিবিশনে ক্রিটিক সত্যি এসে পড়লে কিরকম উত্তেজিত বোধ করে ছেলেমেয়েরা সেটা সব শিল্পীই জানে।

জয়া জিজ্ঞাসা করল, —কই রমেনদা ?

—ওই তো বাইরে গাড়িবারান্দায় স্বপন আইচ আর নিখিল দত্তরায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

নিখিল আবার এল কোত্থেকে ! ও তো এই সব এগজিবিশনে বড় একটা আসে না !

রঞ্জন দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই রমেন নিখিল গ্যালারিতে ঢুকেছে। নিখিল জয়াকে হাত নেড়ে মধ্যিখানে সাজানো ভাস্কর্যগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

রমেন জয়ার কাছে এসেছে, —কি ম্যাডাম ? কতক্ষণ ?

—এই খানিক আগে। খবর কি আপনার ?

—আমার আর কি খবর। নিউজপেপার অফিসের লোকেদের কোন খবরটবর থাকে না। তারা খবর খোঁজে। তারপর ? তোমার সোলো কবে ?

—এপ্রিলের দিকে করার ইচ্ছে আছে। আগে তো কলকাতা তিনশ' সামলাই।

—কি কাজ করছ ?

—দেখি। ঠিক করিনি এখনও।

—তুমি তো আজকাল খুব সুররিয়ালিজম-এর দিকে ঝুঁকছ। লাস্ট মান্থে দরবার গ্যালারিতে তোমার 'অ্যাগনি' ছবিটা দেখছিলাম। পুরনো ফর্ম থেকে অনেক সরে যাচ্ছ মনে হচ্ছে ? ওটা তো প্রায়... অ্যাবস্ট্র্যাক্টের....

—ওই একরকম চেষ্টা আর কি। জয়া কথা ঘোরাতে চাইল। নিজের ছবি সম্পর্কে আলোচনা করতে সে বেশ অস্বস্তিবোধ করে,

—আমার ছেলেমেয়েদের কাজ দেখুন। দারুণ কাজ করেছে। রঞ্জন আর রত্নাবলীর কয়েকটা কাজ তো বেশ ম্যাচিওরড্।

—দেখব। দেখব। রমেন জোরে হেসে উঠল, —ওদের একটা ভাল রিভিউ চাই। তাই তো ?

জয়ার মুখে চাপা অর্থপূর্ণ হাসি।

—কবে আসছেন বাড়িতে ? আপনার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকাল।

—ওভাবে যেতে বললে হবে ? জোরদার নেমন্তন্নটন্ন করো। বেশ জম্পেশ পার্টি। বাই দা বাই, তোমার মেয়েকে সেদিন দেখলাম। ইউনিভার্সিটির সামনে চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। বেশ বড় হয়ে গেছে তো ! ও কি এখন কলেজে ?

—হ্যাঁ, ফার্স্ট ইয়ার। জয়া মৃদু হাসল। হাসলে এখনও তার ডান গালে গভীর টোল পড়ে, —আমরা এখন বুড়ির দলে। বয়স কম হল ?

—কত হল ? ষাট ? সত্তর...এই নিখিল, জয়া কি বলছে শোন, ও নাকি বুড়ি ! এখনও ইচ্ছে করলে...

জয়া আড়চোখে ছাত্রছাত্রীদের দেখে নিল। রমেন সাহা এরকমই। মুখের কোন রাখঢাক নেই।

—আহ্ রমেনদা, কি হচ্ছে কি ? আপনার নেমন্তন্ন কনফার্মড। শুধু একটা রিঙ করে আসবেন।

নিখিল একমনে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখছে। পেন্টিং-এর থেকেও মূর্তি গড়ার দিকে নিখিলের ঝোঁক বেশি। বিয়ে করার পর ছবি, স্কালপচার, এগজিবিশন প্রায় মাথায় উঠেছে তার। একটা প্রায়-সরকারি অফিসে শাড়ির ডিজাইনিং-এর কাজ করতে হয় তাকে। বছরে এখন বড়জোর আট দশটা ছবি আঁকে কি আঁকে না। মূর্তি গড়ে আরও কম।

জয়া ডাকল, —তুই কি অফিস থেকে আসছিস ? যাবি আমার সঙ্গে ? নিখিল মূর্তি থেকে চোখ সরাল না, —কোথায় ?

—সেমিনারে।

—কোথায় সেটা ?

—আশুতোষ হলে। চল, চারজন ইটালিয়ান পেন্টার এসেছে। অনেকে আসবে। প্রকাশদাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

—দুৎ। ও সব সেমিনার টেমিনার আমার পোষায় না। লেকচার দেওয়া তোর পেশা, তুই যা। সিনিয়ার টিনিয়ারদের সঙ্গে দেখা করারও আমার কোন ইচ্ছে নেই।

—তুই এখন করবিটা কি ?

—ছবি দেখব। ছেলেমেয়েগুলো আশা করে কার্ড দিয়ে এল, ভাল করে দেখব না ? নিখিল ঘুরে দাঁড়াল, —কাজ নেই, কম্মো নেই, শুধু সেমিনার ! তোকেও যেতে হবে না। চল, আমার সঙ্গে ফিরবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়া দ্বিধায় পড়ল। সেমিনারটায় গেলে ভালই হত। এ সব সেমিনারে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। আর যোগাযোগ না রাখলে আজকের দুনিয়ায় কে কাকে পোঁছে? তাছাড়া মডার্ন ইউরোপিয়ান ট্রেন্ডগুলো সম্পর্কেও...

—যাবি, কি যাবি না ভাবছিস তো? যেতে হবে না। চল, তোদের বাড়িতে যাই, অনেকদিন বাবলুর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হয়নি। মন খুঁতখুঁত করলেও নিখিলের সঙ্গে বেরিয়ে এল জয়া। বাড়িই ফিরবে।

অ্যাকাডেমির উল্টোদিকের মাঠে মেলা শুরু হয়েছে। মেলার রঙিন আলোয় সদ্যনামা অন্ধকার বর্ণময়। রবীন্দ্রসদনের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। ট্যাক্সি ধরবে।

রবীন্দ্রসদনের মেইন গেটে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তাদেরই একজন ঘুরে ঘুরে দেখছে জয়াকে। জয়ার প্রথমটা একটু অস্বস্তি হল। লোকটা জয়ার দিকেই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। পরনে ধুতি-শার্ট, চোখে চশমা, লম্বাটে মুখ, তোবড়ানো ভাঙা গাল। ভীষণ চেনা চেনা যেন!

—কি খবর তোমার? কেমন আছ?

গলাটা শুনেই জয়া চিনতে পেরেছে। প্রবীর। সুবীরের দাদা। সুবীরের থেকে কতই বা বড়? বেশি হলে বছর চারেকের। এর মধ্যেই কী চেহারা ভেঙেছে! পঞ্চাশে পৌঁছনোর আগেই সত্তুরে বুড়ো যেন। নিখিলের থেকে একটু তফাতে সরে গেল জয়া।

—আপনি কেমন আছেন?

—এই কেটে যাচ্ছে।

বাবা মা? বলতে গিয়েও জয়া থমকে গেল। সুবীরের বাবা মাকে কি এখন আর বাবা মা সম্বোধন করা যায়?

প্রবীর বলল, তোমার নামটাম তো খুব দেখি আজকাল কাগজে। সব সময় আমার চোখে না পড়লেও, সুবুর বউদি তো ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করে।

সুবীর নামটাতেই আড়ষ্টতা এসে গেল জয়ার। প্রবীর লক্ষ করল না। কথা বলেই চলেছে, —আমাদের মেয়েটা কেমন আছে? অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই না?

—এই নভেম্বরে তো আঠেরো হয়ে গেল।

—মাঝে মাঝে মেয়েটাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

জয়ার খারাপ লাগল। ঠাকুর্দা ঠাকুমা, জেঠু জেঠি সম্পর্কে আকর্ষণ দূরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাক, ধারণা তৈরি করারও সুযোগ পেল না বৃষ্টি। এ ব্যাপারে জয়ারই বা কি করার ছিল ? পরিস্থিতির কাছে মানুষ বড় অসহায়।

একটুক্ষণ চুপ থেকে প্রবীর আবার কথা শুরু করেছে, —সুবুর কাছ থেকে অবশ্য মাঝে মাঝেই বৃষ্টির খবর পাই। সুবু আজকাল প্রত্যেক মাসেই দু-একবার করে যায় বাড়িতে।

—বাড়ির সবাই ভাল আছে তো ? জয়া কথার মোড় ঘোরাতে চাইল, —টুকাই বুকাই কোন্ ক্লাসে পড়ছে ?

—টুকাই এবার মাধ্যমিক দেবে। বুকাই এইটে। মাঝে এক বছর ফেল করল তো। আমারই মতো মাথা হয়েছে দুটোর। প্রবীর একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল। —তোমরা তো এখনও ওই বাড়িতেই ? দেশপ্রিয় পার্ক ? তোমার ভাই-এর খবর কি ?

—সেই একই রকম। হুইল চেয়ার।

এত বছর পর প্রবীরের সঙ্গে কথা বলতে জয়ার ভাল লাগছিল। শরীর বুড়িয়ে গেলেও, মানুষটা এখনও সেই সাদামাটা, ভালমানুষ। সুবীরের সঙ্গে তুমুল গণ্ডগোলের সময় একমাত্র এই লোকটাই জয়াকে বলেছিল,

—আমি জানি সুবুর সঙ্গে তোমার বনা খুব কঠিন। সুবুটা এত স্বার্থপর... বাবা-মা যাই বলুক, তোমার ডিসিশন তুমিই নেবে। সুবুর সঙ্গে থাকো তুমিই। তোমার বাবা মা-ও থাকে না, আমার বাবা মা-ও না। ...

একবার বাড়িতে যেতে বলবে নাকি প্রবীরকে ? বৃষ্টির সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে ? থাক। ছিঁড়ে যাওয়া সুতোতে নতুন করে গিট বাঁধার চেষ্টা করে লাভ নেই। জয়া অন্য কথায় গেল,

—অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে, আপনি কি এখানে থিয়েটার দেখতে... ?

—না না। ওই বন্ধুরা রয়েছে, ওদের অফিস ক্লাবের ফাংশন। গানটান হবে। চলি। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি কি বাড়ির দিকে ?

—হ্যাঁ।

প্রবীর চলে যাওয়ার পর নিখিল এগিয়ে এল,

—কে রে ? কথা শুনে মনে হচ্ছিল সুবীরের কেউ হয় ?

—আগে দেখিসনি ? সুবীরের দাদা। চেহারাটা এত বদলে গেছে, আমিই চিনতে পারিনি।

—কি বলছিল কি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কি আর বলবে ? ফরমাল কথাবার্তা। মেয়ে কেমন আছে, সুবীর এখন মাঝে মাঝে নাকি তার বাড়িতে যায়, এই সব আর কি।

—যাক্। নবাবের মতি ফিরেছে তা হলে ? নিজের বাড়ির কথা উঠলে যা মুখ বেঁকাত ! বাবা মা দাদা কেউ যেন মানুষই নয় !

—এরকমই বোধহয় হয় রে। জয়ার গলায় আচমকা দার্শনিক সুর, —আকাশ ছোঁওয়ার নেশায় পেলে মানুষ মাটিকেই ভুলতে চায়। আর একটু বয়স হয়ে গেলে সেই মাটিই আবার টানতে শুরু করে। হেঁচকা টান।

একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে নিখিল দৌড়ল। ট্যাক্সিতে উঠে কিছু দূর যেতে না যেতেই বার বার তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। জয়া ভুরু তুলল,

—তুইও আজকাল ঘড়ি দেখছিস ! তাও সন্ধে ছটায়।

—সাধে কি দেখছি। তোর মতন তো আর আমার মুক্তজীবন নয়। তোর বাড়ি যাব বলে তোকে তো সেমিনার থেকে ভাগিয়ে আনলাম, এদিকে বউ টাইম লিমিট করে দিয়েছে। আটটার মধ্যে বাড়ি না ঢুকলে ক্যানভাসে ছুরি চালিয়ে দেবে।

—বেশ করবে। তুমিও আরতিকে কম নেগলেক্ট করো না। সী হ্যাজ দা রাইট টু ডিমান্ড ইওর কম্পানি।

—হ্যাঁ, ওই সব বলে বলেই তো তোরা ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছিস।

এলগিন রোডের মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে থেমেছে ট্যাক্সি। শীতের সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। জয়া ভাল করে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল।

—ডিসেম্বর পড়তেই এই। শীত এবার জাঁকিয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।

—হুঁ। ফুলস্লিভগুলো বার করে ফেলতে হবে।

—পরশু ফিরোজ এসেছিল। আর্টিস্ট কলোনির ব্যাপারে সেন্ট্রাল থেকে কি একটা গ্রান্ট ফান্টের চেষ্টা করছে। ওর কোন্ রিলেটিভ আছে দিল্লিতে, খুব ইনফ্লুএনশিয়াল বিজনেসম্যান, তার থ্রু দিয়েই...

—ওর যত সব বড় বড় ব্যাপার। বাপের পয়সা আছে। নিজেও প্রচুর ঘাঁতঘোঁত জানে...

—খালি ওর লাইফটাই কেমন হয়ে গেল। বাউণ্ডুলে...

—বাউণ্ডুলে না আরও কিছু। জাতে মাতাল তালে ঠিক। যথেষ্ট হিসেবী। দ্যাখ না, চার ছ' মাসের মধ্যে ঠিক চারদিক ম্যানেজ করে ফেলবে। ওর যা এখন নামডাক...

—আমাকেও বলছিল ওর সঙ্গে জয়েন করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—খবরদার। একদম ওর মধ্যে যাস না। এখন ওর রিসেন্ট সঙ্গিনী কে হয়েছে জানিস তো ?

—না তো ! কে ?

—কিছুই তো খবর রাখিস না। তোদের দেবযানী।

—যাহ্। জয়ার মুখে অবিশ্বাসের হাসি।

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? একটা কথা মনে রাখিস, তোদের ওই দেবযানী পারে না এমন কোনও কাজ নেই।

জয়ার মুখে তবু অবিশ্বাস। নিখিল দেবযানীকে একদমই সহ্য করতে পারে না। কলেজে পড়ার সময় মধুশ্রী বলে একটা মেয়ের ওপর একটু দুর্বলতা ছিল নিখিলের। একেবারে প্লেটোনিক স্তরের। তাই নিয়ে জয়ারাও খুব খেপাত নিখিলকে। একদিন জয়ার বাড়ির আড্ডাতে উঠেছিল কথাটা। দেবযানী সেখান থেকেই শুনে কথায় কথায় গল্প করে এসেছিল আরতিকে। ব্যস্, আর যায় কোথায় ! নিখিলের সঙ্গে সে সময় কি যে সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল আরতির ! দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙে ভাঙে। তারপর থেকেই আরতি অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জয়াও আরতির লিস্টের বাইরে ছিল না। জয়া অবশ্য গায়ে মাখেনি। এরকম তো হতেই পারে। মানুষ কখন কাকে ভালবাসবে, কখন কাকে সন্দেহ করবে, তার তো কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মনটাকে অত বশে রাখাও যায় না। যদি যেতই তবে কেন এখনও সুবীরের বিভিন্ন অনুষঙ্গ মনে পড়ে যায় তার ! এগারো বছর পরেও !

বাড়িতে ঢুকে জয়া সুধাকে বলল,

—তাড়াতাড়ি একটু কফি করে ফ্যাল তো। আর নিখিলদাদাকে কিছু খাবার করে দে।

সুধা চলে যাচ্ছিল, কি মনে হতে আবার ডেকেছে,

—বৃষ্টি ফিরেছে ?

সুধা ইতস্তত করল, —না। মানে আজ ফিরতে দেরি হবে।

নিখিল বাবলুর ঘরে গিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাবলু নিখিলকে খুব পছন্দ করে। আর একজনও তার পছন্দের ছিল। সুবীর। তবে পছন্দ করে বলে যে মতে মেলে তা নয়। নিখিল বাবলু এক জায়গায় হলেই কিছুক্ষণ পর তর্ক শুরু হয়ে যায়। দুজনেই পাগলের মতো চেঁচাতে থাকে। বিশেষত রাজনীতির প্রসঙ্গ এলে। জয়া পারতপক্ষে তাদের আলোচনায় যোগ দেয় না। ইরাক কুয়েত দখল করে ভাল কাজ করেছে কিনা, রাষ্ট্রসংঘ ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে জয়ার উৎসাহ নিখিল বাবলুর থেকে অনেক কম।

কফি খেয়ে জয়া যখন বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল, তখনও তুমুল তর্ক চলছে দুজনের। ঘরে গিয়ে মুখে ক্রিম-ট্রিম মাখল, তখনও চলেছে তর্ক। টিভিতে বাংলা খবর শেষ হয়ে এল, তখনও।

জয়া বাবলুর ঘরে এল। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বাবলু দুজনে মিলে সাক্ষী মানতে শুরু করেছে জয়াকে। যেন জয়ার মতামতের ওপর নির্ভর করছে আমেরিকা ইরাকে সৈন্য পাঠাবে, কি পাঠাবে না অথবা চন্দ্রশেখর সরকারের গদির অবস্থা কি হবে।

—তোকে না আরতি তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে ?

নিখিলকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল। তর্কের মাঝখান থেকে উঠে যেতে হলে কেমন পরাজিত পরাজিত লাগে নিজেকে। প্যাসেজে এসে জুতো পরছে,

—বৃষ্টি ফেরেনি এখনও ?

—তাই তো দেখছি। খুউব বন্ধুবান্ধব বেড়েছে আজকাল। আবার বলছিল নেতারহাট বেড়াতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সারাক্ষণ ডানা মেলে উড়ছে।

—সে তো হবেই। নতুন কলেজে ঢুকেছে, একটু তো পাখা গজাবেই।

শুধু কি পাখনা ? কলজেও বেড়েছে। নইলে ওভাবে মেয়ে মুখের ওপর পা দোলায় !

AMARBOI.COM

আজ প্রবীরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা আকস্মিক হলেও পুরোপুরি আকস্মিক মনে হচ্ছিল না জয়ার। এমন তো বহু সময়ই ঘটেছে, যে লোকের সম্পর্কে ভাবছে সে অথবা তার ঘনিষ্ঠ কেউ তার পরেই হাজির হয়েছে বাড়িতে। এই তো পরশু বিকেলে কয়েকটা ছবির ফ্রেমের ব্যাপারে শ্যামাদাসের কাছে যাবে ভাবছিল, তার খানিক পরেই পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দেখা হয়ে গেল শ্যামাদাসের বউয়ের সঙ্গে। প্রায় দু'তিন বছর পর। কোন ঘটনাটা যে ঠিক আকস্মিক, সেটার বোধহয় সঠিক সংজ্ঞা হয়ও না। তবে প্রবীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অত ইমোশনাল হয়ে পড়াটাও কোন কাজের কথা হয়নি। এই বয়সে জোলো আবেগ...! আবেগের দিন কবেই পিছনে ফেলে এসেছে জয়া। প্রবীরের কোন্ কথাতে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ? সুবীরের প্রসঙ্গে ? না বৃষ্টির ?

বৃষ্টির কথা মনে পড়তেই জয়া সুধাকে ডাকল,

—আজ কেন দেরি হবে বৃষ্টি কিছু বলে গেছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবলু হুইল চেয়ারে নিজস্ব বাথরুমে যাচ্ছিল। বাবলুর সুবিধামত প্রিয়তোষ কমোড, বেসিনের ব্যবস্থা করে নতুন বাথরুম তৈরি করে দিয়েছিলেন। জয়ার ঘরের সামনে হুইল চেয়ার থামাল বাবলু,

—শুধু আজ কেন ? রোজই তো বৃষ্টি দেরি করে ফেরে। তুই নিজে সন্ধেবেলা বাড়ি থাকিস না, তাই জানিস না।

অন্য সময় হলে পাত্তা দিত না ; এখন কথাটা জয়ার গায়ে লেগে গেল,—সন্ধেয় থাকি না মানে ? আমি কি আড্ডা মেরে বেড়াই ?

—আড্ডা মারো, কি কি করো সেটা তুমি জানো। যা ফ্যাক্ট আমি তাই বলছি। বেশ কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি সন্ধেবেলা ফিরছে না এটাও ফ্যাক্ট, তুই থাকিস্ না, খবর রাখিস না, সেটাও।

—তোরা তো থাকিস্। তোরা জিজ্ঞেস করতে পারিস না ?

বাবলু উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। হুইল চেয়ার ঠেলে এগিয়ে গেল। সুধা তখনও জয়ার সামনে দাঁড়িয়ে। জয়া এবার তার দিকে ফিরল,

—হাঁ করে দেখছিস্ কি ? সারা দিন তেতে পুড়ে, মুখের রক্ত তুলে খেটে এসে আমাকেই যদি সব খবর রাখতে হয়...তোরা বাড়িতে আছিস কি জন্য ? বলতে বলতে চোখ পড়েছে টেবিলের ফুলদানির দিকে, —ওটা পরশুর ফুল না ? ওটা বদলানোরও সময় পাওনি ? গাছগুলোকে রোদ খাওয়ানো হচ্ছে ? নাকি সেটারও সময় পাও না ?

সুধা জানে এটা তার দিদির রাগের সময়। দিদির সমস্ত বাহারী গাছেদের মাপা রোদ চাই, মাপা ছায়া। না হলেই সুখী গাছ সব শুকিয়ে মরে যাবে। এ সময় দিদিকে কোন কথা বোঝানোও যাবে না। সুধা ঘাড় নিচু করে চুপচাপ হজম করল বকুনিগুলো।

জয়া সশব্দে মেয়ের ঘরের দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট কড়া গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মেরেছে। বৃষ্টি কি আজকাল সিগারেট খাচ্ছে নাকি ! পোড়া তামাকের গন্ধ ! না বদ্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ ! ঘরে যথারীতি বিশ্রী ভাবে জামাকাপড়, জিনিসপত্র ছড়ানো। পোস্টারহীন ঘরটাকে কী কুৎসিত লাগছে। কোন জিনিসে মেয়েটার এতটুকু যত্নআত্তি নেই। হয়ত যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি পেয়ে এসেছে বলেই। ছোটবেলা থেকেই ওর চাওয়াগুলোকে আরও সংযত করা উচিত ছিল।

না দিয়েই বা কি উপায় ছিল ? সব সময় মনে রাখতে হত মেয়েটার বাবা যেন কোন ভাবেই জিততে না পারে। বাবা মা'ও যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা চুটিয়ে আদর দিয়ে গেছে নাতনিকে। জয়া মেয়ের জন্য সময় দিতে পারত কতটুকু ? কিন্তু নিজের আঁকা ছাড়া আর যা খাটাখাটুনি করেছে সবই তো এই সংসারের জন্যই। বৃষ্টির জন্যই। না হলে এ বাড়িতে আসার পর কি দরকার ছিল তার আঁকার স্কুলে পার্ট টাইম মাস্টারি নেওয়ার ? কিংবা বড়লোকের ছেলেমেয়েদের শৌখিন আঁকা শেখার টিউশ্যনি ধরার ? উদয়াস্ত দোকান বাড়ি সাজানোর পরিশ্রম ? আর্ট কলেজের চাকরিটা পেয়ে সে তো বেঁচে গেছে। তার ছবি যাতে মোটামুটি বিক্রি হয়, একটা নিশ্চিত রোজগার থাকে, আর্ট ডিলাররা যাতে মাথায় হাত বুলোতে না পারে, তার জন্য পরিশ্রম ছোটাছুটি তো করতেই হয়। যার জন্য এত পরিশ্রম, এত চিন্তাভাবনা, সেই মেয়েও কেমন দূরের হয়ে গেছে আজকাল।

জয়ার বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। সে নিজেও তো মেয়েকে আর সেভাবে কাছে ডাকতে পারে না। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস নিকটতম সম্পর্কেও মরচে ধরিয়ে দেয়। আবার সেদিনের দৃশ্যটা জয়ার মনে পড়ে গেল। মেয়ে তাকে দেখেও কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে পা নাচাচ্ছে।

জয়া মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবলুও তো একটু নজর রাখতে পারে। সারাদিন নিজের ঘরে শামুকের মত গুটিয়ে আছে। নিজের খোলে। কেবল কোন কারণে আঁতে ঘা লাগলেই...।

থাক, যে যেভাবে খুশি থাকতে চায়। কে কবে জয়ার কথা ভেবেছে ? সুবীর চেয়েছিল তার সময়, তার শরীর, তার অখণ্ড মনোযোগ। তার চাহিদা মত সব জুগিয়ে যেতে পারলে সম্পর্কটাই ভাঙত না হয়ত। পরগাছার মত কেটে যেত জীবনটা। একা ওই মানুষটাকে দোষ দিয়েই বা কি লাভ। বাবা মা ভাই বৃষ্টি সবাইকে নিয়েই তো তার জীবন। তারা কতটুকু দিয়েছে জয়াকে ? চলে আসার পরও তো বাবা মা মুখের গুমোট আস্তরণ দিয়ে সব সময় বলতে চাইত, জয়া ফিরে যা। জয়া ফিরে যা। অন্তত বৃষ্টির মুখ চেয়ে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ! অনুভব করারও চেষ্টা করেনি মেয়ে তার নিজের হাতে গড়া সংসার ফেলে এসেছে কত যন্ত্রণায়।

একটা জলপ্রপাত তুষারের স্তূপ হয়ে জমে গেছে বুকে। সবাই পর। সবাই পর।

জয়া দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

সুধা ডাকল পিছন থেকে, —দিদি, খেয়ে যাবে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—স্টুডিওতে দিয়ে যাস্।
—বৃষ্টি এলে তোমাকে ডাকব ?
জয়া পলকের জন্য দাঁড়াল। তারপর আবার উঠতে শুরু করেছে,
—না। থাক্।

॥ ৬ ॥

—আমরা একবার নেতারহাট গিয়েছিলাম তোর মনে আছে বৃষ্টি ?
পরশু রাত্রে খেতে বসে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই বলে উঠেছিল জয়া। ডাইনিং টেবিলে মোমবাতির আলোয় বৃষ্টি মার মুখটা দেখতে পায়নি ভাল করে। আজকাল শীতকালেও এত লোডশেডিং হয় !
বৃষ্টির মন পলকের জন্য ভিজে গিয়েছিল। পরক্ষণেই ভুল ভেঙেছে। জয়া নিজের কথার পিঠেই কথা চাপিয়ে দিয়েছে, —শুধু আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে জীবন কাটবে না বৃষ্টি। কোন্ কলেজে পড়া মেয়ে এত রাত অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে ? এবার এসব কমাও।
সেই শাসন। শুধুই শাসন। আবহমানকাল থেকে শুধু তো শাসনটুকুই আছে।
শাসন তো করে সব বাবা মাই। স্থানকালপাত্র ভেদে সেই শাসনের অর্থ পাল্টে যায়।
রাঁচি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে মার কথাগুলো মনে পড়তেই একটা অসহ্য খারাপ লাগায় মেজাজ তেতো হয়ে গেল বৃষ্টির। ওদিকে সুদেষ্ণা একটানা গজগজ করে চলেছে, —এইসব ধ্যাধেড়ে বাসে যেতে হবে ! এখনই তো ছাদে লোক উঠতে আরম্ভ করেছে ! টানা ছ' ঘণ্টা মুর্গিঠাসা অবস্থায়...।
অঞ্জন বলল,— তোর জন্য এখানে আলাদা গাড়ি থাকবে ভেবেছিলি নাকি ? স্কুলে থাকতে কখনও বন্ধুদের সঙ্গে এক্সকারশানে যাসনি ? নাকি সেখানেও তোদের বাড়ির গাড়ি যেত ?
—তোরা ওভাবে নিচ্ছিস কেন ? সুদেষ্ণার গলায় মিনতি,— এই বৃষ্টি, ট্যুরের তো একটা অ্যালট্‌মেন্ট আছে, যদি কিছু এক্সট্রা লাগে আমি দিয়ে দিচ্ছি, স্যারের কাছে গিয়ে বল না একটা জিপ টিপ ভাড়া করতে। এখানকার লোকগুলোর গায়ে কী বোঁটকা গন্ধ ! কেমন সব চোয়াড়ে চাষাড়ে টাইপ...
—এদের সঙ্গে যেতে তোর ঘেন্না করছে নারে ? বিক্রম বলে উঠল, —কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনফরচুনেটলি এরাই দেশের এইট্টি পারসেন্ট। যেতে হয় সবার সঙ্গে চল্, নয়ত দ্যাখ ফেরার টিকিট ফিকিট পাস্ কিনা।

বৃষ্টি জানে না এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হয়। তবে লোকাল লোকেদের সঙ্গে যেতে তার মোটেই আপত্তি নেই। কলকাতার বাসট্রামের যাত্রীর থেকে কি আর খারাপ হবে এখানকার লোকজন। বিক্রমের খোঁচাটা তবু ভাল লাগল না তার,

—তোর ওই ফাঁকা বুলিগুলো একটু বন্ধ কর্ তো। সুদেষ্ণার অসুবিধে হচ্ছে বলে একটা প্রোপোজাল দিয়েছে। এই নিয়ে তুই আর অঞ্জন ফালতু বুকনি শুরু করলি কেন ?

—বুকনির কি আছে ? যা বিশ্বাস করি, তাই বলছি।

—কি বিশ্বাস করিস ?

—তোরা বুঝবি না। দিন রাত তো নিজেদের নিয়েই পড়ে আছিস। কামিজের কাটিং কিরকম হবে, কোথায় রাজস্থানী দুল পাওয়া যায়, কোথায় গুজরাটি নাকছাবি, চাইনিজ ডিশ পার্ক স্ট্রিটে ভাল, না ট্যাংরায়, এর বাইরে চিন্তা করিস্ কোন সময় ? এর বাইরেও একটা দেশ আছে, সেখানে কোটি কোটি মানুষ হাড়ভাঙা খেটেও এক বেলার বেশি পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে না...

সব সময় বিক্রম আর অঞ্জনের মুখে বিপ্লবের ফুলঝুরি ছুটছে! বৃষ্টির রাগ হয়ে গেল। বিক্রমকে জিজ্ঞাসা করল,

—তোর শার্টটার কত দাম রে ?

—কেন ?

—এমনিই। বল্ না। জিনস্টাও মনে হচ্ছে ফরেন্ ?

—এটা আমার কাকা পাঠিয়েছে কানাডা থেকে।

—তোর কাকা কি কানাডাতেই সেট্‌লড্ ?

—হ্যাঁ। সো হোয়াট ?

—তুই 'স্যাটে' বসেছিলি না ? স্যাট্ দিয়ে ইন্ডিয়ার কোন্ কোন্ গ্রামে পড়তে যায় রে ছেলেমেয়েরা ?

বিক্রম এতক্ষণে বৃষ্টির ব্যঙ্গ ধরতে পেরেছে। তৃষিতাও মজা পেয়ে এগিয়ে এল,— তুই বিক্রমদের ঠাট্টা করছিস্ বৃষ্টি ? দেখিস্নি কিছুদিন আগে অঞ্জন কিরকম দাড়ি রেখেছিল ? এই অঞ্জন, ওটা কার প্যাটার্ন ছিল রে ? লেনিন ? না হো চি মিন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্জন অল্প থতমত খেয়ে গেল।

বিক্রম বলল, —ওই দ্যাখ, শুভ কি বলছে।

শুভ চেঁচিয়ে সকলকে ডাকছে,— অ্যাই, তোরা এদিকে আয়। এই বাসটা আগে ছাড়বে। আমি সিটে খবরের কাগজ রেখে এসেছি।

দেবাদিত্য বৃষ্টিদের পাশে এসে দাঁড়াল, —শুভটা হেভি বোর হচ্ছে বুঝলি। তখন থেকে মাল কেনার ধান্দা করে যাচ্ছে ; স্যার ওকে কিছুতেই ছাড়বেন না। খালি বলছেন, শুভ তুমি বেশ স্মার্ট আছ, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি কনফিডেন্স পাই।

মীনাক্ষী হেসে উঠল, —ঠিক হয়েছে। উচিত জব্দ।

দেবাদিত্য, মীনাক্ষী আর তৃষিতা আগে আগে হাঁটছে। হাতে হাতে নিজস্ব লাগেজ। অরিজিৎ বৃষ্টিকে বলল,

—ভাল ধরেছিলি দুটোকে। সব সময় ধান্দা চালাচ্ছে কি করে আমেরিকায় কেটে পড়বে। কিছু বললেই উল্টো জ্ঞান দিয়ে দেয়। বলে যাব তো নলেজ গ্যাদার করতে, নলেজের আবার স্বদেশ বিদেশ কি ? বাপ্ মার পকেট বেশি গরম থাকলে বক্তৃতা দিয়ে ভিজে ঘাসেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়।

অরিজিতের মত রামপড়ুয়ার মুখে এ হেন কথাবার্তা বৃষ্টি আশা করতে পারেনি। বৃষ্টি একবার ঘড়ি দেখল। আটটা কুড়ি। এখনও ভোরের শীত লেগে রয়েছে রাঁচির বাতাসে। সূর্য যথেষ্ট চড়া কিন্তু রোদ্দুরের তাত এখনও পুরোপুরি ফুটে বেরোচ্ছে না। অরিজিতের কথায় ফিরোজ আঙ্কলের সেদিনের চেঁচামিচি মনে পড়ল বৃষ্টির। মা'র দু'একজন কলেজের বন্ধু পাকাপাকি ভাবে প্যারিসে থেকে গেছে ; তাদের ওপর কি রাগ ফিরোজ আঙ্কলের,

—বিদেশে গিয়ে থাকতে চাস্ থাক, প্যারিসে নাইটক্লাব আছে, সাতচল্লিশ রকমের পাঁউরুটি পাওয়া যায়, দুশো রকমের মদ, তোর ইচ্ছে না হলে তুই ফিরিস না। তা বলে যদি কোন পুঙ্গির পুত বলে শিল্পের আত্মা খুঁজতে আমি ভিখিরির দেশ ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে পড়ে আছি তবে সে ব্যাটা মিথ্যুকেরও বেহদ্দ। ডোন্ট মাইন্ড ইয়াং লেডি, এই লোকগুলো কেন্নোরও অধম।

রেগে গেলে দু'একটা দেশের গালাগাল বেরিয়ে যায় ফিরোজ আঙ্কেলের মুখ থেকে। বৃষ্টি আরেকটু তাতানোর চেষ্টা করেছিল,

—তাই তুমি এখানে আর্টিস্ট কলোনি করতে চাইছ ?

—কারেক্ট। আমার কলোনিতে সব আর্টিস্ট স্বাধীনভাবে কাজ করবে।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কমিউনিটি লাইফ, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ফিল করছে, চিন্তা কমিউনিকেট করছে, ভাষা কমিউনিকেট করছে। এ নিউ ফর্ম অফ আর্ট মুভমেন্ট। ক্রিয়েটিভ আর্টের জগতে ইনডিভিজুয়ালের যেমন একটা মূল্য আছে, গোষ্ঠীবদ্ধতারও একটা মূল্য আছে।

—সেই জন্যই তো প্যারিসে...

—হোয়াই প্যারিস ? হোয়াই নট ইন মাই সিটি ? আমার কলোনিতে থাকবে ছোট ছোট অজস্র কটেজ, সেখানে হলুদ রোদ, সঙ্গে সবুজের চালচিত্র ! আমি দেখাতে চাই আমার শহরও কি পারে। যদি আমরা চাই।

ফিরোজ আঙ্কল কী ভীষণ ভালবাসে কলকাতাকে। বোধহয় বৃষ্টির থেকেও অনেক বেশি।

বাসে উঠে পিছনের সিটে চোখ চলে গেল বৃষ্টির। রণজয় আর পরভিন তন্ময় হয়ে গল্প করছে।

অনেকক্ষণ থেমে আছে বাসটা। বৃষ্টি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আনমনা চোখ একটা দোকানের দিকে পড়তেই কারেন্ট খেলে গেছে শরীরে। দোকানটাকে সে চেনে ! সাধারণ গঞ্জ মতন জায়গায় ওষুধের দোকান। ময়লা সাইনবোর্ড। বাস থেকে মনে হচ্ছে ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টির চোখ চঞ্চল। ওই তো দরজির দোকানের সাইন বোর্ডে লেখা, কুরু। বাস থেকে নেমে ওই দোকানেই তো ঢুকেছিল বাবা !

... কাগজে মোড়া বড় একটা বোতল ভরে ফেলল কাঁধের ব্যাগে। তারপর পাশের দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় একরাশ জিলিপি। কমলারঙ, গরম, মুচমুচে, কিটকিটে মিষ্টি। বাসে ফিরতেই মা হিশহিশিয়ে উঠল,

—ফের তুমি কিনলে ওসব ? একটা দিন না গিলে থাকতে পারো না ?

বাবার মুখে অপ্রস্তুত হাসি, —রাঁচি থেকে নিতে ভুলে গেলাম। খাচ্ছি তো এইটুকুন, মেডিকেল ডোজ।

মা একবার ছোট্ট বৃষ্টিকে দেখে নিয়েই জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বার করে পরে নিল ! শাড়ির আঁচলে মুখ নাক চাপা। ভয়ানক ধুলো উড়ছে। সব ঝাপসা।...

সুদেষ্ণা ড্রাইভারের পিছনের লেডিজ সিটে বসে এই ডিসেম্বরেও দরদর ঘামছে। দেবাদিত্যরা শেষের টানা লম্বা সিটে কোরাসে গান ধরেছে ! বিক্রম গেয়ে উঠল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—চিটে গুড়ে পিঁপড়ে পড়লে...

বাকিরা দোহারকি দিল, —নড়তে চড়তে পারেএএ না...

সাঁওতাল মেয়েরা ওদের ভঙ্গি দেখে এ ওর গায়ে হেসে গড়াগড়ি। টি এম মুখ ঘুরিয়ে রয়েছেন। এ সময় মাস্টারমশাইরা প্রকৃতি দেখতে ভালবাসেন।

বাসে বেশির ভাগই স্থানীয় উপজাতির মানুষ। দুজন সাঁওতাল যুবক মীনাক্ষীর পাশের জানালা বেয়ে তর তর করে ছাদে উঠে গেল। মীনাক্ষী ভয়ে হাত সরিয়ে নিল। বাসে ওঠার পর থেকেই সিঁটিয়ে ছিল মেয়েটা।

বাস দাঁড়িয়েই রয়েছে। মনে হয় এখানে আজ হাটবার।

পিছন থেকে শুভর চিৎকার শুনতে পেল বৃষ্টি,— এই মেয়েরা, তোরা গাইছিস্ না কেন ? তৃষিতা, তুই তো সব সময় গলা মেলাস্, তুই গা।

তৃষিতা ঘাড় ঘুরিয়ে ভেংচি কাটল। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে কেউ দেখতে পেল বলে মনে হল না। তৃষিতার কোলের পাশে এক আদিবাসী শিশু জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে। কন্ডাক্টর তাকে টেনে সরিয়ে দিল,

—ইধার আ যা। মেমসাব কো তন্ মত্ কর্।

মীনাক্ষী তৃষিতার উরুতে চিমটি কাটল,

—এই, কন্ডাক্টর তোকে মেমসাহেব বলছে।

লোকটাকে দেখে বৃষ্টির হাসি পেয়ে গেল। কি বিদ্‌ঘুটে চুলের ছাঁট, জুলপি চাঁছা, ব্যাকব্রাশ করা চুল ঘাড় অবধি লতানো, রাস্তার হিন্দি সিনেমার পোস্টারে যেরকম দেখা যায়। হিরোস্পেশাল। মাথায় তেলও মেখেছে অঢেল। তেলের উগ্র গন্ধ বাতাসে ম-ম করছে। এমন একটা লোকের মুখে মেমসাহেব সম্বোধন শুনেও তৃষিতা বেশ বিগলিত। তৃষিতার গায়ের রঙ যথেষ্ট চাপা, কালোই বলা যায় তাকে। মেমসাহেব বলে ডাকলে ভিখিরিকেও বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে সে। লজ্জা লজ্জা মুখে বলল,

—ফাজলামো হচ্ছে ? তোরা যাই বল লোকটার ফিজিক কিন্তু দারুণ।

বৃষ্টি মীনাক্ষি চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। বাসটাও ছাড়ল ঠিক সেই মুহূর্তে। ধীরে ধীরে ঘামের ওপর উষ্ণ বাতাসের ছোঁয়া। শীতের শুরুতেও এসব অঞ্চলে দুপুরে এত গরম থাকে কি করে কে জানে !

দূরে ছোট ছোট টিলা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বৃষ্টি বলল, —মীনাক্ষি, তুই বিহারের এদিকটায় আগে কখনও এসেছিস ?

—এদিকে আসিনি, তবে মধুপুরের দিকে গেছি। ওখানে আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে। প্রায় শীতেই বাড়িসুদ্ধু দলবেঁধে হল্লা করতে যাওয়া হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে। তুই এসেছিস ?

—এসেছিলাম একবার। ছোটবেলায়। তেমন খুব একটা মনে নেই।

—এদিকটা ভীষণ ড্রাই। মধুপুরের দিকে আমগাছ-টাছ আছে প্রচুর।

—ড্রাই সয়েলেরও একটা রাফ বিউটি আছে। কি সুন্দর তালে তালে টিলাগুলো আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে দ্যাখ।

বেলা তিনটে নাগাদ বাস থামল এক গ্রামে। এর পর থেকে শুরু হবে পাহাড়, জঙ্গল। বাস মিনিট দশেক দাঁড়াবে বলে সবাই নেমে পড়ে হাত-পায়ের খিল ছাড়াচ্ছে। শুভ লম্বা অ্যাথলেটিক চেহারা কোমর থেকে ভাঙছে আর সোজা করছে। কাল অনেক রাত অবধি ট্রেনে যে উন্মত্ত হুড়োহুড়ি করেছে তার কোন চিহ্নই নেই কারুর শরীরে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েই সব আবার তরতাজা।

—ইয়ে বনারি হ্যায় তো ?

অঞ্জন চিৎকার করে গল্প জুড়েছে এক থুরথুরে বুড়ির সঙ্গে। জনসংযোগ ! বুড়ি কি বুঝল কে জানে, ফিক করে হাসি উপহার দিল একটুকরো।

—ইধর কোয়েল নদী কাঁহা হ্যায় ? কোয়েল ? কোয়েল ?

বৃষ্টি অঞ্জনকে ডাকল, —এই ফিরে আয়। ওই টোনে হিন্দি বলে আর লোক হাসাস না।

অঞ্জন থামল না।

—তুমহারা গ্রামকা কাছমে হোনা চাহিয়ে। ম্যাপমে দেখা হ্যায়। ম্যাপ জানতা হ্যায় ? ম্যাপ ? অ্যাটলাস্ ?

দেবাদিত্য বলল, —তোর ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রাইবাল বেল্টে চলবে না। এখানে দরকার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখব নাকি একবার ট্রাই করে ?

এদের মাঝে পড়ে বুড়ি বিড়বিড় করে কি যে বলে চলেছে বোঝা যায় না।

টি এম একা হাঁটতে হাঁটতে উল্টোদিকে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ডাকছেন ছেলেমেয়েদের,

—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠার পর একটা রাস্তা সেপারেট হয়ে চলে গেছে বেতলা ফরেস্ট, ডাল্টনগঞ্জ। ওই পথে একটা ফিফটিনথ সেনচুরির বিধ্বস্ত কেল্লা আছে। তাছাড়া রাজা মেদিনী রায়ের ভাঙাচোরা মাটির ফোর্টও পড়ে পথে। আর কিছুটা গেলে...

—ক্লাস নিচ্ছে রে, কেটে পড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে সকলেই টি এম এর কাছ থেকে দূরে সরতে সরতে বাসের কাছে। বিক্রম বাসে হেলান দিয়ে দামী ক্যামেরাটা নিয়ে খুটখাট করছিল। রণজয় বাসের জানালা দিয়ে প্রশ্ন করল,

—ক্যামেরায় কিছু প্রবলেম হচ্ছে নাকি ?

—টাইমারটা মনে হয় গণ্ডগোল করছে।

—ছাড় তো, টাইমার দিয়ে কি হবে ? ছবি উঠলেই হল।

বিক্রম সামান্য অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎই রণজয়ের দিকে তাকিয়ে কান এঁটো করে হাসল, —আরে, খেয়ালই করিনি তুই কথা বলছিস। তোরাও যাচ্ছিস নাকি আমাদের সঙ্গে !

রণজয় পরভিন বাস থেকে নামেনি। বিক্রমের ঠাট্টা গায়ে মাখল না তারা।

বাস স্টার্ট নিচ্ছে। কন্ডাক্টর ডাকল, —চলিয়ে, চলিয়ে, পৌঁছনেমে অ্যায়সে হি শাম হো যায়েগি।

শুভ বাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। ধ্যাত্‌তেরি বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেট।

কন্ডাক্টর ভুল বলেনি। বাস থেকে নেমে গভর্নমেন্ট লজের ডরমেটরিতে ঢুকতে ঢুকতে সূর্যের প্রায় চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ে ওঠার পর থেকেই গরমের ছিটেফোঁটা মুছে গিয়েছিল। এখন বেশ কনকনে পাথুরে ঠাণ্ডা। অন্ধকার ভাল করে নামার আগেই চতুর্দিক হিমশীতল।

ছেলেরা মেয়েরা পৃথক পৃথক দুটো ঘরে। টি এম-এর একার জন্য একটা ডবল বেড। মেয়েরা এসেই প্রথমে বাথরুম দখল করতে শুরু করে দিয়েছে। সারাদিনের রোদখাওয়া ধুলোমাখা মুখ এক্ষুনি মসৃণ চকচকে করে ফেলতে হবে।

বৃষ্টি শাল জড়িয়ে বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশে এখনও সামান্য লালচে আভা। বৃষ্টির সামনের পাহাড়গুলো যদিও এর মধ্যেই অন্ধকার মেখে নিয়েছে গায়ে। যেন গুটিসুটি মেরে বসে থাকা কালো বুড়ো। ট্রেনের জানলা থেকে দেখা ব্রাহ্ম মুহূর্তের আকাশটা সারাদিনে কতবার যে রঙ বদলাল ! রাঁচিতে ঢোকার আগে, ভোরের আলো যখন পাহাড়ে পড়েছিল, তখন পাহাড় যেন নীল সবুজে মেশা এক ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী, আবার সেই পাহাড়রাই দুপুরে বাস থেকে একদল বর্ণহীন প্রবল পুরুষ, এখন সন্ধ্যায় তারাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় কালো বৃদ্ধ।

নিখিলমামা বলত, —বুঝলি বৃষ্টি, ইন্‌অ্যানিমেট্‌ অবজেক্টের কোন নিজস্ব ক্যারেক্টার থাকে না। সেটা কোথায় রয়েছে, কেন রয়েছে তার ওপর কিভাবে লাইট অ্যান্ড শেড কাজ করছে, সেটাই ঠিক করবে বস্তুর ক্যারেকটর। যেমন ধর তোদের ওই দুধঅলার সাইকেলটা। ভোরবেলা যখন দুপাশে দুধের ক্যান ঝুলছে, তখন মনে হয় না সাইকেলটা যেন বাঁক কাঁধে জল দেওয়ার ভারী? আবার ওই সাইকেলের হ্যান্ডেলের মাঝখানটায় লাল টুপি বসিয়ে দে, ওটা তখন হয়ে যাবে বুলফাইটের ষাঁড়। ম্যাটাডোরের দিকে রেগে ছুটছে।

বৃষ্টির ছোটতে কী নেশাই না ছিল আঁকার! বলতে গেলে নিখিলমামার কাছেই তার নাড়া বাঁধা।

ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় বৃষ্টিদের স্কুলে এক বিরাট সিট্‌ অ্যান্ড ড্র কমপিটিশন হয়েছিল। আট-দশটা স্কুল মিলিয়ে হাজারখানেক ক্ষুদে শিল্পী। বৃষ্টি ফার্স্ট! প্রাইজ ডে'র দিন মা আসবে বলে কথা দিয়েও আসেনি। সেদিনই কার একটা এগজিবিশনের প্রিমিয়ারে আটকে গিয়েছিল। হয়ত কোন নামকরা আর্টিস্টের। হয়ত কোন বন্ধুর। অনেক রাত্রে প্রাইজ দেখে মা বৃষ্টিকে আদর করার চেষ্টা করেছিল,

—তোর রাগ হয়েছে বৃষ্টি? কি করব বল, এমনভাবে সবাই আটকে দিল...

বৃষ্টি একটা কথাও বলেনি। একফোঁটা জলও আসেনি তার চোখে। দাদু দিদা মা ভালমামা কেউই বুঝতে পারেনি আর কোনদিন ছবি আঁকবে না বৃষ্টি।

বৃষ্টির মনে হল এই মুহূর্তেই তার একটা সিগারেট দরকার। একটা সিগারেট। একটা সিগারেট।

ছেলেরা কোত্থেকে তিন-চারটে লাঠি জোগাড় করে ফেলেছে। এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে অকারণ লাঠি চালাচ্ছে। কীটপতঙ্গ সাপখোপ কি যে ওরা মারে!

টি এম্‌ ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, —লাস্ট মান্‌থে এখানে একটা বাঘ বেরিয়েছিল। যে জঙ্গলটা রয়েছে সেখান থেকেই। ইউজুয়ালি এদিকে বাঘ থাকার কথা নয়, তবে কোন কোন সময় অন্য রেঞ্জ থেকে চলে আসে এক-আধটা। লোকাল গ্রামের কুঁড়েঘর থেকে একটা ছাগল তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা যখন তখন যেখানে সেখানে বেরোবে না। যদিও প্রতিটি বাঘের একটা নির্দিষ্ট জোন্‌ থাকে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবাদিত্য থামিয়ে দিল টি এম-কে, —গাঁয়ে মানুষ ছিল না স্যার ? নাকি বাঘেরাও আমাদের মতো মাটন্ খেতে ভালবাসে ?

বিরলকেশ, সৌম্যদর্শন অধ্যাপক হেসে ঘরে চলে গেলেন। এসব ট্যুরে ছেলেমেয়েদের টীকাটিপ্পনি উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুদেষ্ণা বারান্দা থেকে বৃষ্টিকে ডাকল,

—এই বৃষ্টি, বাথরুম খালি। মুখ হাত ধুবি তো চলে আয়।

বৃষ্টির জায়গাটা ছেড়ে একটুও নড়তে ইচ্ছে করছে না। চাঁদ ওঠার পর অন্ধকার অনেক মিহি। দূরে, বহু নীচে, কয়েকটা আলোর ফুটকি। কোন গ্রামট্রাম ! না শীতে স্থানীয় অধিবাসীরা কাঠকুটো জ্বেলেছে !

...ছ' ফুট লম্বা, ফর্সা, মেদহীন শরীরে তুঁতে রঙ সোয়েটার পরে গটগট করে বাবা নেমে যাচ্ছে পাইন গাছের মাঝখান দিয়ে। নামতে নামতে, নামতে নামতে একটা দীঘির পাড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল।

—মা, বাবা কোথায় চলে গেল ?

—জাহান্নামে। চল, আমরা ফিরি।

—বাবা আসবে না ?

—আসবে। সময় হলেই। নেশা ছুটলে।

ক্ষুদে বৃষ্টি একটা ইটের টুকরো তুলে ইউক্যালিপটাসের গুঁড়িতে কাঁচা হাতে বানান করে করে লিখে দিল, —বাবা, জলদি এসো। ...

বাবা এখনও ফরিদাবাদে। কবে যে ফিরবে !

—কিরে, একটা সিগারেট চলবে নাকি ? ধর, অনেকক্ষণ তো শুকনো আছিস।

চাঁদের আবছা আলোয় শুভর মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না বৃষ্টি।

—লজ্জা করে না বলতে ? নিজেরা ফাঁক পেলেই টুকটাক চালিয়ে যাচ্ছিস ? গোটা দে একটা। আমার প্যাকেট রুমে।

সিগারেট ধরিয়ে সারাদিন পর মৌজ করে টান দিল বৃষ্টি। চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়াটাকে গিলল।

—আহ্। মাথাটা একদম ধরে গেছিল। চা-ফা দেবে না ?

—চা খেয়ে কি হবে ? বিক্রম আর রণজয় ট্রাইবালদের ঠেকের দিকে গেছে। এখানে এসে যদি মহুয়া দিয়েই না শুরু করা যায়...

—তুই সত্যি কলকাতা থেকে কিছু আনিসনি ? সেদিন যে খুব হিড়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুললি ?

—ধুস্, কেউ কন্‌ট্রিবিউট করল না। নিজের পয়সায় আনি আর সবাই মিলে ফাঁক করে দিক।

—টি এম্ ঝামেলা করবে না তো ?

পরভিন কখন গুটিগুটি এসে বৃষ্টির পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টির কথায় হি হি হেসে উঠল, —স্যারের কাছেই একটা ছোট বোতল আছে। ব্যাগ খোলার সময় রণজয় দেখে ফেলেছে। অ্যাই শুভ, আমি কিন্তু আজ একটু মহুয়া টেস্ট করব।

—যা যাহ্। কতটুকুনি জোগাড় হয় তার ঠিক নেই। মেয়েরা বাদ। শেষে খেয়ে একটা কিছু কেলো করো...

বৃষ্টি ফুঁসে উঠল, —এম সি পির মতো কথা বলিস না তো। মাল খাওয়ায় আবার ছেলেরা মেয়েরা কিরে ?

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শাল কম্বল পুলোভার জড়িয়ে সকলে বসেছে বারান্দায়। টি এম্ এতক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছিলেন, একটু আগে শুতে গেলেন। গোটা ট্যুরিস্ট লজ নিস্তব্ধ। বোর্ডাররা যে যার বন্ধ ঘরে। বাঙালি নবদম্পতি অনেকক্ষণ বাইরে বসেছিল, তারাও একটু আগে দরজা বন্ধ করেছে।

শুভ গুম হয়ে বসে আছে। বিক্রমরা একফোঁটা মহুয়াও জোগাড় করতে পারেনি। অঞ্জন মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে সুর ধরল,

—হ্যায় আপনা দিল, তো আওয়ারা...

না জানে কিস্‌পে আয়েগা...

সারাদিন পর মন উদাসকরা সুরে চোখ জড়িয়ে আসছে সকলের। দেবাদিত্যর মতো ছেলেও নিশ্চল তাকিয়ে দূরের আঁধারের দিকে। আকাশে পাতলা মেঘের স্তর থাকায় চাঁদের দীপ্তি ছড়াচ্ছে না পুরোপুরি।

...ঘুম ভেঙে গেছে অন্ধকারে। কম্বল পায়ের কাছে জড়ো। বিছানায় উঠে বসতেই দুটো চাপা কণ্ঠস্বর।

—ভেবে থাকলে অন্যায় কি ? মেয়ে পড়ে থাকবে আর মা ড্যাং-ড্যাং করে লন্ডন প্যারিসে বেড়াতে যাবে !

—তুমি অফিস ট্যুরে যাও না ? তখন মেয়েকে কে দেখে ? আসলে তোমাকে আমার হাজব্যান্ড বলে পরিচয় দেওয়া হয়, সেটাই তোমার আঁতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে। হিংসুটে কোথাকার। টাকার ধান্দা ছাড়া তো জীবনে কিছু শেখোনি।

কাচের গ্লাসে টুং-টাং শব্দ। মা খাটে ফিরেছে। বন্ধ চোখেও বৃষ্টি বুঝতে পারছে মা দেখে নিচ্ছে মেয়ে ঘুমিয়েছে কি না। আবার ফিরে গেছে।

—আমি বলছি তুমি যাবে না। যাবে না ব্যস।

—একশো বার যাব। এ সুযোগ বার বার আসে না। একবার তোমার জন্য ফ্রেঞ্চ-স্কলারশিপ মিস্ করেছি...

—আমার জন্য ? না বাচ্চা হবে বলে ?

—তুমিই তো ফাঁসিয়েছিলে। ইচ্ছে করে। যাতে আমি না যেতে পারি তাই।...

এত বছর পর দৃশ্যগুলো কেন উঠে আসছে বৃষ্টির চোখে ? আসছেই যদি তবে কেন শুধুই ভয়ঙ্কর সেগুলো ? বুক ভেঙে আচমকা একটা কান্না উঠে আসতে চাইছে। চোখের দু কূল ছাপিয়ে গেল। অঞ্জনের সুর ভেঙে দিল শেষ প্রতিরোধ। নিঃসীম ফিকে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল চোখের জলের পর্দার ওপারে। বৃষ্টি হাঁটুতে মুখ গুঁজল।

ফ্রিসবিগুলো বাতাসে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে, দুলতে দুলতে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাচ্ছে, সেখান থেকে আরেক। শুভ হলুদ ছুঁড়ে লুফে নিল নীল। মীনাক্ষি নীল ধরে গোলাপি ছুঁড়েছে। বিক্রম সবুজ ছুঁড়ে লাল। প্লাস্টিকের চাকতি নয়, যেন একঝাঁক রঙিন পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে মায়াবী রোদ্দুরে বিকেলের আকাশে। শীতল বাতাস কেটে কেটে। পাইন গাছের ওপারে, মাঠের প্রান্তে মিলিটারি ছাউনি থেকে দু-চারজন জওয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে রঙিন পাখিদের ওড়াউড়ি।

দেবাদিত্য একটা সবুজ ফ্রিসবি ছুঁড়ে দিল বৃষ্টির দিকে,

—এই বৃষ্টি ধর।

চাকতিটা সামনে এসেও সোঁ করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে লেকের পাড়ে। সুদেষ্ণার ছোঁড়া নীল ফ্রিসবি বৃষ্টির নাকের সামনে দিয়ে হাওয়ায় বেঁকে চলে গেল শুভর দিকে। বিক্রমের হলুদ চাকতি বৃষ্টির আঙুল ছুঁয়ে পালিয়ে গেল। বৃষ্টি অধৈর্য হয়ে উঠছে। আশ্চর্য ! সবাই কি সহজেই ধরে ফেলছে, সে কেন পারছে না ? এবার ধরতেই হবে। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে নিজেরই সালোয়ারে পা জড়িয়ে। স্বচ্ছ ওড়না ছিটকে গেল।

দেবাদিত্য দাঁত বার করে হেসে উঠল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এবার পারবি। ওঠ। ধর।

বৃষ্টি কামিজের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। সব আনন্দের মুহূর্তই তার আঙুলে ছোঁয়া দিয়ে দূরে সরে যায়। কই, আর কারুর তো এরকম হচ্ছে না!

বৃষ্টির ফর্সা মুখে রক্ত জমেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, কোন এক সুড়ঙ্গ পথ ধরে কনকনে বাতাস দৌড়ে আসছে হঠাৎ হঠাৎ।

ইউক্যালিপটাসের একটা সরু ডাল ভেঙে শুঁকছে অরিজিৎ। বৃষ্টি তার দিকে এগিয়ে গেল,

—চল, একটু হেঁটে আসি।

অরিজিৎ দলের সঙ্গে থাকতে সব সময়ই অস্বস্তিবোধ করে। বৃষ্টি লক্ষ করেছে, যে কোন একজনের সঙ্গে কথা বলার সময় সে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। স্বাভাবিক। অকারণে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মোছা অরিজিতের প্রিয় মুদ্রাদোষ। বৃষ্টির হাতে ডালটা ধরিয়ে সেই কাজটাই সারল সে। তারপর বলল,

—চল। আমারও ওই ফ্রিসবি খেলা ঠিক আসে না।

শুভ চিৎকার করে বলল, —তোরা চললি কোথায়?

বৃষ্টি গলা ওঠাল, —পরভিন রণজয়কে খুঁজতে।

—অরিজিৎ এখনও মাইনর আছে। ওকে নিয়ে যাস না। তেমন কিছু সিন দেখে ফেললে ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিবি। সেন্সরড হয়ে যাবে।

অরিজিৎ কিছুই বুঝতে পারল না,

—কেন রে? কি হয়েছে রণজয়দের?

বৃষ্টি উত্তর দিল না। মনে মনে বলল, হয়নি। হবে। তখন মজা বুঝবে।

হাঁটতে হাঁটতে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় চলে এসেছিল অরিজিৎ আর বৃষ্টি। এখানে গাছপালা একটু বেশি ঘন, শাল ছাড়াও বেশ কয়েকটা পলাশ, মহুয়া, সেগুন গাছও রয়েছে। বাতাসের ফিসফাস ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে।

অরিজিৎ আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কিরে, কি হল তোর!

—ভাল লাগছে না রে। আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

ছোট্ট লাল নুড়ি তুলে অরিজিৎ ছুঁড়ল সামনের শালগাছের গায়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এই শালবনে যদি সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। ওই জঙ্গলে কুঁড়েঘর তৈরি করে আদিবাসীদের মতো থাকতে পারতাম !

বৃষ্টির ভুরু কুঁচকে গেল। মেয়েদের একা পেলেই অনেক ছেলে অহেতুক রোমান্টিক হয়ে উঠতে চায়। গত বছরই লেকের ধারে তাকে একা পেয়ে পিকলুও কেমন গদগদ হয়ে পড়েছিল।

গম্ভীর মুখে অরিজিৎকে বলল,

—এনাফ্। অনেক হয়েছে। চল, এবার ফেরা যাক।

—বিশ্বাস করছিস না আমাকে ? সত্যি বলছি, অন গড, আমি আর পারছি না। কলকাতায় ফিরে সেই আবার মুখ গুঁজে পড়াশুনো, বই নোটস...। অরিজিৎ থেবড়ে মাটিতে বসে পড়ল।

হল কি ছেলেটার ! এ তো ঠিক প্রেম নিবেদনের সংলাপ নয় ! বৃষ্টি ধীর পায়ে অরিজিতের পাশে এসে নিচু হল।

—কি হল তোর বল তো ?

—কী হালেই না জুতে দিয়েছে আমাকে বাবা মা। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে। ওয়ান থেকে কেন ? নার্সারি থেকেই। স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে, উল্টোদিকের বাড়ির সিঁড়িতে, ঠায় বসে থাকত মা। স্কুল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত, দেখি দেখি, কি টাস্ক দিয়েছে ? ক্লাস ওয়ার্কে কত পেলি ? হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে বাড়িতে এনেই আবার বই-এর সামনে, তোমাকে বড় হতে হবে বাবুন, মন দিয়ে পড়াশুনো করো। ক্লাস ফাইভ থেকে স্কুলের পরে টিউটোরিয়াল। বাড়ি ফিরতে সেই সন্ধে। কোন লাইফ নেই। খেলা নেই। গল্পের বই পড়বে না। মাধ্যমিকের আগে সায়েন্স গ্রুপের জন্য তিনটে টিউটর লাগিয়ে দিল। এককাঁড়ি খরচা, তবুও। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। শরীর টলছে। মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। তোতাকাহিনীর পাখিটার মতো। কানের কাছে ভনভন চলছে, তোকে নিয়ে আমাদের খুব আশা বাবুন। যেন আরেকটা জে সি বোস বা সি ভি রমন চাই। চাই-ই। মাধ্যমিকে অঙ্কে পেলাম ফরট্রিফোর।

—মাত্র ফরট্রিফোর ? কেন রে ?

—নয়তো কি ? অঙ্ক আমার একটুও ভাল লাগে না। মাথাতেই ঢোকে না। শেষমেষ বাধ্য হয়ে এইচ. এস-এ. আর্টস পড়া। মেনে নিল। এখন চায় আমি একটা পারসিভাল হই বা আর সি মজুমদার। সামথিং অরিজিনাল। বিগ্। নইলে বাবা মা আমাকে ছাড়বে না। কি করে বোঝাই হিস্ট্রি ইজ নট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলসো মাই কাপ অফ টি। আমার লিটারেচর ভাল লাগে।

—সেটাই পড়লে পারতিস।

অরিজিৎ শব্দহীন বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। নখ দিয়ে এক মনে পাশের মাটি খুঁড়ছে। দূরে অপসৃয়মান সূর্যের ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়েছে তার মুখে। এই ক' মাসের চেনা অরিজিৎ একদম অন্যরকম। অবসন্ন।

—কি করে পড়ব ? সাহিত্য পড়ে তো আর শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না। কী ভালই যে লাগত কবিতা পড়তে। তুই জীবনানন্দ পড়েছিস বৃষ্টি ? সেই কবিতাটা ? সেই যে,

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম। / সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হয়ে যেন আসে ;/ যদিও আকাশ সিন্ধু ভরে গেল অগ্নির উল্লাসে ;/ যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় ক্ষেতের গোধূম/ চিলের কান্নার মতো শব্দ করে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম/ গাঢ় করে দিয়ে যায়। —এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।

অরিজিৎ যন্ত্রণায় নুয়ে পড়েছে। এক ক্লিন্ন, ন্যুব্জ, বৃদ্ধ যেন।

শালবনের ফাঁক দিয়ে অদূরে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তিন-চারটে মিশকালো আদিবাসী শিশু খেলা করছে সেখানে। ঢিল ছুঁড়ছে পরস্পরের দিকে। আদিম খেলা।

অরিজিতের পিঠে আলতো হাত রাখল বৃষ্টি, —চল্। ওঠ। অন্ধকার হয়ে আসছে।

শুভ রাগে ফেটে পড়ল, —অপদার্থের দল। দু দিনে একটু মহুয়া জোগাড় করতে পারলি না ? তোরা টি. এম-কে সামলাস, আমি কাল নিজেই যাব।

বিক্রম বলল, —ওদের পাড়াতেও তো গিয়েছিলাম কিন্তু কাকে যে বলতে হবে সাহস করে সেটাই...

—এতে সাহসের কি আছে ? পয়সা ফেলবি, জিনিস কিনবি। এত ক্যাবলা তোরা...

মীনাক্ষি আচমকা ঝাঁঝিয়ে উঠল, —তোদেরও বলিহারি যাই। বেড়াতে এসেছিস বলে কি খেতেই হবে ? না খেলে কি হয় ? বাবা মা বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে আর তোরা এখানে...

মীনাক্ষির কথায় চোখ জ্বলে উঠল বৃষ্টির, —বেশি খুকিপনা করিস না তো। বাবা মা অনেক দেখেছি। বেড়াতে এসেছি, খেতে ইচ্ছে করছে, খাব।

—তুইও খাবি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—খাবোই তো। ইচ্ছে হলে খেয়ে বেহেড হব। বাবা মা যা চাইবে, তাই করতে হবে নাকি সবসময়? তোর বাবা মা সব কাজ বুঝি তোর পারমিশান নিয়ে করে?

দেবাদিত্য মাঝখানে পড়ে থামাতে চাইল, —বৃষ্টি, কি হচ্ছেটা কি? মীনাক্ষি তো ঠিকই বলছে। খেতে ইচ্ছে করলে কলকাতা ফিরে গিয়ে যখন ইচ্ছে হয় খাবি। সাহস থাকলে বাড়ির লোকের সামনে খাবি। বেড়াতে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে...

—এখানেও খাব। দরকার হলে বাড়িতে গিয়েও খাব। তুই আমাদের কথার মাঝখানে এসে ভাঁড়ের মতো দাঁড়িয়েছিস কেন?

মীনাক্ষি বলল, —দেবাদিত্য সরে আয়। না খেয়েই ও মাতাল হয়ে গেছে।

দেবাদিত্য হাঁ করে বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল। বুঝি বৃষ্টিকে পড়তে চাইছে।

তৃষিতা বলল, —এই ছেলেরা, তোরা বেরো তো ঘর থেকে। ঘুম পাচ্ছে।

পরভিন বলল, —কি হয়েছে? আরেকটু থাকুক না ওরা। সবে তো রাত দশটা। কাল বাদে পরশুই তো...

সুদেষ্ণা মুখে কোল্ডক্রিম মাখছিল। তার বিদেশী নাইলন নাইটির ওপর শাল জড়ানো। মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় পরভিনকে বলল, —তোর যদি ইচ্ছে হয় সারারাত বাইরে গিয়ে আড্ডা মার। আমরা ঘুমোব।

ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে পরভিন।

তৃষিতা চাপা গলায় বলল, —পরভিনটা ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বাড়িতে সব সময় রিপ্রেশনের মধ্যে থাকতে থাকতে একটা সাংঘাতিক কিছু করবার ইচ্ছে গ্রো করে। ছেলেদের সঙ্গে জীবনে মেশেনি তো।

সুদেষ্ণা ঠোঁট ওল্টাল,—ও তো প্রথম প্রথম কলেজে এসে ফিলজফির অরিন্দমের সঙ্গেও কদিন ঘুরেছিল।

—বেশ রেবেল রেবেল ভাব এসেছে ওর মধ্যে। যেদিন ওর বাড়িতে জানবে...ওর দাদাসাহেব ওর ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে খাবে। আসলে যারা যত কনফাইন্ড থাকে...। দেখছিস না জার্মানি পোল্যান্ডে কি অবস্থা!

বৃষ্টি টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কি মনে হতে আবার উঠে বসেছে। বালিশের পাশে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল। রাগটা না থিতোলে ঘুম আসবে না তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরবেলা খেয়ে উঠে বৃষ্টি একাই বেরিয়ে পড়ল লজ থেকে। জনা পনেরো আদিবাসী শালগাছের নীচে জটলা করছিল, একটা মেয়েকে ভরদুপুরে একা দেখে ঘুরে ঘুরে দেখছে। বৃষ্টি তাদের লক্ষই করল না। লালচে মেটে পথে এলোমেলো হাঁটল কিছুক্ষণ। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। লোকবসতি এত কম যে মাঝে মাঝেই মনে হয় সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। ইউক্যালিপটাসের হাল্কা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানল। আহ্।

হঠাৎই পশ্চিমের একটা বাড়িতে চোখ আটকে গেল বৃষ্টির। ওই বাড়িতেই সেবার উঠেছিল না! হলুদ রঙ বাড়ি! অ্যাসবেসটসের ছাদ! হয়ত ওটাই। হয়ত ওটা নয়।

বৃষ্টি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। গেটে ওয়াটার ওয়ার্কস ইন্সপেকশন বাংলোর সাইনবোর্ড। উঁকিঝুঁকি দিতেই নেভি-ব্লু লঙ্‌কোট পরা বুড়ো দারোয়ান বেরিয়ে এল।

—কিস্‌কো চাহিয়ে? শমাজি আভি নেহি হ্যায়।

বুড়োর কথা বৃষ্টির কানে ঢুকল না। সামনের লম্বা করিডোরে চোখ অশান্তভাবে ঘুরছে। ডানদিকে পর পর দুটো সেকেলে দরজা। বাঁদিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বাগানে একটা অর্জুন গাছ। কুঁয়ো। এই বাড়িটাতেই ছিল তারা।

কোন্ ঘরটায় তারা ছিল! প্রথম, না দ্বিতীয়! একবার যদি দেখা যেত!

বুড়োকে অগ্রাহ্য করে বৃষ্টি এগোল। দুটো ঘরেই তালা ঝুলছে। বন্ধ ঘরে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে লড়াই করছে দুটো প্রাণী। দরজাতেও নখের আঁচড়ের আওয়াজ।

বৃষ্টি তীরবেগে বেরিয়ে এল। সোজা কাল বিকেলের মাঠটার দিকে হাঁটছে। কোথাও যদি একটু বসতে পারত সে! এই চড়া রোদের মধ্যে একটু ছায়া! একদম একা!

ফ্রিসবি খেলার মাঠ এখন শুনশান। মাঠের পরেই লেক। লেকের জল রোদ্দুরে ঝিকমিক। এই মাঠটাকেই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা বলে মনে হয়েছিল ছেলেবেলায়! ওই লেকটাকে টলটলে জলের হ্রদ! হয়ত এ রকমই হয়। ছোটবেলায় যা বিশাল, বর্ণময়, রোমাঞ্চকর, বড় হলে সেটাই একেবারে ছোট্ট, ম্যাড়মেড়ে। পাইন গাছগুলোকেও আর তত উঁচু লাগছে না বৃষ্টির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ' বেডের ডরমেটরির ষষ্ঠ বিছানায় ডাঁই স্যুটকেস, কিটসব্যাগ, জামাকাপড়, সোয়েটার। টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে সকলে। কাল ভোরে ফেরার পালা।

সুদেষ্ণা খাটের বাজুতে রাখা শাল ভাঁজ করে তুলল নিজের স্যুটকেসে। স্যুটকেস বন্ধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আসার সময় কি করে যে সব জামাকাপড় ঢুকেছিল ভেতরে!

—অ্যাই তৃষিতা, একটু চেপে ধর না প্লিজ।

তৃষিতা চাপতে শুরু করল। নিশ্বাস বন্ধ করে। হাঁটু দিয়ে। হঠাৎ দমকা হাসি এসে ছিটকে বার করে দিল নিশ্বাসটাকে। স্যুটকেস ছেড়ে গড়িয়ে পড়েছে হাসতে হাসতে। হাসির দমকে দেহ কাঁপছে থর থর। পাগলের মতো অবস্থা প্রায়। কাপড়জামা গুছনো থামিয়ে বাকিরা হাঁ করে দেখছে তাকে।

মীনাক্ষি তার দু কাঁধ চেপে ধরল, —উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি? কি হয়েছে বলবি তো?

—ওই হানিমুন কাপলটা...হিহি... হিহি... হিহি... গাছের আড়ালে গিয়ে ছেলেটা চুমু খাচ্ছিল মেয়েটাকে।... হিহি... তাদের ফেরার সময় কী করুণ অবস্থা।

সুদেষ্ণা আর মীনাক্ষিও হাসিতে ফেটে পড়ল। বৃষ্টিও। দুপুরের পর এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসছে সে।

ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টে সূর্যাস্তের পর জিপ প্রথমে মিলিটারি অফিসারের বউ ছেলেমেয়েকে পৌঁছতে গিয়েছিল, ফিরে এসে নিয়ে যাবে বাকি সকলকে। নবদম্পতিও ছিল বৃষ্টিদের সঙ্গে। জিপ জঙ্গলে মিলিয়ে যাওয়ার পর সদ্য কলেজে ওঠা ছেলেমেয়েদের দঙ্গল এড়িয়ে একটু বোধহয় একান্ত হতে চেয়েছিল দুজনে।

—কি গান গাইছিল মেয়েটা শুনেছিস? তুঁহু মম প্রাণ হে...। সুর করে দেখাতে গিয়ে তৃষিতার গায়ে গড়িয়ে পড়েছে সুদেষ্ণা।

তৃষিতা দম নেওয়ার চেষ্টা করল, —আর দেবাদিত্য কী না করছিল! এমন ভয় দেখাল দুজনকে...এখানে প্রায়ই বাঘ আসে, বুনো ভাল্লুক মহুয়া খেয়ে ঘুরে বেড়ায়...বিক্রম আবার ক্যামেরা নিয়ে মাঝে মাঝেই ট্রাই করে যাচ্ছিল যদি কোন ইনটিমেট শট নেওয়া যায়।

—নিয়েছে তো? জানিস না? ওই চুমু খাওয়ার সিনটা? ফ্ল্যাশ জ্বলতেও ওরা টের পেল না। বলতে বলতে বৃষ্টি হেসে গড়াগড়ি। হাসতে হাসতে ঘুষি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁড়ছে বালিশে।

—তোরা ওভাবে হাসছিস ? পরভিনের মুখ হাসিহাসি কিন্তু হাসছে না, —বেচারা মেয়েটা ভয়ে কিরকম কেঁদে ফেলল...

—তোর খুব মায়া হয়েছে নারে ? তুইও কি ওরকম... ?

—না হয় জিপটা আসতে একটু দেরিই করেছিল। অবশ্য জঙ্গলটা বেশ ঘন।

গুম গুম শব্দে দরজায় ধাক্কা পড়ছে। পরভিন ছিটকিনি খুলল। অঞ্জন আর শুভ।

—হাই বেবিজ ! গেট রেডি ফর দা ক্যাম্পফায়ার।

—তোরা পেয়েছিস ?

—শুভ অপদার্থ নয়। শুভ কোন কাজে ফেল করে না। তবে যে টেস্ট করবে তাকেই নাচতে হবে। আগে খেয়ে নিই চল, তারপর নীচের মাঠটায় গিয়ে...

ভালই ফেয়ারওয়েল ডিনারের বন্দোবস্ত করেছেন টি. এম। ফ্রায়েড রাইস, চিকেন দোপেঁয়াজা, কাস্টার্ড।

রুমে যাওয়ার আগে টি. এম আরেকবার বলে গেলেন,

—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো কিন্তু সকলে। কাল সকাল সাতটায় বাস।

AMARBOI.COM

আকাশ আজ তারায় তারায় ঝকঝক। আজকালের মধ্যেই বোধহয় পূর্ণিমা। ফিনফিনে মসলিনের মতো চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে গেছে সকলের গায়ে, মুখে। উগ্র অথচ মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল বৃষ্টির। কি ফুল এটা ! বুক ভরে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল। জঙ্গলে গাছেদের মাথায় রুপোলি সরের মতো জ্যোৎস্নার ঢেউ। সব দুঃখ ছাপিয়ে একটা ভাল লাগা। একটা অসম্ভব ভাল লাগা। সমস্ত পার্থিব অস্তিত্ব যেন তুচ্ছ হয়ে যায় এই ভাল লাগার কাছে। এই মুহূর্তেই যদি মৃত্যু হত বৃষ্টির !

শুকনো ডালপালার আগুন ঘিরে এগারোটা নিষ্পাপ আত্মার মতো সকলে বসে। গোল হয়ে। মুখে তাদের কেঁপে কেঁপে উঠছে অগ্নিশিখা। পরভিনের মাথা রণজয়ের কাঁধে।

বিক্রম ওয়াটার বটল এগিয়ে দিল পরভিনকে,

—এক চুমুক। বেশি নয়।

বেশ কিছুটা গলায় ঢেলে ফেলল পরভিন। দু হাতে রণজয়কে জড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরল।

বৃষ্টি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে প্লাস্টিকের বোতল। ঢক ঢক করে অনেকটা গিলে নিল। একটা তীব্র কষা স্বাদ। মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ।

আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঘরটা। তালা বন্ধ। ভেতরে দুটো রাগী জন্তু রোঁয়া ফুলিয়ে ঝগড়া করছে। থাবা খুলে নখ বার হয়ে এল। ক্ষতবিক্ষত করছে বৃষ্টিকে।

বোতল হাত ঘুরে শুভর কাছে। এক হেঁচকায় কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। ঢেলেই চলেছে গলায়। শুভ বাধা দেবার আগেই।

—কি হচ্ছে কি ? একাই সবটা মেরে দিবি নাকি ? শালা কালেকশনে কেউ যাবে না... কারুর মুরোদ নেই...

অঞ্জন উঠে বোতলটা নিয়ে নিল।

দেবাদিত্য আর অঞ্জন একসঙ্গে ড্যানি হুইটেন ধরেছে—

—আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইট...

আই ডোন্ট... আই ডোন্ট... আই ডোন্ট...

রণজয় পরভিনকে হাত ধরে টেনে তুলল। সঙ্গে মীনাক্ষি তৃষিতা। বিটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঁচজন নাচতে শুরু করেছে। মীনাক্ষি বা তৃষিতা মহুয়া না খেলেও নাচে কম উৎসাহী নয়।

আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিল সুদেষ্ণা আর বৃষ্টি। গানের তালে তালে ক্ল্যাপ দিচ্ছে বাকি সবাই। অরিজিতও।

উঠতে গিয়ে বৃষ্টির পা টলে গেল। সুদেষ্ণার কাঁধে চাপ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনরকমে দাঁড়াতে পেরেছে। নাচবার চেষ্টা করছে। শিথিল পা বেসামাল বার বার। তবুও আগুন ঘিরে টলমল পায়ে নেচে চলার চেষ্টা।

অঞ্জনের হাত থেকে আবার বোতলটা টেনে নিল।

—দে না শালা আরেকটু।

—তুই আউট হয়ে গেছিস মাইরি। হল্লা শুরু করেছিস। স্যারের ঘুম ভেঙে গেলে...

—হ্যাঙ ইওর স্যার। গুলি করে মেরে দেব সব্বাইকে।

আদিম মানবীর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বৃষ্টির চুল। কাঁধের শাল ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘাসের গায়ে। ঘোর লাগা গলায় চিৎকার করছে, —আই ডোন্ট...আই ডোন্ট... আই ডোন্ট...

তৃষিতা বৃষ্টিকে জড়িয়ে ধরে বসানোর চেষ্টা করল। বৃষ্টি বদ্ধ মাতাল। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের সামনে দুটো রোঁয়া ফোলানো হিংস্র জন্তুর মুখ। জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারল জন্তুদুটোর মুখে। স্খলিত গলায় শাসিয়ে উঠল,

:—দেখে নেব। দেখে নেব তোমাদের। কত ধানে কত চাল... শুধু নিজেদের ফুর্তি লোটা... !

এর পরই পড়ে গেছে মাথা ঘুরে। সুখ-স্মৃতিহীন মাতালের ঘুমে ডুবে গেছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

॥ ৭ ॥

ডিসেম্বর শেষ হয়ে এল। অতিথি শিল্পীর ভূমিকায় শীত এখন কলকাতায় তার স্বল্পকালীন দাপট দেখাচ্ছে। কদিন ধরেই থার্মোমিটারের পারদ দশ-এগারোয়। দিল্লি-টিল্লিতে তো রীতিমত থরহরিকম্প অবস্থা। রোজই টেম্পারেচার পাঁচ ছয়। আপার ইন্ডিয়া জুড়ে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। কাগজ খুললেই রোজ ঠাণ্ডায় দু-একজনের মারা যাওয়ার খবর। ফরিদাবাদ থেকে ফিরে সুবীর আবার ফরিদাবাদ গেছে। এতদিনে চলে আসার কথা। ফিরেছে কি ?

ওয়াড্রোব খুলে বৃষ্টি মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। জন্মদিনের পর থেকে বাবার ট্যুরের পরিমাণ যেন বেড়ে গেছে। শেষবার ফিরে একবারই মাত্র বৃষ্টিকে ফোন করেছিল। আগে কত ঘন ঘন ফোন আসত।

হ্যাঙার থেকে কাশ্মিরী শালটা বার করে বৃষ্টি শুঁকল একবার। এখনও ইউক্যালিপটাসের গন্ধ লেগে আছে। এত মোটা শাল দরকার নেই, কলকাতার শীতে কাচ বসানো গুজরাটি চাদরটাই যথেষ্ট। এ বাড়ির সকলে বেশ শীতকাতুরে হলেও বৃষ্টির শীতবোধ একটু কম। ডিসেম্বর পড়তে না পড়তেই এ বাড়িতে লেপ-কম্বল সব বেরিয়ে পড়ে। সারা দুপুর ধরে গা গরম করতে থাকে ছাদে। বিকেল না হতেই সেঁধিয়ে যায় যার যার বিছানায়। বৃষ্টিরই শুধু পাতলা কম্বলে রাত কেটে যায় ; লেপ লাগে না। এই লেপ গায়ে দেওয়া নিয়ে কী যুদ্ধই না হত বৃষ্টির দিদার সঙ্গে। বৃষ্টি কিছুতেই লেপ নেবে না ; মৃণ্ময়ী দেবেনই। যেই না রাত্রে ঘুম এসেছে ওমনি লেপ উঠিয়ে দিয়েছেন নাতনির গায়ে। বৃষ্টিও সেয়ানা কম নয়, ঝট করে সরিয়ে দিয়েছে।

—ওরকম করে না সোনা, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—আমার শীত করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না করুক। তবু গায়ে থাক। কদিন আগে জ্বর থেকে উঠেছ মনে নেই?

—সে তো দু মাস আগে। আমার গা কুটকুট করছে।

—করুক।

—আমি কিছুতেই লেপ গায়ে দেব না। বৃষ্টি ঘাড় বেঁকিয়ে উঠে বসেছে।

—আচ্ছা জেদি মেয়ে তো! ডাকব মাকে?

—ডাকো। মা আমার কলা করবে।

বৃষ্টি ভালভাবেই জানত যতই অবাধ্য হোক দিদা সত্যি সত্যি মাকে ডাকবে না কখনই। কত অত্যাচার যে করেছে এক সময় দাদু দিদার ওপর। রাতদুপুর অবধি জাগিয়ে রাখা, খাওয়া নিয়ে বায়না, স্নান নিয়ে বায়না...। যতদিন ছিল দুজনেই চোখে হারাত বৃষ্টিকে। কেন যে পুট-পুট করে অত তাড়াতাড়ি মরে গেল দুজনে! বৃষ্টিকে বেশি ভালবাসত বলেই কি? প্রিয়তোষ মারা যাওয়ার সময় বৃষ্টি মাত্র দশ, মৃণ্ময়ীর সময়ে বারো।

দুটো বৃষ্টি একরাশ জামাকাপড় টেনে নামাল ওয়াড্রোব থেকে। দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। মাঝে মাঝেই ভাবে সিগারেট খাওয়ার সময় আর দরজা বন্ধ করবে না। তবুও কেন যে করে! কাজটা অনুচিত মনে করে বলেই কি! নাকি শুধুই প্রচলিত সংস্কার মেশা কুণ্ঠা!

দুটো সুখটান দিয়ে সিগারেটটা জানলার বাইরে ফেলে দিল বৃষ্টি। ফ্লেয়ারকাট সালোয়ার-কামিজ হাতে তুলেও ছুড়ে দিল বিছানায়। উঁহু, এটা নয়। জিনসের প্যান্টের সঙ্গে লাল পাতলা পাঞ্জাবিটা পরবে আজ। মা একদম পাঞ্জাবিটাকে সহ্য করতে পারে না। প্রথম যেদিন পরেছিল সেদিন কী উষ্মা!

—ছিঃ, এটা কি পরেছিস?

—কেন? খারাপ কিসের?

—খারাপ না? গা দেখা যাচ্ছে। তোর অস্বস্তি হয় না?

—এরকম তো আজকাল সবাই পরে। সেদিন বুলবুলদিও তো এই টাইপের একটা পরে এসেছিল।

—পরুক। তুমি পরবে না। যথেষ্ট অশালীন লাগে দেখতে। আর কোনদিন যেন না দেখি...

বৃষ্টি আজ এটাই পরবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গলিয়ে নিল লাল পাঞ্জাবি। জিনসের প্যান্টের বোতাম আটকাল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বেঁধে নিল চুড়ো করে। ন্যাচারাল শাইন লিপস্টিক লাগাল ঠোঁটে, চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাল্কা আই লাইনার। এমন ভাবে, যাতে আছে, আবার নেইও।

ফোন বেজে উঠল। বৃষ্টি বেরোতে গিয়েও বেরোল না। মা আজ বাড়িতে আছে। একটু আগে দুজন ছাত্র এসেছিল। ছাত্রদের অ্যানুয়াল এগজিবিশন নিয়ে আলোচনা চলছিল জোর। তারা না যেতেই বাসুদেবন। লোকটা কোন্ আর্ট গ্যালারির মালিক যেন ? ভেনাস ? চিত্রদীপ ? না জুপিটার ? বৃষ্টি নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

—বৃষ্টি, তোমার ফোন।

বৃষ্টি দরজা খুলে বাইরে এল। এখন আবার কার ফোন ! বাবা !

ড্রয়িংরুমে ফেরার আগে জয়া দাঁড়িয়েছে,

—উঠে এসে ফোনটা তো একটু ধরতে পারিস। দেখছিস আমি একটা দরকারি কথা বলছি।

হুঁহ্। ভারী তো কাজ। হয় কৃষ্ণ সিরিজ, নয় রাধা সিরিজ। লোকটা তো এসেছে ওই জন্যই। বৃষ্টি দেওয়ালের দিকে মুখ করে রিসিভার তুলল। লাল পাঞ্জাবিটাকে দেখিয়ে। শরীরের ভাঁজগুলোকে প্রকট করে।

—কি ব্যাপার অরিজিৎ ! তুই ! হঠাৎ !

—খুব আরজেন্ট দরকার রে।

—বল্।

—তোর মামার কাছে ফার্স্ট এইডের ওপর একটা ভাল বই আছে বলছিলি না ?

—বলেছিলাম নাকি ? সো ?

—বইটা একবার দিবি আমাকে ? এই ধর্ দিন দশেকের জন্য ?

—মামা অদ্দিনের জন্য বোধহয় দেবে না। ম্যাক্সিমাম দিন তিন-চার।

—তাই দিস। যেদিন কলেজ খুলবে সেদিনই আনিস প্লিজ।

অরিজিৎ ফিরে গেছে তার পুরনো জগতে। নেতারহাটের দুঃখী ছেলেটা নেতারহাটেই রয়ে গেল। সেই শাল-মহুয়ার জঙ্গলে। পাইন বনে।

কী সুন্দর একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল অরিজিৎ। বৃষ্টি কবিতাটার মানে বুঝতে পারেনি কিন্তু শব্দগুলো এখনও লেগে আছে কানে। মানে বুঝবে কি করে ? কবিতা পড়ার অভ্যাসই তার তৈরি হয়নি কোনদিন। হৃদয়ের কোমল তারগুলো বাজতেই চায় না। রঙ-তুলির মতো তারাও নির্বাসিত।

বৃষ্টি ড্রয়িংরুমের দিকে তাকাল। মা কি তার ড্রেসটা লক্ষ করেছে ? না করলেও করাতে হবে। ড্রয়িংরুমের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। মা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসুদেবনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেন্টার টেবিল থেকে ম্যাগাজিনগুলো তুলে ঘাঁটতে লাগল, যেন কোন এক বিশেষ পত্রিকা এখ্খুনি তার দরকার। লাল মলাটের একটা পুরনো 'ভোগ্' তুলে নিল হাতে। পাতা ওল্টাচ্ছে। এই বয়সের ইন্দ্রিয় সিগনাল পাঠাচ্ছে, দেখছে, দেখছে। বাসুদেবন তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে।

জয়া বিরক্ত মুখে বাসুদেবনকে বলে উঠল, —ঠিক আছে। নেক্সট উইকের শেষাশেষি খোঁজ নিয়ে যাবেন, যদি শেষ করতে পারি তো....

—প্লিজ ম্যাডাম, যে কটা কমপ্লিট হয়েছে সেগুলোই যদি....

—অদ্ভুত কথা বলছেন ! হাফফিনিশড্ ছবি....

—আপনার মতো আর্টিস্টদের হাফফিনিশড্ কাজও ভ্যালুয়েবল। আপনার লাস্ট গণেশ সিরিজটা...

ম্যাগাজিনটা নিয়ে বেরিয়ে এল বৃষ্টি। বাসুদেবনের কি এক্সপ্রেশান ! এক চোখে গিলছে তাকে, অন্য চোখে রাধা সিরিজের আব্দার। যাক্, বৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। মার গলায় বেশ ঝাঁঝ ছিল।

পেন্সিল হিল্ পায়ে গলিয়ে বেরোনোর আগে বৃষ্টি বাবলুর দরজার সামনে দাঁড়াল একটু। ভালমামা নিবিষ্ট মনে ক্রসওয়ার্ড পাজল করছে। ঠিক খুঁজে খুঁজে শক্ত শব্দগুলোকে বার করে ফেলে। বৃষ্টি দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছে। বেশ খটোমটো। তবে সময় কাটানোর পক্ষে আইডিয়াল।

বাবলু এখন এত তদ্গত যে বৃষ্টির দাঁড়িয়ে থাকা খেয়ালও করল না। বৃষ্টি একবার ভাবল ডেকে বিসমার্কের বইটার কথা বলে ; পরমুহূর্তে ভাবল থাক, এ সব সময় ডাকলে ভালমামা ভীষণ রেগে যায়।

রাস্তায় নামতেই বৃষ্টির মনটা খুব ভাল হয়ে গেল। চমৎকার এক ঝকঝকে দিন ফুটে আছে বাইরে। শীতের রোদের রঙ এত নরম, এত সোনালি হয় ! এরকম দিনে মনখারাপ করে থাকাই যায় না। যে কোন ঘ্যানঘেনে ভিখিরিকেও পয়সা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে টুকুনরা। বাড়ির কাছে এমন একটা পার্ক থাকলে তার রেলিঙে আড্ডা মারার প্রশস্ত জায়গা। তার সঙ্গে শীতের রোদটুকু তো উপরি পাওনা।

—কিরে ? খুব মাঞ্জা দিয়ে ? চললি কোথায় ?

পিকলুর ডাক শুনে বৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোটবেলায় টুকুন রনি পিকলুদের সঙ্গে খেলা করত পার্কে। লায়লি মামণিরাও সঙ্গে থাকত। লায়লিরা কবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেহালায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে চলে গেছে। মামণির সঙ্গে দেখা হলে কিরে কেমন আছিস সম্পর্ক। শৈশবের বন্ধুরা আর কজন টিকে থাকে শেষ পর্যন্ত ? টুকুন পিকলুদের সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক অবশ্য ততটা ভাঙা নয়, মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে, আড্ডা মারে সময় পেলে। ব্যস্, ওই পর্যন্তই।

বৃষ্টি দেখল রনিদের সঙ্গে ওই ছেলেটাও দাঁড়িয়ে। সাদা টি-শার্ট পরা, ট্রাউজারসও সাদা। কলকাতার কপিলদেব। চার্লি চ্যাপলিনের মতো আটকে গিয়েছিল ট্রেনের দরজায়।

রাস্তা পেরিয়ে পার্কের ধারে গেল বৃষ্টি,

—খুব মেয়েদের আওয়াজ দিচ্ছিস আজকাল ?

—আওয়াজ খাওয়ারই তো ড্রেস !

—আমাকেই দিচ্ছিস ? নাকি যে যায় তাকেই... ?

টুকুন চুপ থাকতে পারল না, —তুই প্রেমনগর দেখেছিস বৃষ্টি ? ইয়ে লাল রঙ কব মুঝে ছোড়েগা...

—এক ঘুসি মারব। পাঞ্জাবিটা কত দিয়ে কিনেছি জানিস ?

—আমাদের ভাই জাহাজের খবরে কি দরকার। খাই দাই। খেলি টেলি। আর তোদের দেখলে একটু আওয়াজ দিই। আর কি চাই ?

বৃষ্টি লক্ষ করল কপিলদেব মিটিমিটি হাসছে। সরাসরি তাকাচ্ছে না। আড়চোখে তাকে দেখে সেই অন্যমনস্কতার ভান। সুধামাসি সেদিন বলছিল ছেলেটার বাবা নাকি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। ওরা, মা আর ছেলে, নাকি আলাদা আলাদা থাকে সব সময়। মা-তো কারুর সঙ্গেই মেশে না।

ছেলেটাকে আড়াল করে চোখের ইশারায় রনিকে জিজ্ঞাসা করল, কে রে ছেলেটা ?

—চিনিস না ? বুবলু। সায়নদীপ ব্যানার্জি। জেম অফ আ বয়। স্টারস স্পোর্টিং-এর ওপেনার। রনি বেশ জোরেই বলে উঠেছে, —অলরেডি লিগে এবার তিনটে সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। বস্ এবার ঠিক বেঙ্গল খেলবে। গত বছর আন্ডার টোয়েন্টিটুতে যা খেলেছে না.... সায়ন, একে চিনিস ? বৃষ্টি রায়। ...এই তোর ভাল নামটা কি যেন ? খঞ্জনী না কি একটা নাম আছে না ?

—শিঞ্জিনী। বৃষ্টি ছেলেটার দিকে সরাসরি তাকাল, —তবে আমি বৃষ্টি। টিপটিপ করে নয়। মুষলধারে পড়া।

স্কুল পর্যন্ত বৃষ্টির শিঞ্জিনী নামটা খুব চলেছিল। তারপর মেয়েদের কৈশোর যেভাবে হারিয়ে যায়, সেভাবে কবে যে দুম করে হারিয়ে গেল নামটা ! নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলাতেই নামটা এখন কেমন অচেনা লাগে। তবু নামটা তো আছেই। কাগজে কলমে, সার্টিফিকেটে, মার্কশিটে। অনেকটা তার বাবা মা'র পরিচয়ের মতো। শিঞ্জিনী রায় ডটার অফ সুবীর রায় অ্যান্ড জয়া রায়....

বৃষ্টির মজা লাগছে ছেলেটাকে দেখতে। কি বিটকেলভাবে সেদিন দৌড়চ্ছিল সকালে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,

—কাঁধে কিটসব্যাগ নিয়ে দৌড়ও কেন তুমি ? মাঠে রাখলে চুরি যাবে সেই ভয়ে ?

সায়নদীপ মুহূর্তের জন্য থতমত।

—না মানে ওটা এক টাইপের ওয়েটট্রেনিং। ওতে দু কাঁধের জোর বাড়ে। এনডিওরেন্স্ বাড়ে। রজার ব্যানিস্টার বলেন যতটা শরীরের ক্ষমতা আছে সেটাকে পুরো স্ট্রেচ করার পর আরও পরিশ্রম করলেই এনডিওরেন্স বাড়ানো সম্ভব।

বাহ্। স্মার্টলি জ্ঞান দিচ্ছে তো। যতটা ক্যাবলা ভেবেছিল ততটা তো নয়!

—তোমাদের ক্লাবে জিম্ন্যাশিয়াম নেই ? বৃষ্টি ওজন তোলার ভঙ্গি করল— বারবেল তুলতে পারো না ?

রনি বলে উঠল, —ফাজলামি হচ্ছে ? কলকাতার কটা ক্রিকেট ক্লাবে জিম্ আছে রে ?

—না, আমাদের ক্লাবে জিম নেই। তবে আমি একটা জিমে ভর্তি হয়েছি। আমাদের কোচ বলেন ...

ও বাবা, এ যে কথায় কথায় কোটেশন দেয় দেখি! বৃষ্টি মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে সায়নদীপকে, —আর কে কে তোমাকে কি বলে ভাই ? পার্কে ব্যায়াম করার সময় ছাদে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতে কে বলেছে তোমায় ? গাভাস্কার ? না বয়কট ? ওতে কি আইসাইট্ ভাল হয় ? বলের সুয়িং দেখে খেলতে সুবিধে হয় ?

এতক্ষণে সায়নদীপ লজ্জা পেয়েছে। লাজুক মুখে হাসছে। হাসিটা শিশুর মত সরল।

টুকুন সায়নকে বাঁচানোর জন্য কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, —আমাদের কথাও কিছু জিজ্ঞেস কর্। রনি কি দারুণ ফিল্ডিং করছে সে খবর রাখিস্ ?

রনির বাড়ির সামনে সেদিনের জটলাটা মনে পড়ে গেল বৃষ্টির। মুখে বলল, —হ্যাঁ, ওকে সেদিন দেখলাম বটে। রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে ফিল্ডিং করতে করতে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হ্যাহ। তুই কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস্ ? রনি হাঁ হাঁ করে উঠেছে।

—ঠিকই তো। তুই তো আজকাল প্রায়ই বিকেলে হাওয়া হয়ে যাস্। টুকুন চোখ ঘোরাল, —ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ শুরু ?

—তোরাও যেমন। বৃষ্টি নাচাচ্ছে ; তোরাও নাচছিস্।

—তাই ? বৃষ্টি ভুরু ওঠাল, —মেয়েটার নাম সীমা আবন্তি। লেকমার্কেটে থাকে। মেয়েটার বায়োডাটা বলব ? আরও কিছু ?

—যাও না বস্, যেখানে যাচ্ছিলে যাও। রনি গজগজ করছে, —একটু কাঠি না করলে কি সুখ হচ্ছিল না ?

বৃষ্টি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বার করল। নাহ্, রনিকে আর বিপদে ফেলে লাভ নেই। চুল ঝাঁকাল,

—চলি রে, এরপর দাঁড়ালে হয়ত টুকুন পিকলুও আমাকে ভাগাতে চাইবে। সব সময় মনে রাখবি আমার নাম বৃষ্টি। বৃষ্টি কভার্স এ লট্ অফ্ গ্রাউন্ড। বৃষ্টির লক্ষ চোখ থাকে।

—চোখ কি শুধু বৃষ্টিরই থাকে ? আমাদের থাকে না ? এই ধরো তুমি গত সোমবার নিউএম্পায়ার, বুধবার লাইটহাউস আর বৃহস্পতিবার গ্লোবে ইভনিং শো-এ সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে।

সায়নের কথার আকস্মিকতায় বৃষ্টি হতবাক। গোয়েন্দা নাকি রে বাবা ?

সায়ন নির্বিকারভাবে বলে চলেছে, —সোমবার তোমার সঙ্গে ছিল দুটো ছেলে একটা মেয়ে, একটা ছেলে লম্বাচওড়া, আরেকটা ছোটখাটো উইক চেহারা, বুধবার ওই লম্বা ছেলেটা সঙ্গে ছিল, বৃহস্পতিবার ....

—ব্যস্, ব্যস্, হয়েছে। এবার থামো।

বৃষ্টি হাত উঁচু করল। মনে বেশ ধন্দ লেগেছে। প্রেমে টেমে পড়েছে নাকি ! ছেলেটার একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল,

—ছিঃ। ওভাবে মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরতে নেই। তুমি না ভাল ছেলে ?

তৃষিতাদের বাড়িতে এর আগে একবারই এসেছে বৃষ্টি। বাড়িটা বেশ পুরনো। তৃষিতার ঠাকুর্দা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একতলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন। বোমা পড়ার ভয়ে কলকাতায় বাড়িভাড়া তখন দারুণ সস্তা। বাড়িটার সামনে বড় লোহার গেট। একপাশে পাথরের ফলকে লেখা— গ্রেস গ্রোভ্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট খুলে ঢুকতেই প্রথমে ছোট্ট গাড়িবারান্দা। লাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আরেকটা বারান্দা পেরিয়ে পর পর ঘর। হাইরাইজের আমলে এরকম চেহারার বাড়ি কমে যাচ্ছে কলকাতায়।

গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি ডাকল, —তৃষিতা।

রোগা মতন এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বোধহয় তৃষিতার বাবা।

—এসো এসো। তুমি বৃষ্টি ?

বৃষ্টি আগেরবার এসে তৃষিতার বাবাকে দেখেনি।

—সবাই এসে গেছে ?

—সব্বাই। এসেই খালি বৃষ্টির খোঁজ। এই শীতেও।

কিছু কিছু লোকের কণ্ঠস্বরে এত স্নেহ মাখানো থাকে ! স্নেহের জাদু সহজেই বশ করে ফেলতে পারে অন্যকে। বৃষ্টি ঝপ করে একটা প্রণাম ঠুকে ফেলল। এমনিতে সহজে সে কারুর পায়ে হাত দেয় না।

—থাক থাক। সোজা এঘর দিয়ে বাঁদিকে চলে যাও।

খাটে পা মুড়ে বয়স চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে সবাই। চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো এক রাশ ছবি। নেতারহাটের।

বৃষ্টিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল ছবিগুলো।

—সেই ছবিটা তো দেখছি না ? সেই ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট ? হানিমুন কাপ্‌ল্ ?

—ওটা বিক্রম নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। কাউকে দেবে না।

সুদেষ্ণা বলল, —বিক্রমটা বেশ পারভার্ট আছে। একা একা দেখবে আর রেলিশ করবে।

শুভ বলল,—ছাড় তো বিক্রমের কথা। সিনেমার পর আজ বসা হচ্ছে, কি হচ্ছে না ? বলতে বলতে তৃষিতের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল,—ভাল ছেলে মেয়েরা না হয় ফিরে আসবে। কিরে পরভিন, আজ একটু জিন্ হবে নাকি ? কিচ্ছু টের পাবে না বাড়িতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দুটো এলাচ মুখে দিয়ে নিলেই ব্যস। বৃষ্টি পরভিনকে সাহস দিতে চাইল।

তৃষিতা বৃষ্টির মুখে আঙুল রেখেছে,—এই আস্তে। বাবা পাশের ঘরেই আছে।

তৃষিতার চুপ করানোর চেষ্টা দেখে পরভিন হেসে উঠল। তার মধ্যে আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব এসেছে।

সুদেষ্ণা বলে উঠল,—আমি কিন্তু আজ থাকছি না।

—কেন ?

—একটা পার্টি আছে সন্ধেবেলা। মা'র। যেতেই হবে সঙ্গে।

বৃষ্টি আর পরভিন চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। সুদেষ্ণার সব সময় বড় বড় ব্যাপার। স্যাটারডে ক্লাব, লেক ক্লাব, তাজবেঙ্গল।

—তোর গাড়ি দুটো নাগাদ আসবে না ? আমাদের একটু এস্‌প্ল্যানেডে ছেড়ে দিস্।

তৃষিতার বাবা ঘরে ঢুকলেন,—তোমরা কি এবার খেতে বসবে ?

দেবাদিত্যর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

তৃষিতা বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ চল্, বসে পড়ি। দেবাদিত্য তো সেই দশটার সময় এসেছে। ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে এতক্ষণে।

দেবাদিত্য লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল,—না, না, আমার খিদে পায়নি। বেরোনোর সময় কাকিমা যা এক কাপ চা খাইয়েছে ওতেই চার পাঁচ ঘন্টার জন্য নিশ্চিন্ত। সঙ্গে পাঁউরুটির চুয়িংগাম।

তৃষিতার বাবা বললেন,—তাহলে আমি খাবার দাবার রেডি করে ডাকি তোমাদের ?

তৃষিতার বাবা চলে যেতেই দেবাদিত্য বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে।

—খাওয়ার আগে তৃষিতার নেমন্তন্নর অনারে আমি একটা দুরন্ত নিউজ দিতে পারি।

—কি রে ?

—মীনাক্ষি লটঘট চালাচ্ছে। বহুত পুরনো।

—যাহ্। হতেই পারে না।

—হতে পারে না কিন্তু হয়েছে। বচপন্ কা মোহব্বত্। আশিক ক্ষুর চালায়।

—মানে ?

—পাড়ার দাদা। বড়দা নয়, মেজদা ফেজদা টাইপ্।

—কি করে হয় ! মীনাক্ষি তো একেবারে অন্যরকম। সফ্‌ট। টেন্ডার নার্ভাস। বাবা মার খুব বাধ্য। ওর বাবা মা জানে ?

—জানে তো বটেই। মেয়ে মোহব্বত করবে ; বাপ মা টের পাবে না ? গায়ের গন্ধে টের পাবে। এই নিয়েই তো ওদের বাড়িতে হেভি ঝামেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে। পরশু ওর বাবা খেপে গিয়ে ছেলেটাকে রাস্তায় ধরে কি সব তড়পেছে, পুলিশ ফুলিসের ভয় দেখিয়েছে, ওমনি রাত্রেই হিরোর চামচারা এসে কষে রগড়ে দিয়ে গেছে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে। ওই ইকনমিকসের মোটা পার্থ, ও তো ওদের পাশের পাড়ায় থাকে, ওদের বাড়ির সামনে গণ্ডগোল দেখে গেছিল...

বৃষ্টি বলল,—আমি বিশ্বাস করি না।

—আমিও। সুদেষ্ণা বলল,—বড় গুল মারিস তুই। তোর মত মিথ্যেবাদী...

দেবাদিত্যর মুখে আহত ভাব। সুদেষ্ণা সুযোগ পেলেই যা তা ভাষায় কথা বলে তার সঙ্গে।

দেবাদিত্য উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তৃষিতা হাতের ইশারায় থামাল। তার মা এবার খেতে ডাকতে এসেছেন।

একটা বেশ বড়সড় ঢাকা বারান্দায় পুরনো আমলের শ্বেতপাথরের খাবার টেবিল। খেতে বসে সকলে মিলে পেছনে লেগেছে দেবাদিত্যের।

—মাসিমা, দেবাদিত্যকে রুই মাছ এক পিস্ বেশি দেবেন।

—এই তৃষিতা, আরেকটা ফ্রাই দে দেবাদিত্যকে।

—নে না, লজ্জা পাচ্ছিস কেন ? আরেকটু ফ্রায়েড রাইস নে।

—মেসোমশাই, দেবাদিত্য আরেক পিস মুরগির ঠ্যাং নেবে।

দেবাদিত্য ঠাট্টাগুলো গায়ে না মাখার চেষ্টা করল। অনেকদিন পর তার বেশ ভালমত খাওয়া জুটেছে দুপুরে।

তৃষিতার মা বললেন,—তোমরা সবাই মিলে ওর পেছনে লেগেছ কেন ? কি এমন খায় বেচারা ? ওইটুকু তো ঘিভাত নিয়েছে। বলতে বলতে হাসছেন,—খায় হচ্ছে তোমাদের তৃষিতার বাবা। ছটা বাটি নিয়ে, সাজিয়ে...বসে...

তৃষিতা বলে উঠল,—সত্যি, জানিস মার বৌভাতের দিন কি হয়েছিল ? ওই যে সব বরের পাতে খাওয়ার নিয়ম ফিয়ম আছে না... বাবা খাওয়ার পর মা যখন বসেছে তখন পাত একেবারে আয়নার মত চকচকে।

তৃষিতার বাবা-মা'র কান বাঁচিয়ে শুভ ফিসফিস করল,

—তুই সামনের টেবিলে বসেছিলি বুঝি ?

তৃষিতা বাঁ হাতে একটা চাপড় মারল শুভকে। তৃষিতার বাবা বলে উঠলেন,—ওই একদিন। একদিনই আমার জুটেছিল। তারপর থেকে কে খায়, কে খায় না সেটা তোমরা তোমাদের মাসিমার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে।

তৃষিতার মা তাঁর ভারী চেহারা নিয়ে একটু লজ্জায় পড়লেন যেন,—আর তুমি যে আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে বিকেলবেলা ঘন্টার পর ঘন্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে থাকতে ? কিসের জন্য ?

—তোমার জন্যে ।

—বাজে বোকো না । বাবা কখন ফিরে আলুর চপ বেগুনি আনতে দেবে তার জন্যে । তোমরা বিশ্বাস করবে না, রোজ সাত আটটা করে বেগুনি, সাত আটটা করে আলুর চপ খেত । তারপরও মাকে বলত, মিষ্টি ফিষ্টি কিছু নেই ? নোন্‌তা খেয়ে মুখ কেমন করছে ।

—ওই তো মেয়েদের দোষ । কথার অর্থও বোঝো না । তখন তো মিষ্টি ছিলে তুমি, নোনতা ছিল তোমার বাবা । কী ঝাল ! তবে বেশ সুস্বাদু । আমার হজম হয়ে গেছে । এখন অবশ্য তোমারও সেই মিষ্টত্ব আর নেই । তবু ....

তৃষিতা হাসছে—আমার বাবা মা'র রোমান্স শান্তিনিকেতনের খুব ফেমাস ঘটনা । কি বলব নাকি মা ? ...

একটা অসম্ভব সুন্দর সুখী পরিবারের দৃশ্য । এই দৃশ্যগুলো বৃষ্টি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না । এই সব দৃশ্য দেখার আশঙ্কাতেই ছোট থেকে কোন বন্ধুর বাড়ি সহজে যেতে চাইত না সে । আজ কেন যে এল ?

তৃষিতার মা পাশে এসে দাঁড়ালেন,—এই মেয়ে, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না দেখছি ?

তৃষিতার মা'র মুখে কী সুন্দর মা মা ভাব । বৃষ্টির চোখে জল এসে গেল ।

তৃষিতার বাবা বললেন, —তোমরা, আজকালকার মেয়েরা, কি বলো তো ? বন্ধুদের সঙ্গে দিন রাত টো টো করছ, এখানে ছুটছ, সেখানে ছুটছ কিন্তু খাওয়ার বেলায় ....সব ডায়েটিং চলছে !

এভাবে কি কোনদিন বৃষ্টি বন্ধুদের ডাকতে পেরেছে বাড়িতে ? পারবে কি ? এভাবে মা দাঁড়িয়ে আদর করে খাওয়াবে সবাইকে ! বাবা দেখাশোনা করবে !

ধীরে ধীরে অন্য বৃষ্টিটা দখল নিচ্ছে মস্তিষ্কের । শরীরের কোষে কোষে জমে থাকা তীব্র অভিমান হিংস্র রাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শিরায় উপশিরায় । এই সময় বৃষ্টি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । অনেক কষ্টে সামলে রাখার চেষ্টা করল নিজেকে ।

ঘরে ফিরে খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছে সবাই ।

তৃষিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে ।

সুদেষ্ণা একটা বালিশ টেনে গড়িয়ে পড়ল, —মাসিমা মেসোমশাই দারুণ । কী জলি দুজনেই ।

তৃষিতা দাঁত দিয়ে হেয়ার ক্লিপ্ আলগা করল, —দু জনে একসঙ্গে মুডে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলে যা ... বিশেষ করে আমার বাবা ...

বৃষ্টি হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়েছে, —আমি যাচ্ছি।

—কোথায় ? বন্ধুরা সবাই এক সঙ্গে চমকে উঠল।

—সে কৈফিয়ত কি তোদের দিতে হবে ? বৃষ্টির গলা অস্বাভাবিক রূঢ়। বন্ধুরা স্তম্ভিত।

—সিনেমা যাবি না ?

—না।

—বাহ্। নিজে সবাইকে নাচালি ; কেটে পড়বি ?

—আমার ইচ্ছে। দ্রুত পায়ে বৃষ্টি একেবারে রাস্তায়। শুভ দেবাদিত্যরা পিছন পিছন কিছুটা এসেও দাঁড়িয়ে পড়ল। এ কয়েক মাসেই তারা লক্ষ করেছে বৃষ্টি মাঝে মাঝেই কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করে। হঠাৎ যদি উচ্ছল, তো হঠাৎই রাগী, গম্ভীর, রুক্ষ। এই সময় ওকে না ঘাটানোই ভাল। নেতারহাটে যা কাণ্ড করেছিল !

রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে উদভ্রান্তের মত হেঁটে চলেছে বৃষ্টি। পেনসিল হিল পরা এক সুবেশা মেয়েকে শীতের দুপুরে ওভাবে হাঁটতে দেখে অনেকেই দেখছে ঘুরে ঘুরে। বৃষ্টির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ! কোনরকম অনুভূতিই নেই তার। দুবার হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেল। একজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল সজোরে। লোকটা কিছু বলার আগেই দেখল মেয়েটা বিশ পঁচিশ হাত দূরে চলে গেছে। ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়তে বৃষ্টির সম্বিৎ ফিরল। হাঁটতে হাঁটতে হাজরার মোড়ে চলে এসেছে। এবার কোথায় যাবে স্থির করতে পারছে না। ট্রামস্টপে গিয়েও ফিরে এল। মাথার ভেতর একটা যন্ত্রণা তাকে কুকুর-তাড়া করে চলেছে। কি করবে সে এখন ? বাড়ি ফিরে যাবে ? কখখনো না। হঠাৎই যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেছে টেলিফোন বুথের দিকে। পাগলের মত ব্যাগে একটা কয়েন খুঁজছে। একটা কয়েন। হাতে নিয়েই ডায়াল ঘোরাতে আরম্ভ করেছে। মস্তিষ্কের যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে দেবে ওপারেও। রীতা ফোন ধরেছে,—হ্যালো ! কে বৃষ্টি ! কি খবর তোমার ?

—বাবা ফিরেছে ?

—হ্যাঁ, পরশু।

—বাবাকে দাও।

—তোমার বাবার শরীরটা খুব ভাল নেই। ঘুমোচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ডাকো। বলো বৃষ্টি ডাকছে।

—তুমি কি পরে রিঙ্ করতে পারো না ? কিংবা তোমার বাবা যদি উঠে তোমায় ফোন করে ? বুকে ব্যথা হচ্ছে বলছিল ...

—তুমি ডেকে দাও। আমার এখখুনি দরকার। এখখুনি।

—ধরো। দেখছি। রীতার গলায় বিরক্তি।

বৃষ্টি দাঁতে দাঁত ঘষল। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

সুবীর রিসিভার তুলেছে। গলায় ঘুমঘুম ভাব,

—কিরে, কি বলছিস্ ?

—কি ঠিক করলে ? কবে থেকে থাকছ আমার সঙ্গে ?

—শোন্ শোন, তোকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

—আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

—লক্ষ্মী মেয়ে, এরকম করে না।

—আই জাস্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার ইয়েস অর নো ফ্রম ইউ। না বলছ ?

—উঃ, কখন না বললাম ? কি পাগলের মত ...

—ও। তাহলে আমি এখন পাগল ! তোমরাই সব সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ !

বৃষ্টি হাতের মুঠো শক্ত করল,—পাগলামি করছি ? ও কে। লেট ইট্ বি সো।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বাড়ি অবধি চলে এসেছে,বৃষ্টি নিজেও জানে না। কলিংবেল বাজাতে গিয়ে হুঁশ ফিরল। বাড়িতেই কেন ফিরল সে !

সুধা হাই তুলতে তুলতে দরজা খুলেছে। দেখেই বোঝা যায় আরামে ঘুমোচ্ছিল।

—এখন ফিরলে যে ! তোমার না সন্ধেয় ফেরার কথা !

—কেন ? বৃষ্টি খরখর করে উঠল, —আমি এলাম বলে তোমার ঘুমের ডিসটার্ব হল ?

কাঁচা ঘুম ভাঙা বিরক্তিতে সুধা বলল, —আমার আবার ডিসটাব্। হুকুমের বাঁদি ফরমাশ মত খাবার দেব, বাসন মাজব, বাজার করব, দরজা খুলব ... আমি কথা বলার কে ? তোমার মা খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেল বলে একটু যা গড়িয়েছিলাম ...

বৃষ্টি আরও রুক্ষ হল, —সরো তো। লেকচার মেরো না।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় ব্যাগ আছড়ে ফেলেছে। এখনও রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করল, আমি পাগল ? আমি পাগল ? বৃথাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানলার গরাদটাকে বাঁকানোর চেষ্টা করল কয়েকবার। ওয়াকম্যানে সজোরে লাথি মারল। সব ভেঙে দেবে। সব। দরজা খোলা রেখেই সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিষ্ফল আক্রোশে দেখছে পুরু গরাদটাকে।

—কি ব্যাপার ! তুই সিগারেট খাচ্ছিস !

বৃষ্টি চমকে তাকাল। ভালমামা হুইল চেয়ারে দরজায়।

বাবলু আবার বলল, —তুই সিগারেট ধরলি কবে থেকে !

বৃষ্টি কাঁধ ঝাঁকাল, —ধরলাম।

—তোর আস্পর্ধা তো কম নয় !

—আস্পর্ধার কি আছে ? বৃষ্টির গলা শীতল, —সিগারেট খাওয়া কি ক্রাইম নাকি ? অনেকেই খায়। আমিও খাই।

বৃষ্টির মধ্যে আর কোন লুকোছাপা নেই। বাবলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বৃষ্টি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

॥ ৮ ॥

মেয়েটাকে অনেকক্ষণ আগেই দেখতে পেয়েছিল সায়নদীপ। মেডিকেল কলেজের উল্টো ফুটপাথ ধরে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। এত অন্যমনস্ক যে আচমকা কেউ সামনে এসে পড়লে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ছে, ঠিক করতে পারছে না কোন পাশে সরে জায়গা করে দেবে সামনের পথচারীকে। দু হাত বুকের কাছে জড়ো, হালকা নীল শৌখিন শাল আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। শালের নিচ দিয়ে কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগ প্রায় কামিজের ঝুল বরাবর নেমে এসেছে, দুলছে হাঁটার তালে তালে। প্রত্যেকটি মানুষেরই হাঁটার নিজস্ব ছন্দ আছে। চরিত্রও। বৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে এইমাত্র যে মেয়েটি ভিড়ের মাঝখান দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে চলে গেল, তাকে দেখেই বোঝা যায় সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি সে কাটিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এই মেয়েটা কেমন !

মেডিকেল কলেজের সামনে এসে মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার মাঝখানে বড়সড় একটা ভিড়। ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে এক দেহাতী বউ হাউ-হাউ করে কাঁদছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় হাসপাতালের দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতে চাইছে, মাঝে মাঝে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। সন্ধের দিকে এমনিতেই এ অঞ্চলে বেজায় ভিড় থাকে। টুকটাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষ এসে গেলে আরও বেশি ভিড় জমে যায়। যেন দল বেঁধে সব চিড়িয়াখানায় মজা দেখছে। হাসপাতালই এ শহরের শ্রেষ্ঠ চিড়িয়াখানা।

মোড়ের ট্র্যাফিক পুলিশটা বেশ কয়েক মিনিট পর এগিয়ে এল,—কি হচ্ছে কি এখানে, অ্যাঁ ? রাস্তা জ্যাম করে ঝামেলা ? হল্লা করতে হয় ফুটপাথে যাও।

এক এক করে লোক সরতে শুরু করেছে। মেয়েটাও হাঁটতে শুরু করেছিল, সেই সময়েই চোখাচোখি হয়ে গেল সায়নদীপের সঙ্গে।

মাঝে মাঝেই মেয়েটাকে এখানে ওখানে চোখে পড়ে যায় সায়নদীপের। আলাপের পর দু-একবার দূর থেকে দেখে হাতও নেড়েছে। মুখে হাসির আভাস ফুটলেও কাছে যেতেই মেয়েটা বদলে গেছে। সায়নকে এগোতে দেখলেই রোদচশমার আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কোন দিন সায়ন বলেছে,

—হাই। কলেজ ?

—হুঁ।

মেয়েটা হয়ত মুখ ঘুরিয়ে বাস আসছে কি না দেখার চেষ্টা করেছে কিংবা একমনে তাকিয়ে থেকেছে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এর দিকে।

—তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করছ না ?

বৃষ্টির মুখে স্পষ্ট অসন্তোষ।

আবার কোন দিন নিজেই যেচে ডেকেছে সায়নকে,

—জাসুসের মত আমার পেছন পেছন ঘোরো কেন বলো তো ? কি মতলব তোমার ?

—মতলবের কি আছে ? খেলার পর ও-পাড়ায় আমরা দল বেঁধে সরবত খেতে যাই, তখনই তোমাকে দু-চার দিন চোখে পড়েছিল। তাই ভেবেছিলাম বলে তোমাকে চমকে দিই।

—ঢপ মেরো না। ডেফিনিটলি এ তোমার রোমিও কোচের টিপস্।

সায়ন এ সব কথায় ভারী অসহায় বোধ করে।

কখনও বা বৃষ্টি আরও কাছে এগিয়ে আসে,

—তোমার হেভি কৌতূহল না ? আমার সম্পর্কে ?

সায়ন থতমত।

—কৌতূহলী বেড়ালের কি হয়েছিল জান ?

—না তো।

—নেক্সট দিন কথা বলার আগে জেনে আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মেয়েটাই অবাক চোখে দেখছে সায়নকে ! সায়ন যেচে কথা বলবে কি না ভাবল। আজ তার মা সঙ্গে রয়েছে। যদি মেয়েটা মার সামনে উল্টোপাল্টা কিছু বলে দেয়।

বৃষ্টি নিজেই এগিয়ে এল, —তুমি এদিকেও !

সায়ন চোখের ইশারায় দেখাল, মা।

মা সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে ছোট মামিমার সঙ্গে কথা বলছে। জিজ্ঞাসা করবে না ভেবেও সায়ন প্রশ্ন করে ফেলল,

—কলেজ থেকে ?

বৃষ্টি ঘাড় নাড়ল।

—এত দেরি ! ছ'টা তো প্রায় বাজে !

—খেলা করছিলাম। ডাংগুলি। বৃষ্টি ঠোঁট টিপে হাসল। বলেই সচেতন হয়েছে,—তোমরা এখানে কেন ? হসপিটালে ?

—আজ সকালে আমার এক মামার সেরিব্রাল হয়েছে।

সায়নের মামিমা হাসপাতালের ভেতরে চলে গেলেন। করবী ছেলের দিকে এগিয়ে আসছে। বৃষ্টিকে দেখে থমকাল সামান্য।

সায়ন বলল,—মা, একে চেনো তো ? আমাদের পাড়ার বৃষ্টি। টিপ টিপ করে পড়া নয়, মুষলধারে পড়া।

করবী মৃদু হাসল,—চিনব না কেন ? দেখেছি তো ওকে। তুমি কি এত দূরে কলেজে আসো ?

—হুঁ। বৃষ্টি চকিতে ভদ্র-সভ্য, —আপনার ভাই এখন কেমন আছেন ?

—ভাই না। মামাতো দাদা। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে বলছে কিছু নাকি বোঝা যাবে না। তোর কিরকম মনে হল রে বুবলু ?

—মনে তো হল মার্জিনালি বেটার। কিছুটা ব্লিডিং হয়ে গেছে তো। তবে বাঁ দিকটা বোধহয়...

—আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড়। ভীষণ মারত আমাকে ছোটবেলায়। এখন কি অসহায় শিশুর মত অবস্থা !

করবীর স্বরে বিষণ্ণতা। সায়ন বৃষ্টি নিশ্চুপ। মিনিটখানেক পর বৃষ্টি বলল,—আমি চলি। আপনারা ব্যস্ত রয়েছেন।

—না, না, আমরাও ফিরব এখন। তুমিও তো বাড়ি ফিরছ, চলো আমাদের সঙ্গে।

সায়ন লক্ষ করল মার কথায় বৃষ্টি বেশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। দেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যায় এক্ষুনি বাড়ি ফেরার তার একটুও ইচ্ছে নেই।

—এই বুবলু একটা ট্যাক্সি দ্যাখ্ না।

সায়ন বৃষ্টিকে আড়চোখে আরেক প্রস্থ দেখে নিল,—তোমরা দাঁড়াও। আমি এমারজেন্সির সামনে থেকে ধরে আনছি।

ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে সায়ন ঘাড় ঘুরিয়ে বৃষ্টিকে প্রশ্ন করল,

—তোমার অন্য কোথাও যাওয়ার ছিল নাকি ?

—তেমন কিছু না। এক বন্ধুর বাড়ি যাব ভাবছিলাম।

—কোন্ দিকে ? পথে পড়বে ? তা হলে নামিয়ে দিতে পারি।

—না, সে অন্যদিকে। লেক গার্ডেন্সে।

—ও। সায়ন হাল্কা নিশ্বাস ছাড়ল।

—তোমার মামার সঙ্গে আলাপ হল সেদিন, বারান্দায় বসে ছিলেন, পিকলু কান্নানকে ডেকে কথা বলছিলেন, তখন।

নিমেষের আলোয় সায়নদীপ দেখল বৃষ্টির মুখে বাঁকা হাসি। যেন জানতে চাইছে ছেলেটা এবার কি এক পা এক পা করে এগোচ্ছে তার বাড়ির দিকে! হাল্কা গলায় জিজ্ঞাসা করে উঠল,

—তোমার প্র্যাকটিস কি বন্ধ এখন ? দৌড়-টৌড় চলছে না ?

সায়ন হেসে ফেলল, —কেন ? তুমি বুঝি আর ভোরবেলা ওঠো না ? আমি এখন এক দিন করে পার্কে দৌড়ই। শনিবার। তাও খেলা না থাকলে।

—ওই ব্যাগ নিয়েই ?

—না। এমনিই। ওটা সিজনের প্রথম দিক ছিল। মিড সিজনে এখন হাল্কা কিছু ব্যায়াম, প্র্যাকটিস, দৌড়ঝাঁপ ব্যস।

করবী এতক্ষণ জানলার বাইরে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পর কথা বলল,

—তোমার মা-ই তো বিখ্যাত শিল্পী জয়া রায়, না ?

—হুঁ।

—সেদিন কি একটা কাগজে তোমার মা'র ইন্টারভিউ দেখছিলাম...কী গুণী তোমার মা।

বৃষ্টি ঝট করে জানলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। সায়ন বুঝতে পারল এ আলোচনা ঠিক পছন্দ করছে না মেয়েটা। সোজা হয়ে বসল সায়ন। বৃষ্টির মায়ের মুখটা মনে পড়ল তার। সায়নের মার সঙ্গে কতই বা তফাত হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের ? নিশ্চয়ই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবেন। তবু এখনও মুখ কত মসৃণ। চকচকে। কমনীয়। সে তুলনায় তার মার মুখে অনেক বেশি ক্লান্তির ছাপ। চোখের নীচে ঘন কালি, কপালের দিকের চুল সবই প্রায় সাদা। রেয়ার ভিউ মিরারে মাকে দেখার চেষ্টা করছিল সায়ন। ঝাপসা। কি তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল মা ! মাত্র সাত বছরের মধ্যে ! বুড়িয়ে গেল ? না ফুরিয়ে গেল ? ফুরিয়েই গেল।

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের আঘাতে এভাবেই বোধহয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় কেউ কেউ। আবার অনেকে দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়েই নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। বালির ঝড়ের ভয়ে আতঙ্কিত মরুভূমির ইঁদুরের মত তারা গর্ত খুঁড়ে মাটির তলায় ঢুকে নিরাপত্তা খোঁজে না। উটের মত কষ্টসহিষ্ণু হতে শেখে। পরিশ্রমীও।

বাবার মৃত্যুর পর সায়ন তিলে তিলে নিজেকে নিজের মত করে গড়ে তুলছে। গোটা দিনটাকেই নিয়মের ছন্দে বেঁধে রাখে সে।

খুব ভোরে বিছানা ছাড়া সায়নদীপের বহুদিনের অভ্যাস। ছোটবেলায় সকালে উঠে চিৎকার করে পড়া মুখস্থ করত। তার বাবা বলত,

—ভোরবেলা মস্তিষ্ক তাজা থাকে বুবলু। গ্রহণক্ষমতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

খেলাধুলোয় নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার সময়ও সে কথা ভোলেনি সায়ন। ক্রীড়ানুশীলনেরও শ্রেষ্ঠ সময় এই সকাল। ভোর হলেই ট্র্যাকস্যুট পরে, কাঁধে কিটসব্যাগ ঝুলিয়ে ট্রামে উঠে পড়ে সে। ক্লাবে প্র্যাকটিস না থাকলে সামনের পার্কটা তো রয়েছেই।

সকালের শুরুতে ফাঁকা ট্রামে চেপে ময়দানের দিকে এগোতে ভারী ভাল লাগে সায়নদীপের। মনে হয় একটা সরীসৃপ বহন করে নিয়ে চলেছে তাকে। তারই শরীরের ফাঁকফোকর দিয়ে, আধফোটা সকালকে দেখতে দেখতে, সে পৌঁছে যায় তার তীর্থক্ষেত্রে। বিশেষ করে সিজনের কয়েকটা মাস, অক্টোবর থেকে মার্চ, বিশেষ ব্যত্যয় হয় না।

গত বছর থেকে সায়ন খুব আশা জাগিয়েছে তার কোচের মনে। ছেলেটার মধ্যে প্রচণ্ড জেদ আছে। হার না মানার জেদ। পরিশ্রমে ক্লান্ত না হওয়ার জেদ। ভাল পেডিগ্রির রেসের ঘোড়ার মত ট্রেনারের সব হুকুম নিঃশব্দে তামিল করে যায় ছেলেটা।

সায়ন তার কোচ ঝন্টুদার কথামত টেন্টে এসেই প্রথমে জগ করে। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা স্প্রিন্ট টানে। তারপর ধীরে ধীরে দৌড়য়। আবার স্প্রিন্ট টানে। তারপর কুকুরের মত জিভ বার করে কিছুক্ষণ হাঁপায়। আবার দৌড়য়। আবার দৌড়য়। আবার। রজার ব্যানিস্টারের কথা ভীষণভাবে মেনে চলে সে। নিজেই নিজেকে বলে,

শরীরের ক্ষমতাটাকে স্ট্রেচ করো। শরীর সব সইতে পারে যদি মনের সাহায্য পায়।

এই রকম খাটুনির পর প্যাড গ্লাভস চড়িয়ে এসে নেটের উইকেটের সামনে দাঁড়ায় সায়ন। দলজিৎ ছুটে আসে বল করতে। কখনও অন্তু, রবীন। সায়ন প্রত্যেকটি বল খুব মন দিয়ে খেলে। যেন নেটে আউট হওয়ার ওপরেই তার জীবন মরণ নির্ভর করছে। এই গুণের জন্য সায়নকে নেটে বল করে আরাম পায় ক্লাবের সকলে।

দলজিৎ বলে,

—তুমি সব সময় এত সিরিয়াস থাকতে পারো কি করে বলো তো? প্রত্যেকটা বল ম্যাচের মত করে খেলো?

সায়নের উত্তর বড় অদ্ভুত লাগে তাদের, —আমার কাছে প্র্যাকটিসটাই আসল ম্যাচ। এই সময় যদি পুরো কনসেনট্রেশন আনতে পারি, তা হলে ম্যাচে প্র্যাকটিসের মতই হালকা লাগবে। মনযোগের জন্য ছটফট করতে হবে না।

নেটে বল ছাড়া সত্যিই আর সায়ন কিছু দেখে না। কানের কাছে ক্রমাগত শুধু ভেসে আসা কথাগুলোই শুনতে পায়। হাত পায়ের নড়াচড়া শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে সেইমত।

...বাঁ পা-টা এগোও। একটু আড়াআড়ি। হ্যাঁ, এইভাবে। ...কোন সময়...উহু, ব্যাটটা আরও পরে আসবে। একটু পরে। না। আরও আস্তে। লেটে খেললে জোর পাবি বেশি। টাইমিংটাই আসল।

সায়ন জানে এখন তার নিজেকে গড়ার সময়। এখন শুধু শুনতে হয়। মা'র কথা, কোচের কথা, বন্ধুদের কথা, গুরুজনদের কথা। শেষ পর্যন্ত কোন কথাদের সে অন্তরে রাখবে সেটা সে ঠিক করবে। কিন্তু মন দিয়ে শোনাটা বড় জরুরি।

প্র্যাকটিস শেষ হলে পেটের মধ্যে ক্ষিদেটা চনচন করে ওঠে। সায়ন তখন তাদের লনের সামনে এসে প্যাড খুলতে খুলতে চেঁচায়,

—শম্ভুদা...

ক্যান্টিনের মালিক শম্ভু হাঁক শুনলেই কাঁচা পাঁউরুটিতে মাখন মাখাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরম্ভ করে। ক্যান্টিনের ছেলেটা এসে স্ট্যু পাঁউরুটি রেখে যায় সামনে। মোহন দলজিৎ রবীন মাঝে মাঝেই চোখ টেপে তাদের ক্লাবের ক্রিকেট সেক্রেটারি গোপালদাকে। গোপালও তাদের তালে তাল মিলিয়ে ঠাট্টা করে ওঠেন,—কি চাষাড়ে হ্যাবিট রে তোর! স্ট্যুতে কাঁচা রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাস! তুই তো নাম করে গেলে মুড়ি দিয়ে শ্যাম্পেন খাবি রে!

সায়ন হাসে। সবাই কি আর একরকম হয়! যে কোনো একটা ঘাসের মাঠের ওপর দিয়ে গেলেই তার যে মনে হয় কোনো ক্রিকেট পিচের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এ অনুভূতি কি অন্যের হয়! ভোরবেলা মা যখন ডেকে দেয় তাকে, তখন ঘুমচোখে বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে মনে হয়, সে নয়, অন্য একটা লোক আয়নায় দাঁড়িয়ে আছে, তার সাদা সোয়েটারে নীল ভি বর্ডার, মাথার ক্যাপে ন্যাশনাল এমব্লেম, এই প্লেয়ারটাকে আর কেউ দেখতে পায় কি? পরিশ্রমের পর খেয়ে-দেয়ে সায়নের শরীরটা বেশ তাজা লাগে। এরপর একে একে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় ক্লাবের সবাই। কেউ কেউ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োয়। বাড়ি গিয়ে তাদের অফিস ছুটতে হবে কিংবা কলেজ। বি. কম পাশ করার পর সায়ন আর পড়াশুনো করেনি। তার পড়াশুনোর জগৎ ভিন্ন।

খেলা না থাকলে প্র্যাকটিস থেকে ফিরে একা একাই সায়ন স্নান-খাওয়া সেরে নেয়। করবী অফিস বেরিয়ে যায় সাড়ে নটার মধ্যেই। স্বামীর মৃত্যুর পর সহানুভূতি দেখিয়ে, দয়া দেখিয়ে তাকে একটা ছোট চাকরি দিয়েছিল সরকার। কাজ থেকে ফিরতে তার সেই সন্ধে। সারা দুপুর সায়ন একা বাড়িতে বসে নিজের পড়াশুনো করে। তার বেশির ভাগ বই-ই খেলাধুলা সংক্রান্ত। প্রায় দুপুরেই ক্যাসেট চালিয়ে একই খেলা বার বার দেখে সে। গাভাস্করের কোনো বিশেষ ইনিংস, রিচার্ডস-এর কোনো চোখ ঝলসানো সেঞ্চুরি বা গ্রেগ চ্যাপেলের রাজসিক ব্যাটিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই খেলা। একই দৃশ্য। বারবার। স্লো-মোশনে। রিপ্লে করে। স্টিল করে। তাকে আরও নিখুঁত হতে হবে। এটাই তার এখনকার পড়াশুনো।

সারা দুপুর পড়াশুনো করে মস্তিষ্কে একটা ঝিমধরা ভাব আসে। মাথা ছাড়াতে সায়ন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়, পার্কে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে। এ সময়টাই তার একমাত্র অবসর। বন্ধুরা নানান তর্কে গলা ফাটায়। এখন ইরাক আমেরিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে সকলেই উত্তেজিত! যুদ্ধ বা মৃত্যুর আলোচনা সায়নকে একটুও টানে না। সে নীরবে দেখে দূরের রাস্তাঘাট, মানুষজন। চৌরাস্তার মোড়ে জীর্ণ সালোয়ার কামিজ পরা এক বুড়ি পাগলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন ধরে ট্রাফিক কনট্রোল করার চেষ্টা করে, কেউ তাকে মানে না, তবু সে নিজের মনে কাজ করে যায়, যেন কলকাতার সমস্ত অবাধ্য যানবাহনকে বশে রাখার জন্যই তার জন্ম হয়েছিল। সায়ন একদৃষ্টে পাগলিটাকে দেখে।

এসব সময়, কখনও কখনও, বৃষ্টিকেও চোখে পড়ে সায়নের। কখনও কখনই। তখন বৃষ্টির হাঁটাচলা অন্যরকম। অশান্ত। যেন চাপা উত্তেজনায় টান টান। আবার এই মেয়েকেই বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা হলের সামনে দেখেছিল ভেলপুরি খেতে খেতে হি-হি করে প্রাণ খুলে হাসতে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে রাস্তায়। তখন মনে হয়েছিল এই মেয়ের নাম বৃষ্টি মানায় না, ওর নাম হওয়া উচিত রোদ্দুর। শীতের রোদ্দুর।

সায়ন পিছন ফিরে বৃষ্টিকে দেখল। নিরীহ মেয়ের মত জড়োসড়ো বসে আছে। পাশে তার মা-ও নীরব। দু'জনের মুখ দু জানলায়।

বৃষ্টির শান্ত ভঙ্গি রহস্যময় লাগল সায়নের। বাসস্টপে রোদচশমার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বৃষ্টি, সিনেমা হলের সামনে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়া বৃষ্টি, ট্যাক্সির পিছনের সিটে আড়ষ্ট বসে থাকা বৃষ্টি, কোনটা ওই মেয়ের আসল রূপ ? নাকি অন্য কোন বৃষ্টি লুকিয়ে আছে এইসব ছদ্মবেশের আড়ালে ?

সায়নদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই বৃষ্টি আগে দরজা খুলে নেমে গেল,

—থ্যাংক ইউ মাসিমা। অন্য দিন ফেরার সময় যেরকম ভিড়ের মধ্যে উঠতে হয়।

—যা বলেছ। ফেরার পর শরীরে আর কিছুই থাকে না। এসো না আমাদের বাড়িতে। একটু চা-টা খেয়ে যাবে।

বৃষ্টি ইতস্তত করল,—না, আজ নয়, অন্য এক দিন। আপনি বাড়ি গিয়ে রেস্ট নিন। আপনাকে খুব টায়ার্ড লাগছে।

করবী জোর করল না। সায়ন মনে মনে ধন্যবাদ দিল বৃষ্টিকে। মা সন্ধের সময় একা থাকতেই ভালবাসে আজকাল।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে করবী। সায়নও। চারতলার ফ্ল্যাটে উঠতে করবী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সায়ন ওঠে জগিং করতে করতে।

ঘরে ঢুকেই সামনের সোফায় বসে করবী কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। সায়ন বলল,—দেখেছ তো, কেন বলেছিলাম চারতলার ফ্ল্যাট নেওয়াটা উচিত হয়নি ? এর পর আরও বয়স বাড়বে, ধকলও বাড়বে।

করবী হাতের ইশারায় বলল, এক গ্লাস জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল খাওয়ার পর ধাতস্থ হল একটু,

—সব কিছুই কি নিজের ইচ্ছেয় হয় রে ? তোর দাদুর তো শুধু এই জমিটাই পড়ে ছিল। দাদা, সুনু, রেবা সবাই মিলে যা ঠিক করবে তাই তো হবে ? জমির দাম বেশি দিয়েছে বলে প্রোমোটারও তো একটু ওপরের দিকেই ফ্ল্যাট দেবে। তাও বাবা একতলার থেকে ভাল। নীচে যা নোংরা ! ধুলো !

সায়ন চুপ করে গেল। মা-ই শুধু ফ্ল্যাট নিয়েছে। মাসিরা, মামারা জমি বিক্রির ক্যাশ। তাদের আছে অনেক। এই ধরনের ফ্ল্যাটে তাদের পোষাবেও না।

করবী হঠাৎ প্রশ্ন করল,—মেয়েটা খুব ঠাণ্ডা, তাই না ?

মার কথাটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারল না সায়ন,—কোন মেয়েটা ?

—ওই যে এল আমাদের সঙ্গে। বৃষ্টি।

—কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম, এই বয়সে যা হয় আর কি।

করবী হেসে ফেলল,—তুই এই বয়স, এই বয়স বলছিস কেন ? তুই কি বুড়ো নাকি ?

সায়ন মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল,—তুমিই বা এমন বুড়ি বুড়ি হয়ে থাকো কেন ? শরীরে না পোষালে ক'দিন ছুটিও তো নিতে পারো। খাও, দাও, রেস্ট নাও...

সায়ন ভালভাবেই জানে মা শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেবে না।

করবী জামাকাপড় বদলাতে নিজের ঘরে উঠে গেল। দু ঘরের মাঝারি ফ্ল্যাট। সঙ্গে কিছুটা ড্রয়িংরুমের জায়গা। ডাইনিং স্পেসটা বেশ ছোট। একটা ফ্রিজ, চারটে চেয়ার আর ছোট ডিম্বাকৃতি খাবার টেবিলেই পুরো জায়গাটা ভরে গেছে।

করবী ঘর থেকে জিজ্ঞাসা করল,—চা খাবি নাকি ? করব ?

সায়ন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকেই বলল,—তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি করছি।

সায়ন যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, করবী শুয়েই ছিল। চোখ বন্ধ করে। মুখ একহাতে আড়াআড়ি ঢেকে। কাপ রাখতে গিয়ে সায়ন দেখল মার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

—কি হল ? আবার কান্নাকাটি কেন ? ওঠো। উঠে বোসো। টুলুমামা ঠিক সামলে উঠবে।

করবী উঠে বসে চোখ মুছল,—উঠলেই ভাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—উঠবেই। টুলুমামার ভীষণ মনের জোর। একবার যদি সেই জোর দিয়ে চায় আমি সুস্থ হয়ে উঠব, তা হলে ঠিক উঠে দাঁড়াবে।

—সে কি আর সব জায়গায় হয়? শরীরের ওপর কি আর মানুষের হাত থাকে?

—নিশ্চয়ই থাকে। কত অ্যাথলিট তো মনের জোরে ক্যানসার উড়িয়ে দিচ্ছে। আর তুমিই তো বলতে টুলুদা চাইলে পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

—তা ঠিক। তোর বাবাকে বিয়ে করার সময় তোর দাদু কম আপত্তি করেছিল? টুলুদাই তো বলে বুঝিয়ে...তখন টুলুদা না পাশে থাকলে...

এ গল্প মায়ের কাছে বহুবার শুনেছে সায়ন। শুনতে ভালও লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য ভয় পাচ্ছিল সে। টুলুমামার কথা বলতে বলতে মা বাবার প্রসঙ্গে যাবেই।

সায়ন কথা ঘোরাল,—ক্লাবে দু-চারটে চাকরির খবর আসছে, বন্ধুরা অনেকেই বলছে নিয়ে নিতে, কি করি বলো তো?

—তুই কি চাস?

—আমি খেলতে চাই। তবে চাকরিও তো দরকার।

—চাকরি করলে খেলার ক্ষতি হবে?

—তা তো একটু হবেই। সেজন্যই তো নিতে চাইছি না।

—দ্যাখ তুই যা ভাল বুঝিস...

সায়ন জানে মা কোনো ব্যাপারেই তার ওপর জোর করবে না। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমূল বদলে গেছে। মাঝে মাঝে সায়নের বিশ্বাসই হয় না। এই কি তার ছোটবেলায় দেখা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মা! যার ভয়ে বাবা গুটিয়ে থাকত সব সময়! মার জন্য হঠাৎই বড় কষ্ট হল সায়নের। বুকের ভেতর একটা শুঁয়োপোকা নড়াচড়া করছে। নড়ছে। নড়ছে। নড়েই চলেছে।

গভীর অরণ্যে এক সন্ন্যাসী দস্যু রত্নাকরকে বলেছিলেন, ডাকাতি তো করছ; তোমার পাপের ভাগী কে হবে? বউ? ছেলে? মেয়ে? বাবা? মা? কেউ না। রত্নাকর যাচাই করতে গিয়ে দেখেছিল সেটাই সত্যি।

মিথ্যে কথা। পাপের ভাগ সবাইকেই নিতে হয় বৈকি। মা, বাবা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে। একথা সায়নের থেকে বেশি আর কে জানে। চোখের সামনে, নিজেরই মায়ের অন্তরে যে তীব্র অনুশোচনার দহন দেখছে এই সাত বছর ধরে সেটা কি পাপের অংশীদারী নয়? পাপ কি কারুর একার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালি কাপ ডিশ তুলে নিয়ে সায়ন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। পিছন থেকে করবীর স্বর,

—বুবলু, তুই আমায় নিয়ে চিন্তা করিস না। তুই চাকরি করতে চাইলে চাকরি কর, খেলতে চাস খ্যাল...আমি কোনো মত চাপাব না।

করবী যেন সায়নকে নয়, নিজেকেই শোনাতে চাইছে কথাগুলো।

কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সায়ন।

মুহূর্ত পরে করবী হঠাৎই বলে উঠেছে,—তোর বাবার মুখটা তোর মনে পড়ে বুবলু ?

সঙ্গে সঙ্গে সায়নের চোখের সামনে ঘরটা দুলে উঠল। সাদা চাদরে ঢাকা... একটা মৃতদেহ। চাদর সরতেই একটা বীভৎস, নুন ছাল উঠে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মুখ।

সায়ন চোখ বুজে ফেলল।

॥ ৯ ॥

রোমিলা থাপারের বইটা ফেরত দিয়ে পরভিনের সঙ্গে লাইব্রেরি থেকে বেরোল বৃষ্টি। সকালে কলেজে আসার সময় বইটার দিকে তার নজর পড়েছিল। বেশ কয়েক দিন হল ফেরত দেওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে।

আজকাল বৃষ্টি দরকারি কাজগুলো বড় ভুলে যাচ্ছে। নবনীতার নিউ ইয়ারস্ গ্রিটিংস্ সাত-আট দিন হল এসেছে, এখনও উত্তর দেওয়া হয়ে উঠল না। সামান্য একটা কার্ড কিনে পোস্ট করা, তাও মনে থাকছে না। হপ্তা দুয়েক ধরে একটা বন্নাছাড়া বুনো রাগ তাকে আলটপ্‌কা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই মাথা ঠাণ্ডা, হাসিমুখে কথা বলছে লোকের সঙ্গে, আবার এই মেজাজ আগুন। বাড়িতে কারণে অকারণে মুখ করছে সুধাকে, বাবলুর সঙ্গেও দু দিন ঝগড়া হয়ে গেল, বাবলু তার সঙ্গে কথা বলছে না। ক্লাসে লেকচার শুনবার সময়ও সব সময় নিজেকে সুস্থিত রাখতে পারে না সে। কেন অমন মূর্খের মত কাজ করে ফেলেছিল সেদিন ? কি দরকার ছিল তার ওভাবে বাবাকে ফোন করার ? ভাবতে গেলেই বৃষ্টির প্রতিটি রোমকূপে অপমানের হুল ফুটতে থাকে। প্রতি পলে মনে হয় রীতা নামের মহিলাটিও নিশ্চয়ই সেদিন দাঁড়িয়েছিল বাবার পাশে, সুবীর যখন তাকে পাগল ভাবছিল নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছে, ভেবেছে, দ্যাখো মেয়ে ভাবে বাবা এখনও তার বাচ্চাবেলার কেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম, হুকুম করলেই সুড়সুড় করে মেয়ের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়বে ! তা কি আর হয় ! সুবীর এখন রীতার স্বামীই নয়, রাজার বাবাও বটে ! মা ছেলের সেই টানের সঙ্গে এই ধিঙ্গি অসভ্য মেয়েটা পেরে উঠবে কেন ?

বৃষ্টি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল,

—তুই যা। আমার ক্লাস করতে ভাল লাগছে না। তাছাড়া এ ডি আর তো ক্লাস নিতে আসেই না, মিছিমিছি পাস ক্লাসে গিয়ে বসে থাকা···

—আজকে যদি আসে ? একদিন ক্লাসে না দেখলে গোটা বছর অ্যাবসেন্ট করে দিতে পারে। লাস্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারের কয়েকজনকে নাকি করেছিল।

—মামদোবাজি নাকি ? নিজে সারা বছর গুলতানি মেরে বেড়াবে, ক্লাস নিতে আসবে না···

—গুলতানি কি বলছিস্ রে ? পার্টির কাজ করে বেড়ান···

—পার্টি করে বলে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি ? গভর্নমেন্ট থেকে কি ওকে মুখ দেখানোর জন্য মাইনে দেয় ? আমি যাব না। দেখি কি করে আমাকে সারা বছর অ্যাবসেন্ট করে !

—আমি একবার যাই। রণজয়ও গেছে। ও বলছিল···

—ও। তুই তাহলে ক্লাস করার জন্য যাচ্ছিস্ না ? বৃষ্টি হঠাৎই খুব নিষ্ঠুরভাবে বলে উঠল,—আন্দোলন করতে যাচ্ছিস্ ?

পরভিন আহত চোখে তাকাল বৃষ্টির দিকে। বৃষ্টি আজকাল এরকমই বিশ্রীভাবে কথা বলে।

উত্তর না দিয়ে পরভিন উঠে যাচ্ছিল, বৃষ্টি তার হাত ধরে টেনেছে, লঘু গলায় বলল— শোন্ শোন্, কি এত কথা থাকে রে তোদের ?

—সেটা তোকে বলব কেন ? পরভিন গম্ভীর।

বৃষ্টি পরভিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল,

—চুমু ফুমু খাচ্ছিস ? গায়ে হাত ফাত দিচ্ছে ?

পরভিন জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল,

—তুই আজকাল খুব ভালগার হয়ে গেছিস বৃষ্টি।

বৃষ্টির মুখ সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে গেছে,

—কথাগুলোই ভালগার ? আর কাজগুলো খুব রোমান্টিক, তাই না ?

জ্বলন্ত চোখ হেনে পরভিন দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। বৃষ্টি নিজের মনে কাঁধ স্রাগ করল। পরভিনের এই সতী সতী ভাব সে একদম বরদাস্ত করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। নীচে নেমে দেখল সামনের মাঠে দেবাদিত্য, শুভ আর বিক্রম দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওদের পাস সাবজেক্ট আলাদা। বৃষ্টি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাদিত্যকে বলল,

—তুই যে আজ বড় ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারছিস !

দেবাদিত্যের মুখে স্বভাবসুলভ হাসি, —কোথায় ? তুই তো এসে গেছিস্। পরভিন কোথায় ? একটু আগে তোর সঙ্গে ঘুরছিল দেখলাম !

—পরভিনটা খুব খেপে গেছে। নিজেরই কপাল পোড়াচ্ছে।

—কে কার কপাল পোড়ায় ! ওই দ্যাখ, ওই ওদিকের থামটার আড়ালে···

—কে রে ?

—কে আবার। অরিজিৎ। আজও ব্যাটা ড্রাগ নিয়ে ব্যোম হয়ে বসে আছে।

অরিজিৎকে দেখে বৃষ্টির বুক ছমছম করে উঠল। মাসখানেক হল অরিজিৎ ড্রাগ ধরেছে। হোস্টেলে গিয়ে মোটা পার্থদের সঙ্গে ব্রাউন সুগার নেয়।

বিক্রম বলল, —ওর বাবা মার কথাটা একবার ভাব। কি আদরের ছেলে। দিব্যি পড়াশুনো করছিল, লাইব্রেরি যাচ্ছিল···ওর বাবার উচিত ওকে ধরে আগাপাশতলা চাবকানো।

—কেন, চাবকাবে কেন ? বৃষ্টি তখখুনি ঝন্ করে উঠেছে, —কোন্ রাইটে পেটাবে ? কারণ ছাড়া কোন ফল হয় না।

শাল-মহুয়ার জঙ্গলের অরিজিৎকে দেখতে পাচ্ছিল বৃষ্টি। কি অপূর্ব ধ্বনিময় কবিতা !

শুভ বলল, —ঠিক বলেছিস্। ওরও তো কোন মেন্টাল প্রবলেম থাকতে পারে।

বিক্রম বিজ্ঞের মত মুখ করল, —মেন্টাল প্রবলেম না কচু। ও সব অজুহাত। আসলে ক্যাপিটালিস্ট ব্লকের দেখাদেখি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতেও এসব ভাইস্ ঢুকেছে !

—থাম্ তো। শুভ ফস্ করে সিগারেট ধরাল, —লেকচার দিস্ না। ড্রাগ নেওয়া উচিত নয়, ঠিক আছে, মেনে নিলাম উচিত নয়। তবে উচিত তো অনেক কিছুই নয়। কটা উচিত হয় রে ? মাস্টারদের ক্লাসে ফাঁকি দেওয়া উচিত নয়, ছাত্রদের পড়াশুনো না করে গুণ্ডাবাজি করা উচিত নয়, গভর্নমেন্টের লোকেদের অফিসে ঘুমোনো উচিত নয়, ঘুষ খাওয়া উচিত নয়, প্রাইভেট কোম্পানির লোকেদের দুনম্বরী করা উচিত নয়, ব্যবসায়ীদের বাটপার হওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত নয়, ভোটের আগে লিডারদের ঝুড়ি ঝুড়ি গুল মারা উচিত নয়, এই তোদের সুদেষ্ণার কথায় কথায় নোটের গরম দেখানো উচিত নয়···

—এর মধ্যে আবার সুদেষ্ণাকে আনছিস্ কেন ? বেশ তো লিস্ট তৈরি করছিলি···

শুভ বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েছে। কটমট করে তাকাল দেবাদিত্যর দিকে, —তোর গায়ে লেগে গেল বুঝি ? নেতারহাট যাওয়ার সময় তোকে কত টাকা দিয়েছিল রে সুদেষ্ণা ? তিন শ ? না পুরোটাই ?

—তুই জানলি কি করে ? কে বলেছে ?

—কে বলবে আবার। সুদেষ্ণাই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। তুই কি ভেবেছিলি তোকে টাকা দিয়ে সুদেষ্ণা সেটা গোপন রাখবে ? হারামের পয়সা বিলোচ্ছে···

দেবাদিত্যর মুখটা করুণ হয়ে গেল।

বিক্রম বলল, —হারামের পয়সা বলছিস্ কেন ? ওর বাবা কত বড় ডাক্তার জানিস্ ? ওর বাবার ফি জানিস ?

—ডাক্তার মারাস্ না তো। ওরকম অনেক ডাক্তারের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল আমার বাবার কাছে আসে। ওদের দুনম্বরী পয়সা রগড়েই তো আমার বাবার পেট চলে। নিউ আলিপুরে সুদেষ্ণার বাবা কত বড় একটা নার্সিংহোম খুলেছে জানিস্ ? রুগীদের গলা মুচড়ে রোজগার। আঙুল গুনে বল্ তো নার্সিংহোমগুলোতে কটা নরমাল ডেলিভারি হয়, আর কটা সিজারিয়ান ?

শুভ গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে। বৃষ্টির খুব মনঃপূত হল কথাগুলো,

—যা বলেছিস। যেদিকে তাকাবি সব শালা চোর, ঘুষখোর। টপ টু বটম। খালি নিজেদের সুখ শান্তি খুঁজছে। করাপ্ট, সেলফ্ সেন্টারড্···

—আমার ছোট কাকা নকশাল মুভমেন্টের সময় গুলি খেয়ে মরে গেল। ঠিক হোক, ভুল হোক, একটা কিছুর জন্য তো মরেছিল ? সেই লোকটার কথা এখন আমাদের বাড়িতে কেউ ভুলেও উচ্চারণ করে না। আমার দাদু ঠাকুমার কাছে পর্যন্ত সেই ছেলে হল বোকার হদ্দ আর বুদ্ধিমান হচ্ছে আমার ঘুষখোর বাবা।

দেবাদিত্য শুভকে বলল,—তুই কি রে ? সারাক্ষণ নিজের বাবাকে গালাগাল করিস কেন ? সবার সামনে ? ছিঃ।

বিক্রম বলল, —তুই নিজে কি ? বাপের পয়সায় টুকটাক মাল খেয়ে বেড়াচ্ছিস্, ফুর্তি মারছিস···

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল, —প্রথমত, আমি বাপের পয়সায় মাল খাই না, বাবার বোতল থেকে খাই। দ্বিতীয়ত, বাবার পয়সায় আমার একটা ন্যায্য অধিকার আছে, সেটুকু আমি নিতেই পারি।

দেবাদিত্য বলল, —তোকে দেখলে আমার ভয় করে রে শুভ। তুই যখন বড় হয়ে চাকরি বাকরি করবি, বিয়ে থা করবি, তখন যে তুই কি জিনিসে পরিণত হবি···

—কিসে পরিণত হব ? এ পারফেক্ট নাটবল্টু টু দিস্ মডার্ন সোসাইটি। মোটা মাইনের চাকরি জোগাড় করব কম্পিটিটিভ্ পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে, তারপর এনরমাস ঘুষ নেব, প্রমত্ত হুড়োহুড়ি করব, যাকে বলে ফুল এনজয়মেন্ট অফ লাইফ ইন এভ্রি সেন্স, তারপর পঞ্চাশের পর থেকে প্রেশার আর সুগারের ওষুধ, ষাটে অক্কা। ততদিনে আমার ছেলেও একটা পারফেক্ট আমি তৈরি হয়ে যাবে।

দেবাদিত্য হাত ওল্টালো।

বৃষ্টি চুপ করে বন্ধুদের কথা শুনছিল। নাহ্, এরা সবাই তার সাময়িক সঙ্গী হতে পারে মাত্র ; বন্ধু নয়। এদের সকলের স্বভাবেই কোন না কোন রকম হ্যাংলামি রয়েছে। দেবাদিত্যর মধ্যেও ঠাট্টার মোড়কে হ্যাংলামিকে ঢেকে রাখতে চাইলেও মাঝে মাঝে এমন প্রকট হয়ে পড়ে ! অভাব থেকেই হয়ত ওর এই অভ্যাসটার জন্ম হয়েছে। নিজেরই অবচেতনায়। নাকি বৃষ্টিরই ভুল ? বিক্রম, রণজয়, শুভদের মতো স্পষ্টভাবে দেবাদিত্যকে পড়তে পারে না বৃষ্টি।

সূর্য দূরে ইকনমিকস্ বিল্ডিং-এর মাথায় নেমে এসেছে। থেকে থেকেই দৌড়ে আসছে হিমেল হাওয়া। গঙ্গাসাগরের বাতাস। বৃষ্টি ভাল করে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে নিল। পরশু থেকে জোর কাশি হয়েছে। ঘরে ফিরে রাতে ফ্যান চালিয়েছিল। সেই জন্যই কি ?

কাল রাত্রে বৃষ্টির ঘঙঘঙ কাশি শুনে মা এসে একবার দাঁড়িয়েছিল দরজায়। কোন কথাও বলেনি, কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে চলে গেল। সুধামাসি বলছিল, কয়েক দিনের জন্য নাকি শান্তিনিকেতন যেতে পারে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক্সকারশান্। যেখানে খুশি যাক, বৃষ্টির তাতে কি ?

বৃষ্টি শুভকে বলল, —কিরে, যাবি তো ?

—তুই কোথায় যাচ্ছিস ? বাড়ি ?

—দূর, এত তাড়াতাড়ি কি বাড়ি ফিরব ? চল্, একটা সিনেমায় যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ দেবাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, —যাবি আমাদের সঙ্গে ?

দেবাদিত্য এড়িয়ে গেল, —তোরা যা। আমার হোস্টেলে কাজ আছে।

শুভ আর বৃষ্টি কলেজের বাইরে বেরিয়ে এল। কদিন ধরে বেশ কনকনে শীত পড়েছে। বেলাও তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসে এখন।

শুভ বৃষ্টিকে আঙুল তুলে দেখাল, —ওই দ্যাখ্। বড়লোকের বেটি বই দর করছে।

বৃষ্টি দেখার আগেই সুদেষ্ণা দেখতে পেয়েছে বৃষ্টিকে, —অ্যাই বৃষ্টি দেখে যা, বইটার কি দাম চাইছে।

শুভ নিচু গলায় বলল, —যেতে হবে না। বল্ কাজ আছে।

শুভর ছেলেমানুষি দেখে বৃষ্টি হেসে ফেলল, —দাঁড়া না, দেখি কি করছে।

—তুই যা, আমি সিগারেট কিনছি।

—আমার জন্যও এক প্যাকেট নিস্।

সুদেষ্ণার হাতে ফ্রেঞ্চ কুকিং রেসিপির বই। ইদানীং সুদেষ্ণার রান্নাবান্নার বইতে খুব আগ্রহ হয়েছে। গ্রন্থমেলা থেকেও তিন-চারটে রান্নার বই কিনেছিল। বিয়ের পর জয়ন্তকে খাওয়ানোর রিহার্সাল দিচ্ছে। ন্যাকা ন্যাকা কাণ্ড যত। রান্নাবান্নার ব্যাপারে বৃষ্টি মোটেই উৎসাহী নয়। তবু বইটা দু-চার পাতা ওল্টালো,

—কত চাইছে ?

—সেভেনটি। আমি তিরিশ বলেছি।

—একটা ছুরি গলায় বসায়ে দ্যান দিদি, তবু পারব না। মা সরস্বতীর দিব্যি, পঞ্চাশে কেনা। আপনাদের দিতে পারলে আমারই তো ভাল লাগে। একটু যদি কাজে লাগতে পারি···

দোকানদার ছেলেটি যথেষ্ট সপ্রতিভ। বই বিক্রির চেয়ে সুন্দরী ক্রেতার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়াতেই বেশি আনন্দ তার।

—থাক তাহলে। সুদেষ্ণা সরে এল দোকান থেকে।

শ্যাওলা-সবুজ চাদর জড়ানো ছেলেটা শেষবারের মত মরিয়া চেষ্টা করল, —দিদি, লাস্ট দর পঞ্চান্ন, কোথাও আপনি এই বই এক পয়সা কমে পেলে আমার গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করে নেবেন।

—আমি থার্টির বেশি এক পয়সা দেব না।

বৃষ্টি তরলভাবে বলল, —নিয়ে নিলেই পারতিস্। অনেকগুলো চিংড়ির প্রিপারেশান ছিল দেখলাম। তোর পাইলট প্রন্ খেতে ভালবাসে বলছিলি না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নারে, জানিস না, এরা আমাকে চান্স পেলেই চিট্ করে। সেদিন মোঘল ল্যান্ড রেভেনিউ সিস্টেমের ওপর একটা বই কিনলাম, ওটা রণজয় আমার থেকে আট টাকা কমে কিনেছে।

শুভ কখন পায়ে পায়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে,

—কিরে, কিনলি না যে ? দরে বনল না বুঝি ?

—নাহ্। অনেক বেশি চাইছে।

—কত বেশি ? তোর একদিনের গাড়ির তেলের খরচার থেকেও ?

সুদেষ্ণা ভ্রূকুটি করল। তারপর বৃষ্টির দিকে ফিরে, কাঁধের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বলল, —কোথায় যাচ্ছিস ? চল্ না একটু কফি হাউসে যাই। সুনীতা ওখানে একটা জাপানি ছেলেকে নিয়ে আসবে।

--কে সুনীতা ? সুনীতা আগরওয়াল ?

—না, সুনীতা চাওলা। ইকোর। জাপানি ছেলেটা নাকি থার্ড ওয়ার্ল্ডের এডুকেশন সিস্টেমের ওপর কাজ করছে। সোর্স মেটিরিয়াল চায়।

বৃষ্টির এই ধরনের কথাবার্তায় পিত্তি জ্বলে যায়। একটা মিজিগুচি বা টাকাশিমা ভিখিরির দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা রকম থিসিস্ লিখে যাবে, তা নিয়ে এত আদিখ্যেতা করার কি আছে ? সুনীতা চাওলা মেয়েটা পারেও বটে। ভালমামা এসব আদিখ্যেতার কথা শুনলেই রেগে যায়। বলে, স্লেভ্ মেন্টালিটি। কিছু কিছু মানুষের জন্য পৃথিবীটাই আর বাসযোগ্য থাকবে না। বৃষ্টি মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল,

—নারে, আমি আর শুভ একটা জায়গায় যাব।

সুদেষ্ণা রাস্তা পেরিয়ে যেতে বৃষ্টিরা বউবাজার মোড়ের দিকে এগোল।

শুভ বলল, —আজ সিনেমা থাক্। চল্, তোকে আজ রাজীবদের আড্ডায় নিয়ে যাই। দেখবি কত হৈচৈ, হুল্লোড়, মস্তি···একটা অন্য লাইফ···

ঝাঁচকচক একটা নতুন বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটের বেল টিপল শুভ। জিন্সের ওপর কালো পুলওভার পরা এক কুচকুচে কালো মেয়ে দরজা খুলেছে। শুভকে দেখেই তার মুখে এক গাল হাসি,

—হাই বিগ ম্যান্। তিন চার দিন ডুব কেন ?

শুভ বৃষ্টিকে দেখাল, —মিট্ বৃষ্টি। আমার ক্লাসমেট্। অ্যান্ড দিস ইজ জিন্ডা। জয়ন্তী সেন।

জিন্ডা বলল, —হাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজীবদের ফ্ল্যাটে ঢুকেই প্রথমেই চোখে পড়ে ধোঁয়াশামাখা এক বিশাল হলঘর। এত বিশাল যে বৃষ্টির মনে হল তাদের গোটা বাড়িটাই বুঝি এই হলে ঢুকে যাবে। ঘর জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে দামি সোফাসেট, কোণে রঙিন টি ভি-তে হিন্দী ফিল্মের ক্যাসেট চলছে। তার সামনে তিন চার জন ছেলে, গোটা দুয়েক মেয়ে। কেউ সোফায় বসে নেই, সকলেই আরাম করে বসে দেওয়ালজোড়া পুরু কার্পেটের ওপর। দুটো ছেলের হাতে গ্লাস, গ্লাসে পার্শীয় টলটল্ করছে। বৃষ্টি আর শুভকে দেখে সকলেই ঘুরে তাকাল,

—হ্যালোও !

শুভ হাত নাড়ল।

জিন্ডা বৃষ্টিকে বলল, —দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।

সোফায় শুভর পাশে বসে বৃষ্টি বলল, —ঘ্যাম্ ফ্ল্যাট তো রে ! কি করেন রাজীবের বাবা ?

—বিজনেস্। আমার বাবার ক্লায়েন্ট। এখানে থাকে না। হাওড়ায়।

শুভ বৃষ্টির কানে তথ্য ঢেলে চলেছে, —ছেলেই এ বাড়ির কেয়ারটেকার। একটা বুড়ো চাকরও থাকে। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ফুর্তি করতে আসে এখানে। আসার আগে রাজীবকে নোটিস পাঠায়, বেটা, আজ তুমি কাটো, আজ আমার পালা। অনেক ভি আই পি, টি আই পি আসে তখন। সরকারি। বে-সরকারি। আমলা। মিনিস্টার। আমার বাবাও আসে। খুব নাচাগানা, খানাপিনা···বলতে বলতে এক চোখ বন্ধ করে বিচিত্র অর্থপূর্ণ মুদ্রা করল শুভ।

পাশের ঘর থেকে এক যুবককে তাদের দিকে আসতে দেখে শুভ কথা থামাল। এই শীতেও ছেলেটা শুধু একটা বুকখোলা টিশার্ট পরে আছে, জিনসের প্যান্টে অসংখ্য তালি, এক কানে দুল চকচক করছে। ঘরে অনেকের গায়েই যদিও গরম পোশাক নেই তবু এর পোশাক যেন একটু বেশি বেপরোয়া। বৃষ্টির পাশে এসে নির্দ্বিধায় বসে পড়ল।

শুভ বলল, —বৃষ্টি। শী ইজ্ বৃষ্টি রায়।

ছেলেটা চকচকে হাসি হাসল, —দারুণ নাম তো ! আমি জিমি। জীয়ন মুখার্জি !

বৃষ্টি আলতো হাসল। যার ফ্ল্যাট সে কোথায় ? রাজীব ?

জিমি বুঝি বৃষ্টির মনের কথা বুঝতে পারল, —চলো, ভেতরে চলো। রাজীবটার খুব মাথা ধরেছে। টেকিং রেস্ট্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের বড় সুসজ্জিত ঘরে প্রকাণ্ড খাটে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে শুয়ে ছিল রাজীব। রাজীবের মুখ বেশ কমনীয়, প্রায় মেয়েলি, মুখ দেখে পনেরো-ষোল বছরের বেশি বলে মনে হয় না।

প্রথমে পরিবেশটা অস্বস্তিকর ঠেকলেও, ছেলেমেয়েগুলোর আন্তরিকতায় বৃষ্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ সাবলীল হয়ে উঠল। রাজীব ছেলেটা তো এমন ভাবে কথা বলছিল যেন বৃষ্টি তার কতদিনের চেনা। ছোট্টখাট্টো মিষ্টিমুখ নিধি কার্লেকার একটা গ্লাস দিতে চাইল বৃষ্টিকে,

—চলবে ?

বৃষ্টি বলল, —নো, থ্যাংকস্।

—চলে না বুঝি ?

—চলে না আবার ! শুভ ফুট কাটল, —নেতারহাটে গিয়ে এক ওয়াটার বটল্ ভর্তি মহুয়া একাই সাফ করেছে···

বৃষ্টি লজ্জা পেল। নেতারহাটে সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। পরদিন কি কষ্ট ! রাঁচি পৌঁছে টি এম তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান আর কি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ড্রিঙ্ক করতে একটুও ইচ্ছে করছে না। আবার এরা তাকে গাঁইয়া, আনস্মার্ট ভাবুক সেটাও ভাবতে ভাল লাগল না। বৃষ্টি ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করে ধরাল,

জিমি জিজ্ঞাসা করল, —প্লেন ?

বৃষ্টি প্রথমটা মানে বুঝতে পারেনি, বলে ফেলল, —না, ফিল্টার।

রাজীব জোরে হেসে উঠল, —জিমি জিজ্ঞেস করছে প্লেন সিগারেট, না ভেতরে মালমশলা কিছু আছে ?

গাঁজা টাজার কথা বলছে নাকি !

—না, না, প্লেন।

জিমি একটা সরু সিগারেট বাড়িয়ে দিল, —লাইক টু হ্যাভ ওয়ান ?

বার বার না বলা যায় না। বৃষ্টি কাঁধ ঝাঁকাল,

—শিওর। হোয়াই নট ?

প্রথম টানটা দিতেই বুকে সজোরে ধাক্কা। এ ধাক্কা কলেজে প্রথম দিন সিগারেট খাওয়ার ধাক্কার থেকেও অনেক বেশি প্রবল। নিশ্বাস বন্ধ করে ধাক্কাটাকে হজম করল বৃষ্টি। ধোঁয়াটাও। দ্বিতীয় টান, তৃতীয় টানে···আহ্, সব মুছে যাচ্ছে মাথা থেকে। সব। মা, বাবা, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা বিষাদ সব মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। বৃষ্টি আবারও টান দিল। ভাসছে। ভাসছে। মহাশূন্যে পাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়ে চলেছে। পৃথিবী নেমে গেল অনেক নিচে। রাজীব, জিমি জিন্ডা, শুভ ইন্দ্রজিৎ, নিধি সবাই ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। বোতলের ভূতের মত দেখাচ্ছে সকলকে।

বৃষ্টি খিলখিল করে হেসে উঠল। এই কি সুখ!

পর পর কয়েক দিন কলেজ থেকে সোজা রাজীবদের ফ্ল্যাটে হাজির বৃষ্টি। দু-দিন তো শুভকে ছাড়াই। সন্ধেবেলায় একটা সাজানোগোছানো ঘরে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ের সঙ্গে দিব্যি সময় কেটে যায়। বিকেলের পর আর কি করি কি করি ভাবটা নেই। এ ওর পিছনে লাগছে, ক্রিকেট ফুটবল টেনিস নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে কেউ, কেউ রাজনীতি নিয়ে। কোন ব্যাপারেই কেউ বেশি গভীরে যায় না। পালকের মত হাল্কা জীবন। ভাসো। শুধু ভেসে থাকো। তাদের পাড়ার সায়নদীপ ছেলেটা রামবোকা। খেলা নিয়ে সিরিয়াস, শরীর নিয়ে সিরিয়াস, জীবন নিয়ে সিরিয়াস। সেদিন দেখে মনে হয়েছিল মাকে নিয়েও সিরিয়াস। যেভাবে মার পিঠে হাত দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে গেল! মাঝে একদিন সকালে মুখোমুখি পড়ে যেতে বৃষ্টি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করেছিল,

—তোমার মামা কেমন আছেন?

ছেলেটার চোয়াল এমন ঝুলে পড়ল যেন মারাই গেছেন ভদ্রলোক। বলল, —বাঁদিকটা পড়ে গেছে। কি করে যে মামিমার চলবে এখন!

সেদিন সারা সন্ধে ভোঁ হয়ে বসে বৃষ্টি ভেবেছে আর হেসেছে। হেসেই গেছে নিজের মনে। ছেলেটাকে ভুগতে হবে। ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি ক্রমশ ডুবে গেছে চড়া পাশ্চাত্ত্য বাজনায়। মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে অবশ।

দিনগুলো একই রকমের বর্ণহীন, সন্ধ্যাগুলো সম্মোহক। এভাবেই অনন্তকাল কেটে যেতে পারত বৃষ্টির। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। নিস্তরঙ্গ পুকুর জানতেও পারে না কোথা থেকে ছোট্ট ইঁটের কুচি এসে শান্ত জলকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

রাস্তা থেকেই অনেক কটা গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল বৃষ্টি। খুনখুনে গলার হাসিটা শুনে চিনতে পারল। শিপ্রা হালদার। শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেড়িয়ে আসার পর বাড়িতে আজ মা আড্ডা বসিয়েছে।

বৃষ্টি বাইরে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদিন ধরেই সামনের পার্কটা আলোয় আলোময়। শীতকালীন হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌সের মেলা বসেছে। ওপাশের টেনিসকোর্টে যথারীতি সান্ধ্য ক্রীড়ার আসর। রনিদের বাড়ির দৈনিক চিৎকার শব্দ আর আলোতে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

সুধা দরজা খুলে দিতে বৃষ্টি ঘরের দিকেই যাচ্ছিল, ফিরোজ পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেলেছে তাকে,

—কেরে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে ভেতরে যায় ? আয় এদিকে।

বৃষ্টি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড্রয়িংরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

মা, ফিরোজ আঙ্কল, রমেন মামা, শিপ্রামাসি সোফায়। ভালমামা জানলার কাছে, হুইল চেয়ারে।

—তোকে যেন একটু শুকনো শুকনো লাগে !

অন্যদের দিকে তাকানোর আগে মার সঙ্গেই যে কেন চোখাচোখি হয়ে গেল ! বৃষ্টি তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ফিরোজের দিকে,

—ড্যাম টায়ার্ড। তোমার আর্টিস্ট কলোনির খবর কি বলো ? কবে ইনগরেশন ?

—হবে শীগগীরই। লাল ফিতের ফাঁসে একটু ফেঁসে আছে। তা সিনরিটা, তুমি এত রাত্রে কোথ্‌থেকে ? কোন রাখাল বালকটালক জুটেছে নাকি ?

রমেন জোরে হেসে উঠল,

—হোয়াট এ স্ট্রেনজ কোয়েশ্চন ফিরোজ ? এই বয়সে রাখাল বালক আসবে না তো কি আমাদের মত আধবুড়ো ভামেরা চারদিকে নেচে বেড়াবে ?

ফিরোজ আঙ্কলের মুখে লালচে আভা, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে আছে কপালে, মাঘ মাসেও। রমেনমামার হাসিটাও বেশ অস্বাভাবিক। দুজনেই মনে হয় টিপ্‌সি আছে।

বৃষ্টি ঠোঁট টিপে হাসল, —ইস্, রাখাল বালক কি জীবনের মোক্ষ নাকি ? আমিও তোমাদের মতই আড্ডা মারছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে।

শিপ্রা আবার খুনখুনে হাসি ছিটিয়ে দিল,

—ওয়েল সেড ডার্লিং। আয়, তুই আমার পাশে আয়, তোকে কতদিন আদর করিনি।

বৃষ্টির গা গুলিয়ে উঠল। শিপ্রামাসি এমন চকাৎ চকাৎ শব্দ করে চুমু খায় ! বৃষ্টির আপত্তি কি টের পেল জয়া ? আচমকা বলে উঠেছে,

—আমরা কিন্তু পয়েন্টটা থেকে সরে গেলাম। যে কথা হচ্ছিল···

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরোজ বলল,—বোস্ বৃষ্টি, তুইও শোন। তোর মা একটা ভাইটাল প্রশ্ন তুলেছে। ট্র্যাডিশনাল ভ্যালু বলে কিছু থাকবে, কি থাকবে না।

শিপ্রা অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজল,—আমার তো মনে হয় ট্র্যাডিশনাল ভ্যালু শব্দটারই কোন মানে হয় না। মরালিটির কি কোন রিজিড ডেফিনেশান থাকতে পারে ? বাচ্চা মেয়েটা রয়েছে, তাও বলি, ভিক্টোরিয়ান যুগে তো চেয়ার টেবিলের পায়াকে পর্যন্ত কাপড় পরাত ব্রিটিশরা, এখন তাদের গিয়ে দ্যাখো, হামলে পড়ে সব পিপ্ শো দেখছে। দুনিয়ার যতরকম নষ্টামি সব করছে প্যারিসে গিয়ে। ওদের দেখাদেখি আমাদেরও এই দুমুখোপনা।

ফিরোজ সোফায় হেলান দিল, —আমি বাবা অত ভ্যালুজ, মরালিটি বুঝি না। যা করতে মন চায় না, সেটাই অন্যায়, অশালীন ব্যস্। মনই হল গড। কন্‌সেন্সই আসল। নীতিফিতি বলে কিস্যু নেই।

বাবলু জানলা থেকে মুখ ঘোরাল, —তার মানে একটা সোসাইটির নিজস্ব সংস্কার, মূল্যবোধ সব মিথ্যে ?

রমেন বিশেষ কথা বলছে না। বাবলুর প্রতিটি কথা শুধু ঘাড় নেড়ে নেড়ে সমর্থন করে যাচ্ছে।

—আহা, মূল্যবোধ কেন মিথ্যে হবে ? ফিরোজ সোজা হল, —তবে মূল্যবোধ ভাঙতেই পারে। সোসাইটির যে কোন ক্রাইসিসে···

—এই, এইটাই হল আসল কথা। বাবলু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে,

—তাহলে আগে খুঁজতে হবে ক্রাইসিস্‌টা কেন এল, কি ভাবে এল। এখন আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে অর্ধেক মানুষই যা বিলিভ করে সেটা করে না। এক ধরনের হিপোক্রেসি···

—রাইট্ ! দ্যাখো গে যাও, যে ব্যাটা দিনে মার্কসিস্ট্, রাত্রে সেই ইনডাসট্রিয়ালিস্টের পেয়ালা থেকে মাল খাচ্ছে। চল্লিশ বছর আগেও, এ দৃশ্য কল্পনা করা যেত ? তাদের অনড় ভ্যালুজ যদি বদলে যেতে পারে, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ভাঙবে না কেন ? চোখের সামনে মানুষ যা দেখে, তাতেই রিঅ্যাক্ট করে।

শিপ্রা আরেকটা সিগারেট ধরাল, —এই যে কথা আর কাজের কন্ট্রাডিকশন, এতে ভ্যালুজে ঘা লাগবেই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। এর থেকে আমাদের পরের জেনারেশান কি শিখছে ? আমাদের ছেলেমেয়েরা ?

গুরুগম্ভীর কথার ঝাপটায় বৃষ্টির মাথা ভারী হয়ে আসছিল। ফুরফুরে মেজাজটা থিতিয়ে আসছে। তার উপস্থিতি নিয়ে এরা কেউই তেমন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতন নয়।

ফিরোজ বলল, —মাইরি তোরা বিশ্বাস করবি না, সেদিন ভোরবেলা আমাদের বাড়িতে এক মহিলা এসে উপস্থিত। বছর পঞ্চাশ বয়সেও চেহারায় দিব্যি চেকনাই···

রমেন প্রশ্ন করল, —রেণুকা কাপাডিয়া ? খুব ফর্সা ?

—না, না, মিসেস কাপাডিয়াকে আমি চিনি। তার ওরকম কুড়ি কুড়ি হাবভাব নেই।···বলে কিনা, ছবি দিন, নতুন গ্যালারি খুলছি, এগজিবিশান করব। আমি তো হাঁ। চিনি না, জানি না··· '

—তুমি কি বললে ?

—বললাম, আপনি জানলেন কি করে এ বাড়িতে একটা আঁকিয়ে থাকে ? উত্তর শুনে আরও তাজ্জব। বলে, খাম্বাজ গ্যালারির মিসেস জিন্দাল নাকি ওকে বলেছে ফিরোজ আনোয়ার নামে একটা লোক ছবিটবি আঁকে, ব্যাটার বাজারদর নাকি বেশ ভাল।

জয়া বলল, —মনে হচ্ছে লক্শমি সুব্রামানিয়ম। থিয়েটার রোডে নতুন গ্যালারি খুলেছে।

—লক্ষ্মী সরস্বতী বুঝি না, মহিলা না হলে আমি নির্ঘাত দোতলা থেকে ফেলে দিতাম। আর্টকে তোরা কোন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস ভাব। স্রেফ কমোডিটি। নাথিং মোর দ্যান স্নো পাউডার।

জয়া বলল, —এটা তুই ঠিক বলছিস না। সর্বত্রই এ জিনিস চলে। তুই ছবি আঁকতে পারিস ; সে করছে তার বিজনেস। দোষটা কোথায় ?

—দোষ তাদের বলছি না তো, দোষ আমাদের। যেভাবে ফরমাশ আসছে···আচ্ছা তুই বল না, এই যে তুই ফরমাইশি কৃষ্ণ রাধা এঁকে যাস্···এসব আঁকতে তোর নিজের ভাল লাগে ?

—না লাগার কি আছে ? আর্ট ইজ আর্ট। বিক্রি হলেও। না হলেও।

ফিরোজ লম্বা নিশ্বাস ফেলল,

—তুই অনেক বদলে গেছিস জয়া।

একটা কথাতেই ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে গেল।

বৃষ্টির এতক্ষণে মজা লাগছিল। ফিরোজ আঙ্কল ভাল টাইট দিয়েছে মাকে। মা গুম। টুক করে দরজা থেকে সরে গেল বৃষ্টি।

সুধা রান্নাঘর থেকে ডাকল,

—তুমি কি এখন খেয়ে নেবে ? না পরে সবার সঙ্গে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির খিদে পাচ্ছিল। বলল, —আমাকে এখনই দিয়ে দাও।

ঘরে ফিরে সালোয়ার কামিজ ছেড়ে নাইটি পরে নিল। আজকাল নিজের ঘরে ঢুকলেই শরীরে তার এক ধরনের কষ্ট হয়, বুকে যেন দম আটকানো অনুভূতি। এ সময় ঘরে বসে টানা দুখানা সিগারেট খেয়ে মানসিক স্থিরতা নিয়ে আসে সে। আজ মনটা তত ভার ভার নেই। সিগারেট ধরাল না। নিজের মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে খাবার টেবিলে এল। সুধা খাবার দিয়ে দিয়েছে।

বৃষ্টি চামচ করে ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলছিল, সুধা এসে দাঁড়াল,

—তোমার একটা ফোন এসেছিল।

—কার ফোন ?

—নাম বলেনি। মেয়েছেলের গলা। খালি জিজ্ঞাসা করল তুমি বাড়ি আছ কিনা। নেই শুনেই রেখে দিল।

ওফ্। এই মেয়েছেলে শব্দটা কিছুতেই সুধামাসির জিভ থেকে সরানো গেল না।

—কটার সময় করেছিল ?

—সাড়ে সাতটা হবে। টিভিতে বাংলা খবর চলছিল তখন।

কে ফোন করতে পারে ! মীনাক্ষি কদিন ধরে কলেজে আসছে না। কিন্তু মীনাক্ষিদের বাড়িতে তো ফোন নেই ! হঠাৎই স্নায়ুতে বিদ্যুৎঝিলিক। আজ পঁচিশে জানুয়ারি না ! বাবার জন্মদিন ! সেদিন ফোনে কথা কাটাকাটি করার পর একবারও বৃষ্টি বাবাকে ফোন করেনি, শনি রবিবারে দেখাও করতে যায়নি, বাবার ফোন এলেও ধরেনি পারতপক্ষে।

বাবা কী রীতাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল !

বৃষ্টি ঝটপট খাওয়া শেষ করে ডায়াল ঘোরাল,

—হ্যাপি বার্থডে বাবা। সরি, লেট হয়ে গেল।

সুবীরের গলায় প্রচ্ছন্ন অভিমান, —বেটার লেট দ্যান নেভার। কেমন আছিস্ ?

—ভাল। ফাইন্। তোমার শরীর কেমন ?

—ঠিক আছে।

—বাই দা বাই, রীতাআন্টি কি আমাকে ফোন করেছিল ?

—তা তো জানি না। দেখছি জিজ্ঞাসা করে···

রিসিভার ধরেই বাবা রীতাকে ডাকাডাকি করছে। ভাসা ভাসা মেয়েলি গলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনা গেল, কথা বোঝা যাচ্ছে না। ড্রয়িংরুমে এত জোরে জোরে হাসছে সবাই! ভালমামাও। ভালমামা এখনও এত জোরে হাসতে পারে! রবিবার অকারণে কি চিল্লান না চিল্লালো!

এক দৃষ্টে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ দেখছিল ভালমামা, একটা অ্যাঞ্জেল অবিকল মার মত নিস্পৃহ মুখে গোমড়ামুখো রেডসোর্ড টেলের দিকে তাকিয়ে। কেঁচো রাখার ভাসমান পাত্র প্রায় খালি। জলে অনর্গল বুদবুদ। টিভি বোবা।

বৃষ্টি গায়ে পড়ে ভাব জমানোর চেষ্টা করতে গিয়েছিল,

—তোমার আজ রুটিন ব্রেক? অ্যাকোয়ারিয়াম তো তুমি দুপুরে দ্যাখো?

বাবলুর চোখের পাতা নড়েনি।

—টিভি চালিয়ে দেব? সাদ্দাম হোসেনের খবর নেবে না?

—একদম ফাজলামি মারবে না। বাবলু আচমকা ফেটে পড়েছিল,—টিভিটা কাল থেকে খারাপ হয়ে পড়ে আছে, সে হুঁশ কারুর আছে? একজন শান্তিনিকেতনে গিয়ে মজা করছেন, আরেকজন বাড়িতেই থাকেন না···

—ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখছ না কেন?

—ন্যাকামো হচ্ছে? জানো না আমি কোলার টিভি দেখি না?

—সুধামাসিকে বললেই পারতে। মনোহর পুকুরের দোকানটায় খবর দিয়ে আসত।

—কেন? সব কথা বলতে হবে কেন? আক্কেল নেই কারুর? সবাই যে যার মত আরামে রয়েছে, কারুর তো কোন সুখের অভাব দেখি না। শুধু আমার ব্যাপারেই···

বাবা নয়, রীতা কথা বলছে ফোনে, —হ্যালো বৃষ্টি, হ্যাঁ আমিই ফোন করেছিলাম।

বৃষ্টির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

—তুমি তো প্রতিবছরই এদিন বাবার কাছে আসো, এবার কোন খোঁজখবর নেই, ভাবলাম তোমার শরীরটরীর খারাপ হল কিনা··তোমার বাবা সারাদিন ধরে তোমার জন্য ছটফট করছে। ···মুখে কিছু বলছে না···

বৃষ্টি দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। ঝরঝরে মেজাজ নিমেষে বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওই মহিলার ন্যাকাপনা এবার বন্ধ করতে হবে।

বৃষ্টি ঘরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল। সিগারেট ধরাল একটা। সুধা ঠিকই বলেছে। মেয়েছেলে! মেয়েছেলেই তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েছেলে। মেয়েছেলে। মেয়েছেলে।

॥ ১০ ॥

রীতা দরজা খুলতেই বৃষ্টি তাকে প্রায় ভেদ করে ভেতরে চলে এল। লিভিংরুম পার হয়ে সোজা একেবারে সুবীরের শোবার ঘরে। কোন দিকে তাকাল না।

শোবার ঘরের টেবিলে বসেই বোর্ড মিটিং-এর জন্য কাগজপত্র গোছাচ্ছিল সুবীর। তার বিশাল ফ্ল্যাটে দুটো পেল্লাই সাইজের বেডরুম, একটা স্টার্ডি, প্রকাণ্ড ডাইনিং কাম ড্রয়িং হল। বেশি রাত পর্যন্ত জরুরি কাজ না থাকলে সুবীর স্টাডিতে ঢোকে না। শোবার ঘরের টেবিল চেয়ারেই টুকটাক কাজ সেরে নেয়। বৃষ্টিকে দেখে সে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছে,

—কিরে তুই এখন ? কোথ্থেকে ? এ সময় ?

বৃষ্টি উত্তর দিল না। স্টোনওয়াশ প্যান্টের ওপর সাদা শার্ট পরেছে, শার্টের ওপর হাতকাটা জ্যাকেট। কাঁধ পর্যন্ত চুল ফুলে ঝামর হয়ে আছে। দামি বেডকভার পাতা খাটে পা ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল। দু চার সেকেন্ড। তারপর লাফিয়ে উঠে চলে গেছে ডাইনিং স্পেসে। ফ্রিজ খুলে এটা নাড়ছে, ওটা ঘাঁটছে। একের পর এক ঢাকা খুলে রান্নাকরা খাবারগুলো দেখল, শুঁকল, খোলাই রেখে দিল। বিয়ারের ভর্তি বোতলটা বার করে গালে ঠেকাচ্ছে, ঘ্রাণ নিল, মুখভঙ্গি করল বিচিত্র। আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছে।

সুবীরও মেয়ের পিছন পিছনই বেরিয়ে এসেছে,

—কিরে ? কি খুঁজছিস্ ? খাবি কিছু ?

রাজা প্রথমটা খেয়াল করেনি বৃষ্টিকে। তন্ময় হয়ে টিভিতে রঙিন বিজ্ঞাপন দেখছিল। এখন কাঠ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাঁ করে দেখছে বৃষ্টির কাণ্ডকারখানা।

রীতাও দরজায় স্তব্ধ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। সুবীরের দেখাদেখি সেও এবার কাছে এল,

—স্যান্ডউইচ খাবে ? ফ্রেঞ্চ টোস্ট্ ভেজে দেব ? ডিপ ফ্রিজে হ্যাম আছে, খেতে পারো।

বৃষ্টি যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। সশব্দে ফ্রিজের দরজা বন্ধ করল। অস্থির পায়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বিজয়, অ্যাই বিজয়, আমাকে কটা লুচি ভেজে দাও তো।

আদেশ দিয়েই আবার শোবার ঘরের দিকে গেল।

সুবীর টেবিলের কাগজপত্র গুটিয়ে ফেলল। এই সব দিনে তার কাজ মাথায় উঠে যায়।

বিজয় জিজ্ঞাসু চোখে দাঁড়িয়ে আছে রীতার নির্দেশের অপেক্ষায়। রীতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —মাংস বার করে গরম করে দিস্ সঙ্গে।

শুনেই বৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার বিজয়কে ডাকছে। এবার বেশ জোরে,

—লুচির সঙ্গে আলুভাজা। কিম্বা বেগুন ভাজা।

মেয়ের হাবভাবে সুবীর যথেষ্ট নাড়া খেয়েছে। গলাটাকে নরম রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল। মেয়ে যেন তার একটা কথাতেও না আহত বোধ করে,

—কোথ্থেকে আসছিস বল্ তো ? খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?

এ কথারও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না বৃষ্টি। সে যেন এ বাড়িতে কথা নয়, নিজস্ব কোন জরুরি কাজে এসেছে। সুবীরের ড্রয়ার এক টানে খুলে ফেলল। কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ পেয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বার করে ফেলেছে সুবীরের ওয়ালেট্টা।

ওয়ালেট হাতে নতুন করে খাটে গিয়ে বসল।

রীতা দরজায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। রাজাও গুটি গুটি এসে গেছে তার পাশে। গোটা ফ্ল্যাট কয়েক মিনিটেই থমথমে।

সুবীর পরিবেশ হাল্কা করতে চাইল। মেয়ের পাশে গিয়ে বসেছে,

—রীতা, বিজয়কে তাড়াতাড়ি খেতে দিতে বলো। আমার মেয়ের ভীষণ খিদে পেয়েছে। তুমি নিজেই গিয়ে নিয়ে এসো না !

বৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, —আমার খাবার বিজয় দিয়ে যাবে।

সুবীর মেয়ের ব্যবহারে ক্রমশ স্তম্ভিত। বৃষ্টি এত অভদ্র হয়ে গেল কবে থেকে ! এত অবুঝ ! কেন কিছুতেই কিছু বুঝতে চাইছে না ! বড় বিপন্ন বোধ করল সুবীর। সেই ভাবটুকু কাটাতেই বুঝি আদরের মেয়ের পিঠে হাত রেখেছে,

—কত টাকা লাগবে তোর ?

বৃষ্টি সুবীরের হাত আস্তে করে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। ওয়ালেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে নিজের ব্যাগে পুরতে গিয়েও, কি ভেবে থামল সামান্য। সরাসরি রীতার দিকে চোখ ফেলেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তিনশ নিলাম। এনি অবজেকশন্ ?

বলেই ওয়ালেট সুবীরের কোলে ছুড়ে দিল। রীতাকে ভেদ করে আবার বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। রীতার পাশে দাঁড়ানো রাজাকে কীট পতঙ্গের মত উপেক্ষা করে। রীতা দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল। মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করছে।

বৃষ্টি ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসল। দু-হাতে তবলা বাজিয়ে চলেছে টেবিলে।

—কি বিজয়, হল ?

বিজয় সভয়ে উঁকি মারছে। সে রান্না করে। ঝড়ের মেজাজ মর্জি বোঝা তার ক্ষমতার বাইরে।

রীতা বৃষ্টির পিছন থেকে হাত নেড়ে ইশারায় বিজয়কে বলল, —ভাল প্লেটে দিস্।

বৃষ্টি ঠিক শুনতে পেয়ে গেছে। শুনেছে ? না বুঝে নিল ? এ বাড়িতে এলেই ইন্দ্রিয়গুলো তার বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। সুয়োরাণীর বখে যাওয়া রাজকন্যার মত হুকুম করল,—প্লেটে নয়। মোরটে লুচি। হাতে দেবে।

অজস্র বিজ্ঞাপন শেষ হয়ে টিভিতে চিত্রহার শুরু হয়েছে। গোটা ফ্ল্যাটের ভূতুড়ে নিস্তব্ধতাকে কাটিয়ে তুলতে একটা ছেলে একটা মেয়ের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে গান শুরু করে দিল—ম্যায় তেরে পেয়ারমে পাগল···। মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরছে,—ম্যায় তেরে পেয়ারমে পাগল···। বৃষ্টি কটমট করে টিভির দিকে তাকাল। পারলে যেন চোখ দিয়েই টিভির দৃশ্যটাকে ভস্ম করে দেয়। নিজের মনে বিড়বিড় করে চলেছে, ইডিয়েট বক্স। ইডিয়েট বক্স।

বিজয় পাশে এসে ডাকল, —দিদি, লুচি।

বৃষ্টি লুচি কটা ছিনিয়ে নিল। শুধু লুচিই নিল, আলুভাজা নয়। হাতে লুচি নিয়ে, গ্রিলে ঘেরা সাততলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অফিস থেকে পাওয়া সুবীরের ফ্যাশনদুরস্ত যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটা বড় রাস্তার ওপর। অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া সব সময় ছুটছে নিচ দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়ালে মনে হয় নিচে হাজার হাজার আলোর রশ্মি যেন চতুর্দিকে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে ক্রমাগত। বৃষ্টি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সেদিকে।

ফাল্গুন পড়তে না পড়তেই বাতাস শিশুর মত চঞ্চল। বৃষ্টির ফোলা চুল হাওয়ায় আরও এলোমেলো হয়ে গেল। মিনিট কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরে ফিরল। এখনও সে দাঁতে লুচি ছিঁড়ে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের মুঠোয় লুচি চেপে বৃষ্টি এবার হানা দিল অ্যান্টিরুমটায়। রীতার নিজস্ব সাজঘরে। এক পলক নিজেকে দেখল আয়নায়। লিপস্টিক হাতে তুলেই ছুড়ে ফেলে দিল।

সুবীর তখনও শোবার ঘরের খাটে বসে। রীতা দরজায় নিথর। তার হাতের মুঠোয় পর্দার কোণ চেপে ধরা।

রীতাকে পাশ কাটিয়ে আবার সুবীরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি,

—কবে থেকে ?

ভিড় বাসের পাদানিতে একটা পা রাখার জন্য যেভাবে অসহায় আর্তি জানায় অফিসযাত্রীরা, সুবীরের গলায় অবিকল সেই আর্তনাদ,

—একটু বোঝ···একটু প্লিজ বোঝ···একটা কথাও তো আমি তোকে···

সুবীরের প্রার্থনাকে আমলই দিল না বৃষ্টি। এই দৃশ্যে সে এখন অভ্যস্ত। রীতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

—তুমিই কথা দিয়েছিলে। ইউ। ইউ জাস্ট্ কাণ্ট্ ব্যাক্ আউট্ নাউ।

সুবীরের চোখ মেয়েকে অতিক্রম করে রীতার দিকে। রীতা ছেলেকে খামচে ধরে আছে। রাজাও আঁকড়ে ধরে রীতার আঁচল।

বৃষ্টি রীতার দিকে ফিরল। রাজাকেও এক পলক দেখে নিল। এতক্ষণে তার মুখে হাসি ফুটছে। নিষ্ঠুর কসাই-এর হাসি। হাসিতে আত্মপ্রসাদ ঝরে পড়ছে। রীতার চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই সুবীরকে বলল, —চার মাস হতে চলল। বি কুইক মাই সুইট ড্যাড্। বলেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে। রাজাকে আলগা ঠেলে সরিয়ে। সুবীরের দিকে একবারও না ফিরে।

লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার বোতাম টিপল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। ছুটতে ছুটতে।

গভীর রাত্রে আচমকা কোন শব্দ শুনলে অনেকক্ষণ তার রেশ কানে লেগে থাকে। সেরকমই বৃষ্টির জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার অনেক পরেও শব্দটার রেশ কানে রয়ে গেল রীতার।

সুবীর ঘাড় ঝুলিয়ে বসেই আছে। রীতা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর ছেলেকে নিয়ে নিজের মনে চলতে থাকা টিভির সামনে বসল। তাকিয়েই আছে শুধু। কিচ্ছু দেখছে না। তীব্র অপমানের ঝাপটায় তার সমস্ত বোধ বুঝি অসাড় হয়ে গেছে। রাজাও বুঝতে পারছে একটা কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে গেছে বাড়িতে। দমকা হাওয়াটা, যাকে মা বলে তার দিদি, এরকমই এসে ওলোট পালোট করে দিয়ে যায় তাদের সব কিছু। মাঝে মাঝেই। রাজা কার্যকারণগুলো সঠিক বুঝতে পারে না। এটুকুই বোঝে দিদিটা চলে যাওয়ার পর বাবা মা এভাবেই আলাদা আলাদা বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দুজনেই জোরে জোরে ঝগড়া করে। এক সময় মা গিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। বাবা চুপ করে বসে থাকে ব্যালকনিতে।

সুবীর উঠে এসেছে ঘর থেকে। রীতার পাশে এসে বসল। রাজাকে আঁকড়ে ধরে বাঘিনীর মত বসে আছে রীতা। সুবীরের আচমকা নিজেকে ভীষণ বিচ্ছিন্ন মনে হল। সম্পূর্ণ একা। উত্তাল সমুদ্রে কম্পাসবিহীন দিক্-ভ্রান্ত জাহাজের মতো। সামনে ডুবো পাহাড়। নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল,

—কী যে হল মেয়েটার!...কেন যে এরকম করছে।...এত বুঝদার ছিল...কত শান্ত...

রীতা ঘাড় ঘুরিয়ে সুবীরকে দেখে নিল। তারপর হিম গলায় কাজের লোকটাকে ডাকল,

—বিজয়, রাজার খাবার দিয়ে দাও।

বিজয় কিচেনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিন সে নিজে নিজেই রাজার রাতের খাবার তৈরি করে। শুধু যেসব দিন তার বাবুর আগের পক্ষের এই মেয়েটা এসে তুফান তুলে দিয়ে যায়, সে সব দিনে সে কাজের দিশা হারিয়ে ফেলে। কী তিরিক্ষি মেজাজ যে মেয়েটার! তার দাপুটে বৌদি পর্যন্ত ভয়ে জুজু হয়ে যায়। আগে মেয়েটা তো আসতই না। ন মাসে ছ মাসে যাও বা আসত তাও বাবার সঙ্গে। কাঠ কাঠ বসে থাকত। শান্তশিষ্ট। দুঃখী দুঃখী। একদম চুপচাপ। দেখে বিজয়ের মায়া লাগত। হঠাৎই মেয়েটার মূর্তি একেবারে উল্টে গেছে।

বিজয় মাথা চুলকোল,—রাজার জন্য চিকেন স্যুপ করব?

—করো।

সুবীর পর পর সিগারেট খেয়ে চলেছে। হাতের আঙুলগুলো মৃদু কাঁপছে। আজকাল সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেও এই এক নতুন উপসর্গ হয়েছে তার। ফরিদাবাদ ট্যুরে একদিন বিশ্রীরকম মাথাও ঘুরে গিয়েছিল। হাইপার টেনশন। ডাক্তার তাকে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে বলেছে। পারলে মদও। আরও বলেছে মাস্থলি চেক আপ্ মাস্ট্।

রীতা উঠে টিভি বন্ধ করে দিল। সুবীরের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে। টিভির অর্থহীন শব্দগুলো তাও এতক্ষণ একটা পর্দা তুলে রেখেছিল দুজনের মাঝখানে। সেটা সরে যেতেই সুবীর রীতা মুখোমুখি।

সুবীর লক্ষ করল রীতার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। এসব সময়ে কি করা উচিত সেটা সুবীর আজও রপ্ত করতে পারেনি। শেষের দিকে জয়া বলত,—স্যাডিস্ট। কাছের লোকের চোখের জল দেখে তুমি আনন্দ পাও। ভীষণ ব্রুট তুমি।

সুবীর নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলে উঠল,

—বৃষ্টিটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল হয়েছে? না আদর দিয়ে তোমরাই পাগল করে তুলেছ? রীতা ঝপ করে বলে উঠেছে।

সুবীর দুহাতে চুল খামচে ধরল, —কি বরতে পারি বলো? কি করব?

—কি করবে মানে? শাসন করতে পারো না? তুমি তো তার বাবা; সহবত শেখাতে পারো না? যখন খুশি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে চলে যাবে; আমাকে সেটা হজম করে যেতে হবে?

—কি শাসন করব? এখানে এলে ঘাড় ধরে বার করে দেব?

—সে কথা আমি বলেছি কোনদিন? তার বাপের বাড়ি, সে যখন খুশি আসবে যাবে, আমি বলার কে? তা বলে বাপ হয়ে জিজ্ঞেসও করবে না মেয়ে অত মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে কি করে? কিভাবে ওড়ায়? মায়েরও বলিহারি যাই। এদিকে এত নাম আর মেয়েটিকে যা তৈরি করেছে···ঘেন্না···ঘেন্না···

সুবীর চুপ করে গেল। বৃষ্টির মুঠো মুঠো টাকা ওড়ানোর কথাটা তারও যে মাথায় আসেনি তা নয়। না দিয়ে তার উপায়ই বা কি। বাবা হয়ে কিছু তো দিতে হবে মেয়েকে। মেয়ে ঘুষ ভাবলেও। রীতাকে তো সে বলতে পারে না এই মেয়ে পৃথিবীতে এসেছে তারই ইচ্ছায়, বলতে পারে না এই মেয়েই তার বুকে বিব বিব বেজে চলে অনুক্ষণ। ভেবেছিল এই মেয়েকে দিয়েই বেঁধে ফেলা যাবে জয়াকে। বাঁধা তো গেলই না, মেয়েও ছিটকে গেল কক্ষ থেকে। এইরকম এক নির্বোধ মানুষের আবার সংসার করতে চাওয়ার ইচ্ছাটাকে একটা কুৎসিত নিটোল ঠাট্টা ছাড়া আর কিই বা মনে হতে পারে? সেই ঠাট্টাটাই বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি।

রীতা বলল, —আমার কথা নয় ছেড়েই দাও, ওইটুকু বাচ্চাটার সঙ্গে কিরকম ব্যবহারটা করে লক্ষ করেছ? চিন্তা করে দেখেছ ওই শিশুটার মনে কি রিঅ্যাক্শন হতে পারে? তোমাদের জন্য রাজাকে ভুগতে হবে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমবন্ধ করা কষ্টের মধ্যেও সুবীরের হাসি পায়। গোটা নাটকে এখন একটাই ভিলেন। সে নিজে। রীতা দায়ী নয়, হয়ত জয়াও দায়ী নয়, বৃষ্টি দায়ী নয়, রাজা তো নয়ই। এখন শুধু সবাই মিলে তাকে বেঁধে মারার অপেক্ষা।

সুবীর রাজাকে কাছে টানল,

—কিরে, দিদিকে দেখে তোর ভয় করে ?

রাজা আধ-আধ বুলিতে বলে উঠল, —দিদি খুব লাগি।

—থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। রীতা ছেলেকে টেনে নিল, —মেয়েকে নিয়ে ঢং করছ করো, আমার ছেলেকে ...

রীতার গলায় জয়ার স্বর। সব মেয়েই বোধহয় এরকম পোজেসিভ। ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেল সুবীর। সে নিজেও বা কম কিসে ? জয়ার প্রত্যেকটি মুহূর্তের ওপর সে কি দাবি জানাত না ? রীতার ওপরই বা কি কম অধিকার ফলিয়েছে সে ? জয়া মেনে নেয়নি, রীতা মেনে নিয়েছে। এটুকুই যা তফাত। সবাই তো এক ছাঁচে গড়া হয় না। সুবীরের এক কথায় তার অফিসের রীতা ব্যানার্জি চাকরি ছাড়তে দ্বিধা করেনি।

রীতা এখনও গজগজ করছে, —মেয়ে এসে আমাকে শাসিয়ে যায় বাবাকে নিয়ে চলে যাব, তুমি সেটা তারিয়ে তারিয়ে শোন, এনজয় করো। বলতে পর্যন্ত পারো না ভদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে ওই আচরণ করে না।

সুবীর এতক্ষণে ধৈর্য হারাল। কোণঠাসা বেড়ালের মত ফ্যাঁস করে উঠেছে, —সব দোষ শুধু বৃষ্টিরই—না ? মনে রেখো, এক হাতে তালি বাজে না। তোমার ত্রুটি নেই ? মেয়েটা যে সেই তেরো চোদ্দ বয়স থেকে কোনদিন তোমাকে আপন বলে ভাবতে পারেনি তার সবটাই ওর দোষ ? তুমি কতটা চেষ্টা করেছ ? তুমিও তো ওকে রাইভাল ভাবো, ভাবো না ?

সুবীরের কথার আঘাতে রীতা স্তব্ধ। সুবীর থামল না, —তুমিও তো ভেবেছিলে লাক্সারি বাসে বেড়াতে গেলে পাশে যে কোপ্যাসেঞ্জারটা বসে থাকে, বৃষ্টিও সেরকমই কেউ একজন। আছে থাকুক, না থাকলে আরও ভাল হত। আরও আরামের হত যাত্রাটা। জীবনটা। ভাবোনি ?

অপ্রিয় সত্য হঠাৎ হাটের মাঝে এসে পড়লে সম্পর্কগুলো অনেক উলঙ্গ হয়ে যায়। রীতা কেঁদে ফেলল।

সুবীর আরও কিছুক্ষণ নির্বাক বসে থাকার পর উঠে এসেছে ব্যালকনিতে। বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়ল পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানার নাসারি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনে আনা অ্যারেলিয়া গাছটার পাশে। এক সময় জয়া তাকে গাছের নেশা ধরিয়েছিল। নেশার আনন্দ চলে গেলেও অভ্যাসটা রয়ে গেছে।

রাত্রিতে গাছে হাত দিতে নেই, তবু সুবীর বাহারি পাতাগুলোতে আলতো হাত বোলাল। রেগে গেলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। রীতাকে নির্মমভাবে কথাগুলো বলে ফেলে খারাপ লাগছিল তার। যেমনই হক, তার চরম নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে এই রীতাই তো পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একদিনের জন্যও তার কোন কাজের প্রতিবাদ করেনি। মনে যাই থাক, রীতা কখনও সামান্যতম দুর্ব্যবহারও করেনি বৃষ্টির সঙ্গে। মনের ওপর তো হাত চলে না। কোন মানুষ সম্পূর্ণ রিপুমুক্ত হতে পারে!

সুবীর আবার সিগারেট ধরাল। আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট টিপটিপ কাঁপছে। এত কাঁপছে কেন! তবে কি তার বাবার মত তারও পার্কিন্‌সনস্ ডিজিজ্ আসছে!

সুবীরের বাবার অসুখটা ইদানীং বেড়েছে। হাত পার সঙ্গে মাথা পর্যন্ত কাঁপে। কদিন আগে স্পেশালিস্ট নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছিল সুবীর।

সুবীরের শরীর শিরশির করে উঠল। অসুখটা বংশগত।

জয়া বলত, ন্যায়রত্ন লেনের গাছকে টালিগঞ্জের টবে এনে পুঁতলেই কি তার চরিত্র বদলে যায়? গাছ সেই গাছই থাকে। শুধু ফুল ফল হয় না। উপড়োনো শিকড় নিয়ে শুকিয়ে মরে তাড়াতাড়ি।

তবে কি চাইলেও রক্তের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না? একেই কি নিয়তি বলে?

ফরিদাবাদের চক্করটা মাথায় ফিরে ফিরে আসছে। ডাক্তারের কথা মনে পড়ল, চেক আপ ইজ্ মাস্ট। কি চেক করবে সুবীর? শরীর? সময়? সম্পর্ক?

নিজের অজান্তেই কাচের শোকেস থেকে স্কচের বোতলটা বার করে সোফায় এসে বসেছে। সোনালি তরল টিলটিল দুলছে বোতলে। জয়া বোধহয় আবার জিতে গেল। ভাঙাচোরা দুর্গন্ধময় সরু ন্যায়রত্ন লেনের গলিটাই রয়ে গেছে তার শরীরে।

গ্লাসে অনেকটা হুইস্কি ঢালল সুবীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১১ ॥

ক্লাস থেকে স্টাফরুমে ফিরছিল জয়া। টানা চারটে ক্লাস নেওয়ার পর সে বেশ ক্লান্ত, তবু এখখুনি তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে কলকাতা তিনশ'র ওপর এগজিবিশন ওপেন হচ্ছে, প্রথম দিন তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া দরকার।

করিডোরে আসতেই জয়াকে একটি মেয়ে বলল, —দিদি, আপনার জন্য একজন নিচে অপেক্ষা করছেন।

এই সময় আবার কে এল ! তাদের পেন্টারস্ সার্কেলের কেউ ! তারা এলে তো ওপরের স্টাফরুমেই চলে আসত !

ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করল, —কে ? কি নাম ?

—তা তো ঠিক বলতে পারব না। ভেতরে আসতে বললাম, উনি বললেন আপনাকেই ডেকে দিতে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

জয়া অল্প ধন্দে পড়ে গেল। যাক গে, যেই হোক, বেরোনোর সময় কথা বলে নেওয়া যাবে। তার আগে একবার চোখে মুখে জল দিয়ে নেওয়া যাক্।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করল জয়া। এখনও যে কোন এগজিবিশান শুরু হওয়ার দিন তার বুক কাঁপে অথচ জয়া ভালই জানে তার কোন ছবির তেমন নিন্দে কেউ করবে না। বড় জোর দু একটা নিয়মমাফিক খোঁচা ... ফেসের কনট্যুরে ভাঙচুর চোখ ভরালেও পুরোপুরি মন ভরাতে পারেনি। অথবা নীল সবুজ অদৃশ্য হয়ে ধূসর হলুদের প্রাধান্য ছবির আবেদন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ করেছে বলেই মনে হয়। কিম্বা অ্যাক্রাইলিক ছেড়ে গোয়াশে আঁকা দ্যুতিময় নিসর্গদৃশ্য আমাদের যতটা আকৃষ্ট করে, ততটা মুগ্ধ করে না। খয়েরি রঙের ব্যবহার সেভাবে গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারেনি।

ফিরোজ বলে, —নন-প্রোডাক্টিভ্ এক্সারসাইজ অফ ইন্টেলেক্ট বাই নন্ ইনটেলেক্চুয়ালস্।

শ্যামাদাস বলে, —নন্ইন্টেলেক্চুয়ালস্ ? না সোকলড্ ইন্টেলেকচুয়ালস্ ?

—একই হল। যার নাম চালভাজা, তারই নাম মুড়ি।

জয়া প্রতিবাদ করে, —বারে, ক্রিটিক্রা তাদের মতামত জানাবে না ?

নিখিল বলে, —সে তো তুই বলবিই। তোর যা র‍্যাপো ওদের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে মনে রাগ করলেও জয়া প্রকাশ করে না। যে যাই বলুক টেনশানটা তার থাকেই। আজকের প্রদর্শনী নিয়েও তার দুশ্চিন্তা কম নয়।

জয়াদের পেন্টারস্ সার্কেলের শিল্পীদের প্রত্যেকের দুখানা করে ছবি নিয়ে কলকাতা তিনশ' উপলক্ষে বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে আর্টস ফোরাম। অন্য সব খ্যাতিমানদের পাশে তার ছবির কতখানি কদর হবে সে সম্পর্কে জয়া কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিল না।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে দুটো ছবি বেছেছে সে। একটা ছবিতে বাবু কাল্‌চারের ট্র্যাজেডি। কয়েকজন লোক উজ্জ্বল আলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আলোর নিচে তাদের শরীরেই অন্ধকার। আলোর মধ্যে ফোটাতে চেয়েছে কলকাতার বাবুদের চেহারা। অন্ধকারটাও তাদেরই। দ্বিতীয় ছবিতে মাঝরাত্রে ভিক্টোরিয়ার পরী নেমে এসেছে কলকাতার ফুটপাথে, এক ভিখারির সংসারে। একটা চারকোল ড্রয়িং করারও ইচ্ছা ছিল ; হল না। সুহাস আর শ্যামাদাসও ভিক্টোরিয়ার ওপর কাজ করেছে। মিশ্র রঙে। ফিরোজ সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় মুছে যাওয়া আলোয় গঙ্গার পাড়ে বাঁধা নৌকোগুলোকে ধরতে চেয়েছে জলরঙে। মূলত বাদামিতে। নিখিল শিপ্রা দেবযানী অ্যাক্রাইলিকে কাজ করেছে। নিখিল এঁকেছে ভোরের কলকাতায় জ্যামিতিক ট্রাম। দেবযানীর কলকাতায় মেট্রো রেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক বেরিয়ে আসছে। ইমপ্রেশনিস্ট টাচে।

ব্যাগ গুছিয়ে নীচে নেমে এল জয়া। গেটের দিকে যেতে গিয়েও হঠাৎ নিথর। গেটের কাছে সুবীর না ! সুবীর ! কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত চিন্তা ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল জয়ার। এত দিন পর সুবীর ! তার কলেজে !

জয়া এগোতে চেষ্টা করল। পা দুটো নড়তে চাইছে না। সুবীর নিজেই এগিয়ে এল। কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল,

—তোমার সঙ্গে দরকারি কথা ছিল।

সুবীর কত বদলে গেছে ! প্রচুর ভাঙচুর এসেছে শরীরে। সামনের ঘন চুল পাতলা। মাথা জুড়ে রূপালি সুতোর আঁকিবুঁকি। দীর্ঘ শরীর একটু ঝুঁকে গেছে। কপালে স্পষ্ট দুটো ভাঁজ। শেষ কবে সুবীরকে দেখেছিল জয়া ! পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ... প্রায় বছর চার পাঁচ আগে। জয়াকে দেখে অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সুবীর।

জয়ার গলায় স্বর ফুটল না।

সুবীর আবার বলল, —দরকারটা খুব আরজেন্ট। তুমি একটু সময় দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে ?

সুবীরের গলা ভারী ভারী । ভাঙাও । বোধহয় মদ খাওয়া বাড়িয়েছে ।

—এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবে ? ওদিকে একটু চলো আমার সঙ্গে ।

—কোথায় ?

—মিউজিয়ামের ওপাশটায় ।

দুজনে বহুকাল পর পাশাপাশি হাঁটছে । বহুকাল আগে এভাবেই হাঁটত পাশাপাশি । এই মিউজিয়ামের সামনে দিয়েই । তখন জয়া ছিল এই কলেজেরই ছাত্রী । সেদিনকার হাঁটা আর আজকের হাঁটার মাঝখানে বিশাল একটা দেওয়াল উঠে গেছে । সময়ের । সময় কত কিছু নিয়ে চলে যায় । শুধু কি নিয়েই যায় ? রাখে না কিছুই ? জয়া বুঝতে পারছিল না । এই মানুষটা তার শরীর মন সংপৃক্ত করে রেখেছিল বহুদিন । কত প্রেম, কত যুদ্ধ, আনন্দ, বিষাদ । ...এই মানুষটাই নিষ্ঠুরের মত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন । হিংসায় পাগল হয়ে গিয়েছিল । কেন এমন হয় ? আজ যাকে মনে হয় ভালবাসি কাল সে অসহ্য হয়ে পড়ে ? তবে কি মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসে না ? অন্যকে ভালবাসা শুধুই শ্রান্তি ?

সদর স্ট্রিটের গির্জার সামনে সুবীর গাড়ি পার্ক করেছিল । সেখানে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে ।

সুবীর সোজাসুজি কথা পাড়ল

—বৃষ্টিকে নিয়ে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার ছিল ।

জয়া মুহূর্তে সচকিত । আবেগ নিমেষে উধাও ।

—কেন ? কি হয়েছে বৃষ্টির ?

—বৃষ্টি আমার সঙ্গে থাকতে চায় । খুব জেদ করছে । তুমি জান সেকথা ?

সুবীরের স্বর নয়, যেন সপাং করে একটা চাবুক আছড়ে পড়ল বুকে । জয়ার মুখ থেকে আপনাআপনি ছিটকে এল,

—মানে ?

—মানে তো সহজ । ও আমার সঙ্গে থাকতে চায় । রীতা রাজার সঙ্গে নয় । শুধু আমার সঙ্গে ।

শব্দগুলো গ্রহণ করতে জয়ার মস্তিষ্ক বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল । মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ করলেও ঠিক এতটা আশা করতে পারেনি । সেদিনের দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল । সেদিনের সেই পা দোলানো ... । কানে ওয়াকম্যান্ ... । এখন মনে হচ্ছে সেদিনই মেয়েকে শাসন করা উচিত ছিল ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের পর দিন মেয়ে বাড়ি ফিরতে আটটা নটা বাজিয়ে দিয়েছে আর সে বসে থেকেছে নিজের অভিমান নিয়ে। হায়রে, এই হিংস্র ক্রূর পৃথিবীতে কে কার অভিমানের খবর রাখে। জয়া বুকে একটা ভারী চাপ অনুভব করল।

—কবে থেকে এসব প্ল্যান শুরু করেছে?

স্থির থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও জয়ার গলা কেঁপে গেছে।

—জন্মদিনের দিনই প্রথম বলেছিল আমাকে। ও অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, আর কারুর কাস্টডিতে থাকতে বাধ্য নয়, যার সঙ্গে যেভাবে খুশি থাকবে।

অভিমান থেকে অপমানবোধ সঞ্চারিত হচ্ছে মনে। জয়া ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল

—আমি কি করতে পারি এখানে? আমাকে বলতেই বা এসেছ কেন? থাকুক যেভাবে খুশি।

—তুমি আমার কথাটা বুঝছ না। ও আমাকে নিয়ে একদম আলাদা থাকতে চায়। একদম আলাদা। রীতা রাজাও নয়। তুমি বুঝতে পারছ কথার মানেটা?

জয়ার বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ কোন তীব্র আঘাত পেলে বেশ খানিকক্ষণ স্নায়ু অসাড় হয়ে যায়। সেই অসাড়ভাব একধরনের নিরাসক্তি এনে দেয় মনে। চিন্তা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ে। জয়ারও ঠিক সেরকমই হল। পরিস্থিতি তবে এই। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তার বাবার সঙ্গে থাকতে চায়। বাবার অন্য স্ত্রী পুত্র আছে। মেয়ে বাবার সেই স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে থাকবে না। এখানে জয়ার ভূমিকা কি?

—সো? আমি কি করতে পারি?

জয়া নির্বিকার। কঠিন। মনের তোলপাড়ের টুঁটি নিজেই চেপে ধরে রেখেছে।

—তুমি জানোই তো বৃষ্টিকে আমি কত ভালবাসি। ও যখন আমার কাছে এসে থাকতে চাইছে ... আমার কি হেল্পলেস অবস্থা ...

নিরাসক্ত জয়া এবার কলে আটকে পড়া ইঁদুর দেখছে সামনে।

—মেয়েকে নিয়ে থাকতে চাইলে আবার ডিভোর্স করো। তারপর আবার সপ্তাহে একদিন করে ছেলেকে দেখে আসবে।

—এটা তুমি রাগের কথা বলছ। বৃষ্টিকে নিয়ে কি করা যায় তাই নিয়ে আমি তোমার কাছে সাজেশান চাইতে এসেছি।

—আমি বৃষ্টিকে নিয়ে তোমার সঙ্গে একটি কথাও বলতে রাজি নই। কোর্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকেই কাস্টডি দিয়েছিল, আমার দায়িত্ব ছিল, আছেও। কি করতে হবে না হবে আমি বুঝব।

কথাগুলো কেটে কেটে উচ্চারণ করল জয়া। মনে মনে বলল, ডিভোর্সের পর বিয়ে করার সময় মেয়েকে ভালবাসার কথা মনে ছিল না?

এতক্ষণে সুবীরও ধৈর্য হারাল,

—দায়িত্ব দেখিও না। মেয়ের কতটুকু খবর রাখো তুমি? কি করে বেড়াচ্ছে জানো? আমি তোমার কাছে এমনি এমনি এসেছি? বৃষ্টি প্রায়ই এসে আমার বাড়িতে উল্টোপাল্টা চেঁচামিচি করছে, যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছে সবার সঙ্গে, রীতার মুখের ওপর ফস্ করে সিগারেট ধরাচ্ছে, একদিন মদ খেয়ে ... ও মদ খায় সেটা তুমি জান?

সামনে থেকে এখখুনি মিউজিয়ামটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও জয়া বুঝি এত স্তম্ভিত হত না। এই কদিন আগেও যে মেয়ে তারই শরীরের অংশ ছিল, একটু একটু করে হামাগুড়ি দেওয়া থেকে চোখের সামনে আঠেরোয় পৌঁছল, সেই মেয়ে মদ খেয়ে ...! সুবীরের বাড়িতে গিয়ে হল্লা করছে!

—আমি বিশ্বাস করি না। সেভাবে আমি আমার মেয়েকে মানুষ করিনি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সুবীর হাত ওল্টালো। 'আমার মেয়ে' শব্দ দুটো তার কানে ঠক করে বেজেছে, এই তো সেই মানুষ করার নমুনা!

জয়ার গলা অল্প চড়ল— অমানুষ হয়ে থাকলে তোমার প্রশ্রয়েই হয়েছে। আমাকে জব্দ করার জন্য দামি দামি জিনিস দিয়ে অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছ মেয়ের। টেপ চাইলে টেপ, ওয়াকম্যান চাইলে ওয়াকম্যান, জামাকাপড়ের কথা তো বাদই দিলাম। সপ্তাহে একদিন মেয়েকে দেখার নাম করে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা। এতদিন পর যেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়েছে, ওমনি...

সুবীর মাথা নিচু করল। হয়ত জয়া ঠিকই বলছে। মেয়েকে দামি জিনিস দেওয়ার পিছনে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার অনুভূতি ছিল না তা নয়। কিন্তু সত্যি সত্যি দিতেও তো ইচ্ছাও করত তার। খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করত মেয়েটাকে। আবার সেই মেয়ে যখন সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়...।

একটা ইচ্ছার সঙ্গে আরেকটা ইচ্ছা কেন যে ঠিকঠাক মিলতে চায় না! দুটো চাওয়া যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে তবে মাঝের মানুষটা শুধুই পুড়তে থাকে। এ এক অসহায় দহন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবীর প্রাণপণে নিজের গলা নরম রাখতে চাইল,

—জয়া, আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি ? আমরা ? বৃষ্টির মা বাবা ?

জয়াও নিজেকে শান্ত করল। বুকের মধ্যে ঝোড়ো বাতাস তবু বয়েই চলেছে।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি যাতে বৃষ্টি অন্য কারুর সংসারে অশান্তির সৃষ্টি না করে।

'অন্য কারুর' শব্দ দুটো কি বেশি জোর দিয়ে বলল জয়া ? অন্য কেউ কে ? সুবীর ? নাকি রীতা, রাজা ? সুবীর বুঝতে পারল না।

গাড়িতে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসেছে। স্টার্ট দেওয়ার আগে ভদ্রতা করল,

—কোন দিকে যাবে ?

এখন কোন দিকে যে যাবে জয়া ?

—তুমি যাও, আমার কাজ আছে।

সূর্য হেলে পড়েছে ময়দানের দিকে। প্রথম বিকেলের সাদাটে সূর্য। ক্রমশ তাপ ফুরিয়ে আসছে। তবু শেষবারের মত ভাস্বর। জয়ার মুখেও সেই পড়ন্ত বেলার রোদ। উল্টোদিকের ফুটপাথে ভিখারি পরিবারের শিশুরা উদ্দাম ছোটাছুটি করে চলেছে। রাস্তায় অবিশ্রান্ত পথচারীদের আসা যাওয়া। চৌরঙ্গিপাড়া নিজস্ব নিয়মে শব্দময়।

এত আলো এত শব্দ সবই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে জয়ার কাছে। শরীরটা টেনে টেনে চলার চেষ্টা করল। কখনও কখনও নিজেরই শরীর নিজের কাছে এমন ভারী হয়ে যায়! কলেজের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটুক্ষণ। এগজিবিশনে যাওয়ার আর স্পৃহা নেই। কি করবে এখন ? কোথায় যাবে ? হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মুখ বাড়িয়েছে, —কোথায় যাবেন ?

দু এক মুহূর্ত মাথাতেই এল না কিছু। মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা। ঠোঁট দুটো শুধু নিজে থেকে বলে উঠল,

—দেশপ্রিয় পার্ক।

সমস্ত অভিমান, অপমান ক্রোধ হয়ে আছড়ে পড়ল কলিংবেলে।

সুধা দরজা খুলেছে।

—ব্যাপারটা কি ? এতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ না ? এই আওয়াজের মধ্যে শোনা যায় কিছু ? একদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই ঝড় তুলে দিয়েছে।

এতক্ষণে জয়ার মস্তিষ্কে ঢুকেছে। উন্মত্ত হেভি মেটাল চলছে বাড়িতে। বাজনার তোড়ে গোটা বাড়ি থর থর।

কাঁধের ব্যাগ ডাইনিং টেবিলের দিকে ছুড়ে দিয়ে জয়া মেয়ের ঘরে ঢুকেছে। উৎকট ধোঁয়ার গন্ধে ঘরটা ভরপুর। বৃষ্টির হাতে সিগারেট। দুটো পা দেওয়ালে তুলে মেয়ে চোখ বুজে অশোভন ভঙ্গিতে শুয়ে। বাজনা শুনছে।

জয়া স্টিরিও বন্ধ করে দিল।

বৃষ্টি তাকিয়েছে।

—সিগারেটটা ফ্যালো।

বৃষ্টি পাকা নেশাড়ুর মত জোরে জোরে টান দিল দুবার। বুকে ধোঁয়া ভর্তি করে নিল। তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুড়ে দিল জানলার বাইরে।

—কবে থেকে এসব বাঁদরামি শুরু হয়েছে ?

বৃষ্টি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

—কি হল শুনতে পাচ্ছ না ? আমি তোমাকে বলছি। এসব কবে থেকে শুরু করেছ ? নেশা— ভাং, মদ, গাঁজা ...?

বৃষ্টি নিরুত্তর।

—তোমার বাবা আজ আমার কলেজে এসেছিল।

এতক্ষণে বৃষ্টির চোখে ভাষা এসেছে। বিস্ময়।

—তুমি তোমার বাবাকে গিয়ে বিরক্ত কর ?

বৃষ্টি চোয়াল শক্ত করল। জয়ার দিকে তাকাচ্ছে না। চোখ দেওয়ালের ক্ষতস্থানগুলোর দিকে।

—তোমার বাবা বলছিল তুমি নাকি ড্রিঙ্ক করে ও বাড়িতে যাও ?

বৃষ্টি তবু চুপ। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। মুখ করমচার মত টকটকে লাল।

—তোমার বাবা বলছিল ...

—তুমি আমার সম্পর্কে বাবার সঙ্গে কথা বলার কে ?

আগ্নেয়গিরির মুখ খুলেছে।

—তোমার মা-বাবা তোমাকে নিয়ে সব সময় কথা বলতে পারে।

—মা ? বাবা ? কে তারা ? বাবা বউ বাচ্চা নিয়ে আরামে সংসার করছে ; মা শিল্পের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে ! নিজেরা নিজেদের মত ফুর্তি করো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গে যাও , আমাকে আমার মত থাকতে দাও ।

—আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছিস তুই ? আমি ফুর্তি করি ? একটা ছবি আঁকার পেছনে কত যন্ত্রণা, কত নিষ্ঠা ...

—বেশি যন্ত্রণা ফন্ত্রণা দেখিও না । এসব যন্ত্রণা নিষ্ঠার কথা আমাকে জন্ম দেওয়ার সময় মনে ছিল না ?

চিৎকার শুনে বাবলু হুইল চেয়ার ঠেলে দরজায় এসেছে,

—হচ্ছেটা কি এখানে ? অ্যাই বৃষ্টি চুপ কর ।

—কেন চুপ করব ? আমাকে নিয়ে ঢং দেখিয়ে দুজনে আলোচনা করছে !

—মার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলছিস ?

—মা দেখিও না । মাকে মার মত হতে হয় । বাবাকে বাবার মত ।

মেয়ের মূর্তি দেখে জয়া বিমূঢ় । এই মেয়ের জন্য দিনের পর দিন মামলা লড়েছিল সে ! এই পরিণতি দেখার জন্য বড় করেছে ! মেয়ে মার দিকে আঙুল তুলে জবাব চাইছে ! এই সেই শান্ত বিনীত বৃষ্টি ! চোখে জল এসে যাচ্ছিল, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে কোনরকমে সামলালো জয়া,

—তুই বাবার কাছে গিয়ে থাকতে চাস ? বাবার সংসারে অশান্তি শুরু করেছিস ? রীতাআন্টিকে অপমান করিস এত স্পর্ধা তোর ? এই শিক্ষা পেয়েছিস ছোটবেলা থেকে ?

—শিক্ষা দেওয়ার তোমার সময় ছিল ? আমার যা ইচ্ছে তাই করব । যা খুশি তাই করব । আমার আঠেরো বছর বয়স হয়ে গেছে । তোমার গার্জেনগিরির পরোয়া করি না আমি ।

—বেরিয়ে যা । এখখুনি বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে । বদমাইশ মেয়ে কোথাকার ।

—কেন ? বেরোব কেন অ্যাঁ ? জন্ম যখন দিয়েই ফেলেছ তখন বেরিয়ে যা বললেই হবে ? জন্মে যখন গেছিই যা চাইব তাই দিতে হবে । যেভাবে চাইব সেভাবে । হয় তুমি দেবে, নয় বাবা ।

জয়ার সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল । ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়ের ওপর । চুলের মুঠি ধরে সপাটে চড় মেরেছে মেয়ের গালে । মেরেই চলেছে ।

সুধা দুহাতে চেপে ধরে বাইরে টেনে আনল জয়াকে ।

চড় খেয়ে বৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব । এই তার জীবনের প্রথম মার খাওয়া । বাবলুও দরজার সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর ঘুরে গিয়ে ব্যাগ থেকে সিগারেট বার করল । স্টিরিও চালিয়ে দিল ফুল ভল্যুমে । ম্যাডোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে, পাপা ডোন্ট প্রিচ্ ....

॥ ১২ ॥

মার সঙ্গে ওরকম বিশ্রী ভাষায় কথা বলার পর সারা রাত ঘুমোতে পারল না বৃষ্টি। উদ্দাম বাজনা শেষ হওয়ার পর, রাগ ঝিমিয়ে পড়ল একটু একটু করে। কেন যে ওরকম অশালীন হয়ে পড়ল! মা কি তার জন্য কম করেছে এতদিন! মা'ও তো একটা বিয়ে করে ফেলতে পারত, তা না করে এত পরিশ্রম করেছে, সে তো শুধুই তার কথা ভেবে। বৃষ্টি ঠিক করল সকালে উঠেই মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মত বদলে যেতে শুরু করল। অন্য বৃষ্টিটা ছায়া ফেলতে শুরু করল তার মনের ওপর। সেই বৃষ্টি একটা কথাই ভাঙা রেকর্ডের মত কানে বাজিয়ে চলেছে, বৃষ্টি, তুই কি মূর্খ। মা তোকে নিয়ে ভিন্ন হয়েছিল তোর বাবার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে চায় বলে। পরিশ্রম শুধু মেয়ের জন্য করেনি, করেছে নিজেরই প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতির জগৎ বিস্তার করার জন্য। যদি তোর মা তোকে সত্যিই ভালবাসত, তবে কি তোর মার দিনগুলো, সন্ধেগুলো সবই চলে যেত বন্ধু বান্ধব, ছাত্রছাত্রী, ক্যানভাসের দখলে? মনে করে দেখ, কবে তোর মা শুধু তোকে নিয়েই একটা পুরো দিন কাটিয়েছে! বৃষ্টি মন দিয়ে সেরকমই একটা দিন খোঁজার চেষ্টা করল। নেই। সত্যিই সেরকম দিনের অস্তিত্ব নেই বৃষ্টির জীবনে।

যদি সেরকম দিন না'ই থাকে, তা হলে ওই নির্লজ্জ ভদ্রমহিলা তার ওপর জোর ফলায় কোন অধিকারে? ভাবে কি করে সে'ই বৃষ্টির সমস্ত চিন্তা কর্ম ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা?

অনুতাপ ক্রমশ ক্ষোভে, ক্ষোভ ক্রমশ রাগে পরিণত হচ্ছিল বৃষ্টির। বাবার চেহারা মনে পড়তেই রাগ রূপ নিল আক্রোশের। বাবা কিনা শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে চুকলি খেল মার কাছে? মেয়ের একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টাকেও বরদাস্ত করার শক্তি নেই? অথচ মুখে কত বড় বড় ভালবাসার কথা! কোন স্তরে নেমে গেছে তার বাবা?

টানা তিন দিন বাড়িতে শুয়ে রইল বৃষ্টি। উৎকট দেওয়াল আর লোহার গরাদের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এ বাড়িতে সে আর থাকবে না। যেখানে থাকলে প্রতিনিয়ত শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরক্তি আর ক্রোধের সঞ্চার হয়, সেখানে থাকার থেকে না থাকাই ভাল। সুবীরের বাড়িতেও সে আর জীবনে পা রাখবে না। সব থেকে ভাল হয় যদি কোথাও একটা আস্তানা জোটানো যায়। পেয়িংগেস্ট হয়ে। অথবা কোন হোস্টেল টোস্টেলে।

বৃষ্টির মনে পড়ল দাদু তার নামে কিছু টাকা ফিক্সড্ ডিপোজিট করে গিয়েছিলেন। সে এখন মাইনর নয়, ইচ্ছে করলেই সে টাকা তুলে ফেলতে পারে। যত দিন না লেখাপড়া শেষ করে চাকরি বাকরি জোগাড় করা যায় ওই টাকাতে কি কোনক্রমে চলবে না? না হয় টিউশ্যনি ধরবে গোটাকয়েক। দেবাদিত্য অনেক টিউশ্যনি করে, নিশ্চয়ই দুচারটে জুটিয়ে দিতে পারবে তাকে।

যেদিন প্রথম বাড়ি থেকে বেরোল, সেদিনই খবরের কাগজ থেকে টুকে নিয়েছে দুটো 'পেয়িংগেস্ট চাই' এর ঠিকানা। একটা বেহালায়, অন্যটা ঢাকুরিয়ায়। কলেজে এসেই দেবাদিত্যকে বলল,

—আমাকে কয়েকটা টিউশ্যনি জোগাড় করে দে তো।

দেবাদিত্য হাঁ করে দেখছিল বৃষ্টিকে,

—তুই টিউশ্যনি করবি! কেন বস, গরীবদের বাজার মারবে কেন?

—ফাজলামি নয়, আমি সিরিয়াস। আমার ভীষণ দরকার। আরজেন্ট।

—রেজিস্ট্রি ফেজিস্ট্রি করে ফেলেছিস নাকি? ছেলেটা কি মীনাক্ষির হিরোর মত? চাকরি বাকরি করে না?

বৃষ্টি খেপে গেল। মানুষের যত বিপদই হক, দেবাদিত্য কিছুতেই ঠাট্টার মোড়কের বাইরে আসতে পারবে না। এরকম বন্ধু থাকার থেকে না থাকাই ভাল। বৃষ্টি দেবাদিত্যর সঙ্গে সারাদিন আর একটি কথাও বলল না।

কলেজ থেকে বৃষ্টি তৃষিতার সঙ্গে বেরোল। বাস স্টপে এসে তৃষিতা বলল, —চল, আমাদের বাড়িতে চল। আমার এক কাকা এসেছে, নেভিতে চাকরি করে, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প বলে ...

বৃষ্টি বলল, —নারে, আমার কাজ আছে।

—ছাড় তো তোর কাজ। কাজ মানে তো শুভর সেই বস্কুটার বাড়িতে আড্ডা।

—কে বলেছে তোকে?

—শুভই বলছিল। তৃষিতা চোখ ঘোরাল, —আমি বলছি বৃষ্টি ওই রাজীব ছেলেটা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়, রণজয় বলছিল ওর বাবার নাকি অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিশি ব্যাপার আছে।

বৃষ্টি শুভর ওপর বিরক্ত হল। শুভ কোন কথাই কি ঘোষণা না করে থাকতে পারে না ? মুখে বলল,

—তোর মামা নিশ্চয়ই কয়েকদিন থাকবে। অন্য দিন যাব, আজ সত্যিই একটা কাজ আছে।

তৃষিতা কাঁধ ঝাঁকিয়ে এসপ্ল্যানেড-এর ট্রামে উঠে পড়ল। তৃষিতার ভাব ভঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা যায় সে বৃষ্টির কথা বিশ্বাস করেনি।

দুটো ঠিকানার মধ্যে ঢাকুরিয়াতেই আগে যাবে বলে ঠিক করল বৃষ্টি। ঢাকুরিয়া সে মোটামুটি চেনে, মাধ্যমিকের সময় ওখানে একটা টিউটোরিয়ালে যেত সে। তাছাড়া সুবীরের বাড়িও তো ঢাকুরিয়ার কাছেই।

ঠিকানা খুঁজে, বাড়িটা বার করতে বৃষ্টির খুব একটা সময় লাগল না। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, সামনে অল্প ফাঁকা জায়গায় ফুলের বাগান, দেখেই বৃষ্টির বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

কলিংবেল বাজাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। লোহার জাল দেওয়া দরজার ওপার থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কাকে চাই ?

—আপনি কি শশধর দত্ত ? যিনি কাগজে পেয়িংগেস্টের অ্যাড় দিয়েছিলেন ?

ভদ্রলোক দরজার তালা খুলে বৃষ্টিকে ঘরে এনে বসালেন।

—কে থাকবেন ? আপনি ... মানে তুমি থাকবে ? ডোন্ট মাইন্ড, আমি তোমার থেকে বয়সে অনেক বড় বলে তুমি বলছি।

বৃষ্টি এরকম জেঠুসুলভ কথাবার্তা একদম সহ্য করতে পারে না, তবু শান্তভাবে বলল, —হ্যাঁ, আমিই।

—তুমি কি চাকরি করো ?

—না, স্টুডেন্ট। ফার্স্ট ইয়ার।

—এখন আছ কোথায় ?

—দেশপ্রিয় পার্ক।

—তোমার বাবা মা ?

গোড়াতেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আঠেরো বছরের বৃষ্টি ভাবতেও পারেনি। মাস গেলে টাকা নেবে, বিনিময়ে থাকতে দেবে, এতে এত জেরার কি আছে ! একটু তীক্ষ্ণ গলাতেই বৃষ্টি উল্টো প্রশ্ন করল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন বলুন তো ?

—বাহ্। যাকে থাকতে দেব তার সঙ্গে ভালমত আলাপ পরিচয় করব না ?

বৃষ্টি এক মুহূর্ত ভেবে নিল। তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে বলল,

—আমি দেশপ্রিয় পার্কে মার সঙ্গে থাকি। বাবা যোধপুর পার্কে। আলাদা।

ভদ্রলোক সামান্য থতমত খেলেন। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন, —ওয়েল, সে তোমাদের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। আমার তাতে আগ্রহ নেই। আমি শুধু দুটো ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। এক, মাসে বারোশ টাকা পড়বে, তুমি দিতে পারবে ? যদি পারো তোমার সোর্স অফ্ ইন্‌কাম কি ? দুই, তোমার বাবা মার নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নেই, আমি কি সেটা কোনভাবে কনফার্ম করতে পারি ?

—বাবা মার মতামতের কি দরকার ? আমি তো অ্যাডাল্ট।

ভদ্রলোক হাসলেন, —অ্যাডাল্ট হলেই কি বাবা মার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যায় ? তাছাড়া তুমি সত্যি বলছ কিনা সেটাও তো আমাকে ভেরিফাই করতে হবে।

বৃষ্টির ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। বাসস্ট্যান্ডে এসে রাগে অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করল সে। পেয়িংগেস্ট থাকতে গেলেও বাবা মার ওপর নির্ভর করতে হবে তাকে ? হোস্টেলে গেলে হয়ত ঠিকুজি কুষ্ঠিই চাইবে। একটা স্বাধীন দেশের প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের একা থাকার এতটুকু স্বাধীনতা নেই ? বাবা মা তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না ?

বেহালার ঠিকানায় যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ বৃষ্টি হারিয়ে ফেলল। মনেও নেই কখন চলে গেছে রাজীবদের ফ্ল্যাটে।

বৃষ্টি এ কদিনে জেনে গেছে এই ফ্ল্যাটের আড্ডায় গাঁজা মদ ছাড়াও চরস, মারিজুয়ানা, নেশার ট্যাবলেট সবই চলে। যে সব ছেলেমেয়েরা আসে, তারা সবাই প্রায় এসব নেশায় অভ্যস্ত। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের পরিবারেই বৈভবের অভাব নেই, ফলে ছেলেবেলা থেকেই সুখ, আনন্দের অনুভূতিগুলো এদের অনেক ভোঁতা। নেশার মাধ্যমে সেই ভোঁতা অনুভূতিগুলোতেই কৃত্রিমভাবে শান দেওয়ার চেষ্টা করে সবাই। বৃষ্টি শুনেছে রাজীব কখনও কখনও বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিষিদ্ধ ছবিরও আসর বসায়। সুদেষ্ণার কাছে ওই সব জান্তব ছবির বর্ণনা শুনেছে সে। ও ব্যাপারে বৃষ্টির কণামাত্র আগ্রহ নেই, সে যায় শুধুই নেশার তালিম নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি আবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। রাজীবের ফ্ল্যাটটাই হবে এখন থেকে তার সন্ধেবেলার স্থায়ী ঠিকানা।

॥ ১৩ ॥

ভয়ংকর ভূমিকম্পের ইঙ্গিত প্রথম টের পায় পশুপাখি, জীবজন্তুরা। হয়ত তাদের প্রাকৃতিক অসহায়তার জন্য অথবা মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়ার জন্য। এই অপূর্ণতা থেকেই জন্ম নেয় এক প্রখর অনুমানশক্তি। সেই অনুমানশক্তি দিয়েই বাবলু বুঝতে পারছিল জয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সেদিনের বাগবিতণ্ডা দুর্যোগের পূর্বাভাস মাত্র। প্রকৃত দুর্যোগ সামনে আসছে। দিদি যদি একটু সময় দিত বৃষ্টির জন্য ? অন্তত বাবা মা চলে যাওয়ার পর ? তবে জয়াকেও সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় কি ? সৃষ্টিশীলতার কিছু নিজস্ব ধর্ম আছে, সৃজনশীল মানুষ এক অর্থে স্বার্থপরও বটে। আত্মকেন্দ্রিক।

বিষুব রেখা থেকে শুরু করে দুজন মানুষ যদি দুই মেরুর দিকে হাঁটতে শুরু করে, তবে তারা কোনদিন মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু যদি তারা পাশাপাশি দুটো রেলের লাইন ধরে হেঁটে চলে তবে তারা হাঁটতেই থাকে অনন্তকাল, মেলে না কখনই, দূরত্বও কমে না এক চুল। সুবীর আর জয়ার সম্পর্কটা সেরকমই ছিল। একই পৃথিবীতে এরকম দুজন মানুষ থাকতেই পারে কিন্তু একই ছাদের নিচে এদের স্থান হওয়া কঠিন, এক বিছানায় দুর্বিষহ। এই ধরনের নিকটতম সম্পর্কের মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে থাকে। যে বিষিয়ে ওঠা সম্পর্কের থেকে বীজের আবির্ভাব, সেই সম্পর্কের ছায়া তো বীজের ওপর পড়বেই। সেই ছায়াই বোধহয় ফুটে ওঠে পরবর্তী প্রজন্মের অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে। তাই কি বাবলুর পাশে বসে থাকা ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ একদিন পাল্টে যায় ?

মাঝে মাঝে বাবলুর খুব অবাক লাগে। এই কি সেই বৃষ্টি, যাকে পাশে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বারান্দায় বসে থাকত ! ছোট্ট মেয়ে চুপ করে মামার হাত আঁকড়ে পড়ন্ত বিকেলে তাকিয়ে থাকত সামনের সবুজ গালচেটার দিকে ! কোন শব্দ উচ্চারণ না করে তারা পরস্পরের সঙ্গে কত কথাই না বলে ফেলত। নীরবতাও কখনও কখনও শব্দের চেয়ে বেশি মুখর হয়ে ওঠে। কোন কোনদিন প্রশ্নের বান ছোটাতো মেয়েটা,

—রেড সোর্ডটেল আর গাপ্পি এত আলাদা দেখতে হয় কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ডোডো পাখি কোথায় থাকে ভালমামা ?

—ক্যাঙারুদের কেন বাচ্চা বয়ে বেড়ানোর থলি থাকে পেটে ? মানুষের কেন থাকে না ?

—ভালমামা, তুমি এত ইতিহাস পড়ো কেন ?

—পেরেন্টস ডে'তে খালি দিদা যায় কেন ? দিদা কি আমার পেরেন্ট ?

মেয়েটা কি হঠাৎ বদলেছে ? বোধহয় হঠাৎ নয়। বাবলুর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মন বলে, এটা বদল নয়, ভাঙন। পাহাড়ের ধসের মত। পাহাড়ে ধস তো আকস্মিকভাবে নামে না, ভূমিক্ষয় শুরু হয় অনেক আগে থেকে।

জয়া মিনমিন করে,

—আমার তো কোনদিন সেভাবে চোখে পড়েনি। দিব্যি হাসিখুশি ছিল ! হয়ত নিজেকে নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত ! হয়ত একটু বেশি জেদি !

বাবলুর হাসি পায়। যারা শাসন করে তারা যে কখন শাসিতের বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেয়, নিজেরা জানতেও পারে না। পূর্ব ইউরোপের চেহারাটা এখন কি ? পাঞ্জাব ? কাশ্মীর ? রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা সত্যি সমাজের ক্ষেত্রেও তাই। পরিবার বা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে কি করে ?

বাবলু আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। এগারোটা। বৃষ্টি এখনও বাড়ি ফিরল না। আজকাল রোজই তো রাত করে ফেরে, তবে সেও বড় জোর সাড়ে নটা, দশটা। এত রাত তো হয়নি কোনদিন ! গেল কোথায় ! বাবলুর দুশ্চিন্তা বাড়ছে ক্রমশ। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য বাবলু একটা ম্যাগাজিন খুলল। রাত নির্জন হয়ে আসছে, ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ ট্রামটাও বোধহয় চলে গেল। রান্নাঘরে সুধা বাসনপত্র নাড়ানাড়ি করছে, গোটা বাড়ির নিস্তব্ধতার মধ্যে সামান্য শব্দও বড় কানে লাগে।

সন্ধে থেকেই বাড়ি থমথম করে আজকাল। এতদিনকার নেশা টিভিটাকেও বাবলু আজকাল বন্ধ রাখে। মনে চাপ থাকার জন্য সময়টাকে বড় দীর্ঘ মনে হয় তার। কোন কোনদিন সুধা নিঃশব্দে বাবলুর ঘরে এসে দাঁড়ায়,

—তোমাকে খেতে দেব দাদাভাই ?

বাবলু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে,

—দিদি কোথায় ?

—ওপরে। সুধা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে, —বাড়ি ফিরে ইস্তক তো ছাদেই দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সুধা হা হুতাশ করে, —বিশ্বাস করবে না দাদাভাই, মেয়েটার ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে কি বিচ্ছিরি গাঁজার গন্ধ বেরোয় গো। ঘরে ঢুকলেই গা গুলিয়ে বমি উঠে আসে।

—দিদি ঢোকে ও ঘরে ?

—কই আর ঢোকে। রোজই তো মেয়ে না ফেরা পর্যন্ত ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়ে ফিরলে চলে যায় ছবি আঁকার ঘরে। রাতভর হিজিবিজি টানে আর কাটে, কাঁদে বসে বসে। দিদির মত মানুষকে কখনও ওভাবে কাঁদতে দেখিনি গো !

বাবলু চুপ করে থাকে। দিদির বোধহয় এ কান্নাটা পাওনা ছিল। কান্না নয়, শাস্তি।

ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রেখেই বাবলু টের পেল একটা পায়ের শব্দ প্যাসেজে ঘোরাফেরা করছে। তার দরজা অবধি এসেও ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত তার ঘরে ঢুকেছে।

ঘরে ঢুকেও জয়া দাঁড়িয়ে রইল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর দ্বিধাজড়িত প্রশ্ন করল,

—তোর কাছে বৃষ্টির কোন বন্ধুর ফোন নাম্বার টাম্বার আছে ? মানে অনেকে তো ফোন টোন্ করে, তুই তো মাঝে মাঝে ধরিস ...

যতটা পঙ্গু তার থেকে নিজেকে দশগুণ বেশি পঙ্গু মনে হল বাবলুর। সে তো আর রাস্তায় বেরিয়ে খোঁজখবর করতে পারবে না। কারুর কোন সাহায্যেই সে আর আসবে না। সে এখন একটা ভগ্নস্তূপ, দু যুগ আগের একটা অশান্ত সময়ের স্মৃতিফলক মাত্র। নিজের শীর্ণ পায়ের দিকে তাকিয়ে ছটফট করা ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই। অথচ কত কিছু তার হওয়ার কথা ছিল। ইন্‌জিনিয়ার, গ্লোব ট্রটার, বিপ্লবী। এক নিমেষের ভুলে ... !

দিদির দিকে বাবলু ম্লান মুখে তাকাল,

—সুবীরদাকে একটা টেলিফোন করব ? যদি ওখানে গিয়ে থাকে ?

কথাটা জয়ার মাথাতে আসেনি তা নয়। যদি সত্যিই ওখানে গিয়ে থাকে, তবে সেটা জয়ার পক্ষে আরও বেশি অসম্মানজনক। মুখে বলল, —না থাক। অন্য কারুর নাম্বার থাকলে দ্যাখ।

বলেই দু এক মিনিট কি ভাবল জয়া, আবারও বলল, —ছেড়ে দে। কাকে আর রাত্তিরবেলা ... কোথায় আর যাবে ? মিছিমিছি অন্যদের ব্যস্ত করা।

সুধা জয়ার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে হঠাৎ হাউমাউ করে উঠল,—যেভাবে ছুটে ছুটে রাস্তা পার হয় ! কোনদিকে তাকায় না ! দিদি তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং একবার থানাতেই ...

—এমন কিছু রাত হয়নি এখনও। সবে সাড়ে এগারোটা। এমনিতেই তো দশটা বাজায়। জয়ার গলায় হাল্কা ধমক। ধমক ? না সান্ত্বনা খোঁজা ?

জয়া বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ সময়ে রাতের দিকে তাও একটু ঠাণ্ডা বাতাস ওঠে, আজ যেন পৃথিবীও দম বন্ধ করে আছে। দূরে বড় রাস্তার বাতিগুলো টিমটিম। জয়ার চোখ অনেক দূর অবধি দেখার চেষ্টা করল। কোথায় গেল মেয়েটা ?

বাবলুও পিছন পিছন বাইরে এসেছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল,

—তুই সেদিন ওকে মারধোর না করলেই পারতিস।

এ কথাটা তো জয়াই নিজেকে বলতে চেয়েছে রোজ। তবু বাবলুর মুখ থেকে শুনে ধক করে লাগল বুকে। আপনাআপনি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল,

—তুই তো সামনে ছিলি। ওভাবে অপমান করার পরও যদি কিছু না বলি...

—অপমান তো আমাকেও করে। সব সময়। আমার সামনে সিগারেট ধরিয়ে...

—তুই জানতিস বৃষ্টি সিগারেট খায় ! আমাকে বলিসনি তো ! কবে থেকে ?

—সে অনেক দিন। মাস দুয়েক তো হবেই। ভাবলাম কি জানি এটাই হয়ত এখনকার রেওয়াজ। আমি তো আর তোদের এখনকার নিয়মকানুন জানি না। ওর বয়সী মেয়ে সিগারেট খাবে, রাত করে বাড়ি ফিরবে, ঝাং ঝাং করে বাজনা চালাবে, আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, তার মা কিছুই দেখবে না, এটাই হয়ত এখনকার কাস্টম্।

বাবলুর বাঁকা বাঁকা কথায় জয়ার মুখে কাতরভাব। এ সব কথা এখন বাবলু না বললেই পারত ! ভাবতে ভাবতেই জয়ার পিঠ টানটান। বৃষ্টি ফিরছে না ! ল্যান্সডাউনের দিক থেকে ! হ্যাঁ, বৃষ্টিই তো।

বাবলুও দেখেছে বৃষ্টিকে।

বৃষ্টি হনহন করে হেঁটে আসছিল, সিঁড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল,

—সরি ভালমামা, এক বন্ধুর বাড়িতে আটকে গেলাম, ওদের ফোনটাও খারাপ।

বৃষ্টির হাঁটা অসংলগ্ন। এক হাতে বারান্দার থাম ধরে আছে, যেন সংযত করছে নিজেকে। বাবলুকে নয়, যেন বিবেকের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছে। যাত্রাদলের বিবেক। যে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, পাত্রপাত্রীদের ওপর যার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা নেই, এমনই এক অকর্মণ্য অস্তিত্ব মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবলু একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না, শুধু সে দেখছিল বৃষ্টি কিভাবে ভেতরে ঢুকতে গিয়েও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল। জয়াকে দেখতে পেয়েই গলা কঠিন হয়েছে,

—ডোন্ট মাইন্ড ভালমামা, এরকম আমার হবে। সামটাইম সামটাইম।

বৃষ্টির গলা কি ঈষৎ জড়ানো! বাবলু বুঝতে পারল না। শুধু বুঝতে পারল কথাটা তাকে নয়, জয়ার উদ্দেশে বলা। বাবলু এখানে যাত্রাদলের বিবেক নয়, যাত্রাদলের সঙ্।

জয়া কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিল না। গভীর আতঙ্ক তার ক্রোধকে ছাপিয়ে গেছে। একটা হাঁটু কাঁপানো, শিরদাঁড়া নুইয়ে দেওয়া ভয়। এই মেয়েকে সে এখন সামলাবে কি করে?

জয়া পালিয়ে যাওয়ার মত দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। সামনে সুধা দাঁড়িয়ে। সুধার চোখেও চোখ রাখতে পারল না জয়া।

॥ ১৪ ॥

কদিন ধরেই করবীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই বিকেলের দিকে ঘুসঘুসে জ্বর। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘুরে যায়। ডাক্তার বলেছেন, অ্যাকিউট্ অ্যানিমিয়া, হিমোগ্লোবিন কমে গেছে, বেশ কিছুদিন টানা বিশ্রাম নিতে হবে। সঙ্গে ওষুধ, টনিক।

ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে পিকলুর সঙ্গে মার শরীর নিয়ে আলোচনা করছিল সায়নদীপ। বেশি বয়সে চাকরিতে ঢুকে মার খুবই কষ্ট হচ্ছে। এবার সায়নের একটা কাজ জোগাড় করে ফেলা উচিত।

পিকলু বলল— তোমার খেলার কি হবে?

চৈত্র মাসের সেলের বাজার এতক্ষণ গমগম করছিল দুদিকের ফুটপাতে। পসারিরা এখন একে একে দোকান গোটাচ্ছে। সারাদিন সাংঘাতিক গুমোটের পর সন্ধ্যা থেকে আকাশ রক্তবর্ণ। সেদিকে এক ঝলক তাকিয়ে সায়ন উদাস,

—ক্লাবে গোপালদা বলছিলেন স্পোর্টস কোটায় রেলে চান্স পাওয়া যেতে পারে। তবে তখন আর রঞ্জিতে বেঙ্গল খেলার কোন স্কোপ্ থাকবে না।

—কেন? রেলওয়েজের হয়েও তো খেলা যায়?

—যায়। কম্পিটিশান খুব টাফ্ হয়ে যাবে। অল ইন্ডিয়া ব্যাপার তো। এমনিতেই বেঙ্গলের প্লেয়ারদের ওরা তেমন পোঁছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—সেটা ঠিক। এখানে থাকলে নেক্সট্ ইয়ারে তোমার চান্স শিওর ছিল।

—চেষ্টা করলে ওখানেও চান্স করে নিতে পারব। পারতেই হবে। এখনও আমার ব্যাক্‌লিফ্‌টে গণ্ডগোল রয়ে গেছে। কিছুতেই সোজা ব্যাট নামাতে পারছি না। মন্টুদা বলছিলেন আড়াআড়ি ভাবে যদি...

আচম্বিতে দমকা হাওয়া উঠল। ধুলোর ঝড়ে নিমেষে রাস্তাঘাট ঝাপসা হয়ে গেছে। সোঁও সোঁও আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে ধুলোবালি। কাগজের টুকরো, শালপাতা, প্লাস্টিক ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। চোখে মুখে সূচের মত বিঁধছে ধুলোর ঝড়। লোকজন এলোমেলো দৌড়তে শুরু করেছে। সায়ন পিকলু দুজনেই চোখ বুজে ফেলল।

ঝটকা হাওয়ার সঙ্গে আলোগুলোও নিভে গেল আচমকা। কোথাও তার-ফার ছিঁড়ল বোধহয়। তালবেতাল বাতাসে সারাদিনের গুমোট ভাব কেটে গেছে পুরোপুরি। বছরের প্রথম কালবৈশাখি এসেছে।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। আকাশচেরা আলোয় ঝলসে যাচ্ছে পথঘাট। সেই আলোতেই মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে পিকলু সায়ন চমকে উঠেছে। অদ্ভুত বেতালা পায়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে বৃষ্টি।

ঝড়ের ঝাপটায় একবার ডানদিক একবার বাঁদিকে টলে পড়েও টাল সামলাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। যেন রাস্তা নয়, ভরা বর্ষার নদী পার হতে চায় মেয়েটা।

সায়ন পিকলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বৃষ্টি সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। অন্ধকারে এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে বার বার। সায়নের গলা থেকে বেরিয়ে এল,

—একি! কি অবস্থা মেয়েটার!

পিকলু সায়নের হাত ধরে টানল। সে এ সমস্ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়। পাড়ার সবাই জানে বৃষ্টি এখন পুরো বখে গেছে।

—যেতে হবে না। যত সব ঝুটঝামেলা। কি ব্রাইট ছিল মেয়েটা, কি হয়ে গেল! মাল-ফাল টেনেছে বোধহয়।

সায়ন তবু এগোল পায়ে পায়ে,

—মেয়েটাকে তো দেখছি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার। এভাবে রাস্তার মাঝখানে ফেলে...

—আমি নেই। উড়ন্ত ধুলো আটকাতে পিকলু হাতে মুখ আড়াল করল, —কে যাবে বাবা আগ বাড়িয়ে? ওর যা মেজাজ!

—তাবলে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ছাড়ো তো, ও ঠিক পৌঁছে যাবে। ওস্তাদ মেয়ে। প্রায়ই তো আজকাল এই দশা হয়।

সায়ন আশ্চর্য হয়ে গেল। পিকলু না বৃষ্টির ছেলেবেলার বন্ধু! এরকম সঙ্গীন অবস্থায় কেউ বন্ধুকে ফেলে চলে যেতে পারে!

সায়ন একাই এগিয়ে গেল,

—বাড়ি যাবে তো?

বৃষ্টির ঘোরলাগা চোখ পিটপিট করে উঠল। যেন সায়নকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে। বাতাসের জন্য সায়নের কথাগুলোও কানে ভাল করে পৌঁছল না তার। তার কাছে এখন সবই অস্পষ্ট। আজই সে প্রথম নেশার ট্যাবলেট খেয়েছে।

সায়নের দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে বৃষ্টি স্খলিত প্রশ্ন করেছে,—আমার বাড়ি কোথায়?

ঝড় বাড়ছে। দু-চারটে বড় ফোঁটা পড়ল গায়ে। পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় পথচারিরা থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে সুন্দরী নেশাড়ু মেয়েটাকে।

সায়নের স্বরে ধমক এল,

—একটা কথাও নয় আর। চলো আমার সঙ্গে।

হাত ধরে টানতে টানতে মেয়েটাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে চাইল সায়ন।

কয়েক পা গিয়েও বৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়েছে,

—আমি তোমার সঙ্গে যাব কেন?

সায়ন কোন কথা বলল না। বিকট শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়ল। বাতাস আরও দামাল।

বৃষ্টি গলা চড়াল,

—তুমি এখানে কেন? গুড বয়রা তো এখন মায়ের আঁচল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। যাও, বাড়ি যাও। মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দ্যাখোগে।

বৃষ্টির একটা কথার সঙ্গে অন্য কথা মিশে যাচ্ছে। চড়া গলা ধীরে ধীরে খাদে নেমে গেল।

সায়নের কষ্ট হল মেয়েটাকে দেখে। মানুষ নিজেকে নিজে এভাবে ধ্বংস করে ফেলে কেন? ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা বাবার মুখটা দেখতে পেল সায়ন। শ্মশানের হাওয়ায় মুখ থেকে চাদর সরে গিয়েছিল একবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবারই। কী বীভৎস ক্ষতবিক্ষত মুখ! বর্শার খোঁচা লাগল সায়নের বুকে। মেয়েটার হাত সজোরে চেপে ধরেছে,

—কেন এভাবে নিজেকে নষ্ট করছ? তোমার মত ব্রাইট মেয়ে...

—নো লেকচার। নো সারমন। নো পুরুতগিরি। হু আর ইউ? আমার গার্জেন? আমি কোন গার্জেন-ফার্জেনের তোয়াক্কা করি না।

—আমি তোমার বন্ধু। জাস্ট এ ফ্রেন্ড।

—হেল উইথ ইওর ফ্রেন্ডশিপ। আমি বন্ধু চাই না। আমার কেউ নেই। নো বডি। নান্। আয়াম অল অ্যালোন ইন দিস্ গ্রেট প্ল্যানেট্।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ের সঙ্গে একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। বৃষ্টিকে নিয়ে সায়ন কোনরকমে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছল। তখনও বৃষ্টি অবিরাম বকবক করে চলেছে,

—আমি ভালদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব না, আমি তোমাদের ঘেন্না করি... অল মায়ের পুতুপুতু ছেলে... ক্যাবলা ক্যাবলা... গুডি গুডি... ড্যাম ইউ।

ঝড়ের ঝাপটায় পার্কের ভেতরের কাঁঠালি চাঁপা গাছটার ডাল মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল।

আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বিদ্যুৎ শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই ঝলকানিতে রাত ফালা ফালা। মুহূর্তের জন্য দিনের মত আলোকিত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। পর মুহূর্তেই কালিমালিপ্ত।

মুহূর্তের ঝলকানিতেই তিনটে মুখ স্পষ্ট হল। বাইরের বারান্দায় ঝড়ের ঝাপ্টা মেখে জয়া সুধা নিশ্চল। বাবলু হুইলচেয়ারে স্থির।

সুধারই প্রথম সম্বিত ফিরল। হুড়মুড় করে নেমে এসেছে রাস্তায়। সায়নকে সরিয়ে, সপসপে ভেজা মেয়েটাকে দুহাতে জাপটে ধরেছে।

বৃষ্টি ভেজা কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল।

—যাব না। ছেড়ে দাও আমাকে।

সুধা প্রাণপণে টানছে বৃষ্টিকে। সায়ন চকিতে তাকাল জয়া আর বাবলুর দিকে। সবার মুখই আবার অন্ধকারে। এখানে তার আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। লজ্জায় মিশে যাওয়া মানুষদের দেখতে ভয় পায় সায়ন।

সায়ন বাড়ির দিকে দৌড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১৫ ॥

পরদিন বিকেলের দিকে নিখিলকে অফিসে ফোন করল জয়া।

টিফিনের পর এই সময়টাতেই ঘন্টাখানেক নিখিল পাগলের মত কাজে ডুবে থাকে। সরকারি অফিসের রীতিমাফিক এখনও টিফিনের রেশ চলছে সর্বত্র। কেউ খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে, কেউ ঝিমিয়ে নিচ্ছে টুক করে, নিছক অলস মুখেও বসে কেউ কেউ। একদল সামনের ইলেকশানে ভি পি সিং, রাজীব, চন্দ্রশেখর, আদবানির ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা জুড়েছে। রাজ্য নির্বাচন নিয়ে এবার কেউ তেমন আগ্রহী নয়, যেন ফলাফল সবারই জানা। দু চারটে ছেলেছোকরা সিনেমা ফুটবল নিয়ে যে মেতে নেই, তা নয়। মেয়েরা সজ্জা, রান্না আর পরনিন্দা পরচর্চায় মুখর। এই পরিবেশে নিখিলকে কর্মরত দেখলে কেমন বেমানান লাগে। অবশ্য বাকি কোন সময়ই অফিসে নিখিলের টিকি দেখা যায় না।

নিখিল বিরক্ত হল। কাজের সময় কোনরকম বাধা সে পছন্দ করে না। তার টেবিল জুড়ে ডিজাইনিং পেপার, কম্পাস, সেট্-স্কোয়্যার, স্কেল। কয়েকটা তুলি, দুচারটে ছোট রঙের শিশি, টিউব। একটা শাড়ির ডিজাইনের কাজ আজ তাকে শেষ করতেই হবে। তার মাঝে এই ফোন...।

নিখিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল। জি এম-এর দশ বাই ছয় কিউবিক্‌লের সুয়িং ডোর ঠেলেছে। জি এম সামনে বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রিসিভারের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। ইঙ্গিতে বললেন, ভদ্রমহিলা।

নিখিল টেবিলের দিকে পিছন করে দাঁড়াল।

—কি ব্যাপার জয়া। তুই!

—কি করছিস্?

নিখিল আড়চোখে একবার জি এমকে দেখে নিল,

—ভীষণ সিরিয়াসলি কাজ করছি।

—একটু আসতে পারবি? আজ?

—কোথায়? তোর বাড়িতে?

—না। কলেজে চলে আয়। তোকে আমার খুব দরকার।

নিখিলের সন্দেহ হল,

—তোর গলাটা এরকম লাগছে কেন রে? কিছু হয়েছে নাকি? এনি অ্যাক্সিডেন্ট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না, না, তেমন কিছু নয়। তুই একবার আয় না প্লিজ্।

নিখিল ঘড়ি দেখল,—ঠিক আছে, চারটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

ফোন রেখে জি এম-এর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল নিখিল। ভদ্রলোক গোমড়া হয়ে গেছেন। দশ আঙুলে বিলি কাটছেন নকল চুলে,

—আজকেও তাহলে ডিজাইনটা পাচ্ছি না?

—কাল দিয়ে দেব। এত তাড়া করছেন কেন? সবে নতুন ফিনানশিয়াল ইয়ার পড়েছে, তার ওপর কদিন পরেই ইলেকশন, এখন কি আর তাঁতীদের দিয়ে কাজ ওঠাতে পারবেন?

—কাল ঠিক দিচ্ছেন তো?

—নিখিল দত্ত রায় যা বলে তাই করে।

নিখিল দরজা দুলিয়ে বেরিয়ে এল। এই সব সরকারি আমলাগুলোর পাকা পাকা ভাবভঙ্গি দেখলেই তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। লোকটার মাথার পরচুলটা একদিন টেনে খুলে দেওয়ার ইচ্ছা আছে নিখিলের। তারপর রিজাইন করবে চাকরি থেকে। মাথায় চুল না লাগানো থাকলে কী বিকট যে লাগে লোকটাকে। একদিন বাথরুমে নিখিল দেখে ফেলেছিল। রুমাল দিয়ে চকচকে টাক মুছছিলেন ভদ্রলোক। একটা গোল হুলো বেড়ালের মত মুখ, মাছি-গোঁফ...! এই অফিসেই কি না কাজ করে যেতে হয় তাকে!

আরতি জেদ না করলে থোড়াই করত এ চাকরি। আজকাল আর্টিস্টদের বাজার খুব খারাপ না। অনেকগুলো আর্ট গ্যালারি হয়ে গেছে। বছরে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার ছবি তো হেসে খেলে বিক্রি হয়ে যায়। সঙ্গে দু চারটে ফরমাইশি কাজ করতে পারলে তো কথাই নেই! জয়াও চাকরিতে ঢুকল, তাদের ইন্টিরিয়ার ডেকরেশনের ব্যবসাটাও উঠে গেল। জয়াটা দিব্যি এখন ছবির জগতে ডুবে গেছে। মিডিয়ার সঙ্গেও যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক রেখে চলে। রমেন সাহা আর সফিকুল হোসেন তো এক সময় দারুণ ব্যাক্ করেছিল জয়াকে। নিখিলের বরাবরই কপালটা খারাপ। লাস্ট এগজিবিশনেও জয়ার ছবি বিক্রি হল আঠেরো হাজারে, পোলিশ কনস্যুলেট থেকে কিনল। আর নিখিলের ছবি নিল বাংলাদেশ কনস্যুলেট। এগারোতে। ভাবতে গেলেই বুকটা মাঝে মাঝে চিনচিন্ করে ওঠে নিখিলের। পরক্ষণেই নিজেকে ধমকায়, ছিঃ নিখিল, জয়া না তোমার কত দিনের বন্ধু!

জয়ার জন্য নিখিলের সব সময়ই খারাপ লাগে। কি করে যে ওইরকম একটা হাম্‌বাগের পাল্লায় পড়েছিল। প্রথম দিন থেকেই তার সুবীরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিয়াত ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। কথার যাদুতে বশ করে ফেলতে ওস্তাদ। বিয়েটা ভেঙে শাপে বর হয়েছে। কত স্বাধীন ভাবে কাজ করছে জয়া। এক সময় যা দিন গেছে বেচারির। তার মধ্যেও মনের জোর কি সাংঘাতিক। রাতের পর রাত জেগে ছবি এঁকে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, নিখিলের মনে হয়, মানসিক বিপর্যয়ের সময় থেকেই জয়ার ছবি অনেক বেশি পরিণত হয়েছে। এমন চমৎকার রঙের কাজ করে একেক সময়।

বাথরুম থেকে মুখে জল দিয়ে এসে ব্রাশ, তুলি, স্কেল সব ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিল নিখিল, শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। কি হতে পারে জয়ার ? বাবলুর কিছু হল নাকি ? না বৃষ্টির ? সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে জয়ার জীবনের সমস্ত ওঠা পড়া তার চোখের সামনে ঘটে গেছে। বিয়ের সাক্ষী তো বটেই, ডিভোর্সেরও। বৃষ্টির কাস্টডি নিয়ে মামলা চলাকালীন জয়া যখন মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়ত, এক মুহূর্তের জন্যও সে দুর্বল হতে দেয়নি জয়াকে। জয়াও কম করেনি তার জন্য। জয়া না থাকলে আরতির সঙ্গে বিয়েটাই ভেঙে যেত তার। হিস্টেরিক আরতিকে জয়াই ঠাণ্ডা মাথায় সামলেছে। একেই কি বন্ধুত্ব বলে ? যদি তাই হয় তবে কেন জয়ার খ্যাতিকে ঈর্ষা করে সে ? হীনম্মন্যতাবোধ ?

ওয়েলিংটন থেকে বাসে এসে বাকি রাস্তা হেঁটেই মেরে দিল নিখিল। জয়া স্টাফরুমে ছিল। নিখিলকে দেখেই বেরিয়ে এসেছে। জয়াকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে নিখিল। তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল কলকাতা তিনশ'র এগজিবিশনে। একটু অন্যমনস্ক ছিল যেন সেদিন। নিখিল জিজ্ঞাসাও করেছিল ; এড়িয়ে গেছে জয়া। সেদিনও তো এত খারাপ লাগেনি জয়ার মুখ চোখ !

—কি হয়েছে তোর ? এরকম দেখাচ্ছে কেন তোকে ? চোখের নিচে কালি ! মুখ শুকনো !

কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে জয়া এক নিশ্বাসে বলে ফেলল,

—বৃষ্টিকে নিয়ে খুব প্রবলেমে পড়েছি। ও একদম পাগল হয়ে গেছে।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—উন্মাদের মত আচরণ করছে। কোন কথা শুনছে না। চল্, কোথাও বসে বলছি।

রাসেল স্ট্রিটের ছোট রেস্তোঁরায় বসে সব শুনে নিখিল একেবারে রুদ্ধবাক। বৃষ্টি নেশা করে বাড়ি ফিরছে ! গালিগালাজ করছে জয়াকে ! সুবীরের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যেতে চেয়েছিল ! উত্তেজনায় পর পর কয়েকটা সিগারেট খেয়ে ফেলল নিখিল,

—তাই তোকে কদিন কোত্থাও দেখা যাচ্ছে না ! ফিরোজের কলোনি শিলান্যাসের দিনও যাস্‌নি । সবাই তোর কথা বলছিল ।

—ছাড় ওসব । এখন কি করা যায় তাই বল্‌ । আমি কিছু ভাবতে পারছি না । আমারই হয়ত ভুল হয়েছে কোথাও । জয়ার গলা ধরে এসেছে । চোখের জল আটকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে ।

এই কি সেই বৃষ্টি যে আরতির গায়ের সঙ্গে লেপটে ছিল বৌভাতের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা ? আরও ছোটবেলায় ঝুলে পড়ত নিখিলের দাড়ি ধরে ? ডায়মণ্ডহারবারের পিকনিকে গিয়ে কি নাচই না নেচেছিল ছোট্ট মেয়েটা । বড় নিশ্বাস ফেলে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেভাল নিখিল । মেয়েটার কি অসাধারণ ছবি আঁকার হাতও ছিল !

—শান্ত হ' । ভেঙে পড়লে চলবে নাকি ? ভেবে চিন্তে একটা রাস্তা বার করতে হবে । সুবীরের সঙ্গে এই নিয়ে আর তোর কোন কথা হয়েছে ?

—না । রোজই চার পাঁচবার করে ফোন করে মেয়েকে । মেয়ে ফোন ধরেই না । ধরবেই বা কখন ? বাড়ি থাকলে তো । আমি কিছুই বলিনি আর । যদি কিছু একটা ভালমন্দ করে বসে ! যদি হুট্‌ করে বাড়ি থেকে চলে যায় !

—দাঁড়া, দাঁড়া । যাবে কোথায় ? গেলেই হল ?

নিখিল গভীর ভাবে ভাবার চেষ্টা করছিল ব্যাপারটাকে । হয়ত বৃষ্টি ডিপ মেলানকলিয়ায় ভুগছে । অনেক সময় এরকম হয় । ডিপ্রেশন মনে অনেক দিন চেপে রাখলে হঠাৎ এভাবেই এক্সপ্লোড্‌ করে । নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ ভাবতে ভাবতে...

—আচ্ছা, কাদের সঙ্গে মেশে বল্‌ তো ?

—ঠিক বলতে পারব না । কলেজেরই বন্ধুবান্ধব হবে । সেদিন একটা ছেলে ওর খোঁজ করতে এসেছিল বাড়িতে, দেবাদিত্য না কি যেন নাম, দেখে তো ভালই মনে হল ছেলেটাকে । মাঝে কদিন বৃষ্টি বাড়ির থেকে বেরিয়েও কলেজ যায়নি । সেসময়ই খোঁজ নিতে এসেছিল । পাড়াতেও একটা নতুন ছেলের সঙ্গে কথা বলে মাঝে মাঝে । কাল যখন ঝড় উঠল, তখন সেই ছেলেটাই তো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল বৃষ্টিকে । বাবলু বলছিল ছেলেটা নাকি ভাল ক্রিকেট খেলে ।

—ওদের ডেকে কথা বলা যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কে বলবে ? বাবলু ? ওকে তো তুই জানিস্‌ই। কখন কি মুডে থাকে ! আমারই হয়েছে জ্বালা, সবার মেজাজমর্জি বুঝে চলতে হয়। আমি কাউকে ডেকে কিছু বললে বৃষ্টি কি ভাবে রিঅ্যাক্ট করবে।... এদিকে পাড়াতেও তো টি টি পড়ে গেছে। পাশের বাড়ির অবিনাশ উকিল সেদিন তো রাস্তায় আমাকে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই শোনালেন। আমি কি করি বল্‌তো ?

নিখিল চুপ করে রইল। পাড়ার কোন ছেলে বা মেয়ে হঠাৎ বিপথে গেলে প্রতিবেশীরা মজাই পায়। যেন রসের খোরাক। তার ওপর সেই ছেলেমেয়ের মা যদি ডিভোর্সি হয় তবে তো সোনায় সোহাগা।

—তুই নরম করে ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখেছিস ? সমস্ত ব্যাপার জানতে চেয়ে ?

জয়া দু দিকে মাথা নাড়ল। কি করে বোঝাবে বৃষ্টিকে দেখলেই এখন তার হাত পা কাঁপে। সব সময় যে অত উগ্র মেজাজে থাকে তার সঙ্গে নরম করে কথা বলা যায়ই বা কি ভাবে ? চোখের সামনে মুহুর্মুহু সেই দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। মেয়ে তার মুখের ওপর পা দোলাচ্ছে। কানে ওয়াকম্যান।

জয়ার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। তাড়াতাড়ি রুমাল চেপেছে মুখে। মনে মনে বলছে,তোর জন্য সময় দিইনি কোনদিন। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। সব সময় ফিরিয়ে দেব তোকে। একবার সুযোগ দে বৃষ্টি।

AMARBOI.COM

একটা সুযোগ দিবি না বৃষ্টি ? আমি তোকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলতাম।

রিসিভার নামিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল সুবীর। মেয়েটা আজকেও বাড়ি নেই। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে সুবীরের নিজের ওপর। কী কুক্ষণেই যে জয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল। মেয়েটা বোধহয় সারা জীবনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সুবীর আলগাভাবে চেয়ারে হেলান দিল। ঝুঁকে জল খেল টেবিলের গ্লাস থেকে। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। এয়ার কণ্ডিশনড় ঘরে বসেও ঘামছে বিশ্রী ভাবে। টাইএর নট্‌ আলগা করল। বেল টিপে ডাকল বেয়ারাকে,

—এসিটা ফুল্‌ করে দাও।

—ফুল তো করাই আছে সার।

—তাই ? ঠিক আছে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবীর শার্টের ওপরের বোতামটা খুলে দিল। টয়লেটে গিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিল খানিকটা। আয়নায় মার্কেটিং ম্যানেজার সুবীর রায়কে কী বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে! পারচেজের নায়ার আজ সকালেই বলছিল,

—ইউ আর লুকিং সিক। টেক সাম্ রেস্ট্ ম্যান্।

সুবীর রায়ের বিশ্রাম কোথায়? বিশ্রাম, অবসর শব্দগুলো কবেই তো মুছে গেছে সুবীরের অভিধান থেকে। সেই ন্যায়রত্ন লেনের গলি থেকে একুশ বছর বয়সে সেলস্ম্যান হিসাবে জীবন শুরু। তারপর আর কোনদিন দাঁড়াবার সময় পেল কোথায়! সুবীর কোনদিনই স্রোতের মানুষ হতে চায়নি। স্রোতের মানুষ ভাসতে ভাসতে চড়ায় আটকে গেলে আটকেই থাকে। স্রোতের সঙ্গে নয়, সুবীর চেয়েছিল সে যেদিকে যাবে স্রোতকেও যেতে হবে সেদিকে। হায় রে মানুষের স্পর্ধা।

সুবীর আবার টেবিলে এসে বসল। কোয়ার্টারলি মার্কেটিং প্রজেকশানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

বেয়ারা নিজেই ঢুকল,

—স্যার, আপনার দাদা এসেছেন দেখা করতে। আসতে বলব?

সুবীর ফাইল বন্ধ করল,—বলো।

সামনের চেয়ার টেনে বসেছে প্রবীর। মুখচোখ উসকো খুসকো, দু তিন দিন মনে হয় দাড়ি কামায়নি। নীল শার্ট বেশ ময়লা।

প্রবীরকে দেখেই সুবীরের মনে পড়ে গেছে কাশীপুর জুট মিলে লকআউট শুরু হয়েছে; কদিন আগেই কাগজে দেখছিল। তখনই মনে হয়েছিল একবার দেখা করে আসবে বাবা মা দাদা বৌদির সঙ্গে।

প্রবীর হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে,

—ভাবিইনি তোকে এখন অফিসে পাব। এখানে হেড অফিসে আমাদের আজ গেট মিটিং ছিল। ফেরার পথে ভাবলাম একবার ঢু মেরে যাই। তুই তো অনেক সময় সন্ধের পরও থাকিস্।

—মিটিং-এ কি হল? চান্স আছে খোলার?

প্রবীর উত্তর দিল না। তাদের জুট মিল প্রায়ই বন্ধ থাকে। ছ মাস খোলা, তো ছ মাস বন্ধ। সে সময় দ্বারস্থ হতে হয় এই ভায়েরই। ভাই যদিও বিরক্ত হয় না তবু তার খুব খারাপ লাগে। কি করবে? এই বয়সে কোথায় আর...?

সুবীর জিজ্ঞাসা করল —বৌদির কি খবর? টুকাই বুকাই-এর পরীক্ষা কেমন হল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ওই এক রকম। বাবা মার শরীরটাই ভাল না। বাবাকে তো আজকাল না ধরলে হাঁটাচলাই করতে পারে না।

সুবীর নিজের হাতের দিকে অজান্তে তাকিয়ে ফেলল। তার কাঁপাটাও বাড়ছে একটু একটু করে। মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করল,

—এটা রাখ্।

প্রবীর হাত বাড়াল না,—থাক্ না। এখনও আছে হাতে। লাগলে চেয়ে নেব।

—রাখ্। বাবার ওষুধও তো কিনতে হবে। পারলে মাকে একটা টনিক কিনে দিস।

প্রবীর মাথা নিচু করল। সুবীরের বুকটা কটকট করে উঠেছে। দাদাকে দেখলে আজকাল তার বড় মায়া হয়। কিছুই করে উঠতে পারল না জীবনে। খুব ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট লাগলে কিভাবে বুক দিয়ে তাকে আগলে রাখত দাদা। সেই সম্পর্ক আলগা হতে হতে এখন শুধুই দায় ওঠানো। সম্পর্কের তবে এটাই কি শেষ ধাপ? মনে হলেই আবেগ প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করা সুবীর, কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

—আয় না একদিন আমার ওখানে। টুকাই বুকাই আর বৌদিকে নিয়ে। তোরা তো আর আসিস্ই না। দাদাদের সঙ্গে রাজার তো...

প্রবীর তবু মাথা নামিয়েই আছে। বৃষ্টির মতই তার মনের ছাপ অতি সহজেই মুখে ফুটে ওঠে। প্রবীর একটুও পছন্দ করে না রীতাকে। কেন যে করে না? জয়া ওর বেশি পছন্দের ছিল বলেই কি?

সুবীরও চুপ করে রইল।

প্রবীর খানিক পরে মাথা তুলেছে। একটু ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় বলল,—তুইও তো বাড়িতে আসতে পারিস্। সেই লাস্ট কবে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলি। বাবা মা তোকে খুব আশা করে। শোকাতাপা মানুষ, কবে আছে, কবে নেই।

সুবীর মৃদু হাসল,— ঠিক আছে, আজকালের মধ্যেই যাব একবার।

বেয়ারা চা দিয়ে গেছে। প্রবীর চায়ে চুমুক দিল।

—হ্যাঁরে, আমাদের মেয়েটা কেমন আছে রে? ফার্স্ট ইয়ার চলছে তাই না?

মা, বাবা, দাদা, বৌদি সকলের কাছেই বৃষ্টি এখনও ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িরই মেয়ে। হক না সে মানুষ বালিগঞ্জে তার মায়ের কাছে। সম্পর্কের এই ধারাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি অদ্ভুত ! সুবীর নিজেকে আর ন্যায়রত্ন লেনের বাড়ির ছেলে বলে ভাবতে পারে না, বৃষ্টিও থাকে না সুবীরের কাছে তবুও... ।

হয়ত সম্পর্কের নিয়মই এরকম। অসংখ্য ঝুরিনামা বৃদ্ধ বট ভাবে সমস্ত ঝুরিগুলো তারই অংশ। এদিকে ঝুরিরা নিজেদের প্রাণরস নিজেরাই মাটি থেকে আহরণ করে চলেছে। তাদের মধ্যে দিয়েই বেঁচে আছে বৃদ্ধ বট। কখন যে তার নিজের কাণ্ড মরে গেছে, সে খেয়ালও নেই। তাছাড়া পুরোপুরি কোন সম্পর্ক বোধহয় ছেঁড়েও না। অদৃশ্য তন্তুতে কোথাও রেশ থেকেই যায়। নাহলে বাবা মা এতদিন পরেও কোন প্রসঙ্গে জয়ার কথা উঠলে বৌমা সম্বোধন করে কথা বলেন ! অথচ রীতাকে রীতা।

সুবীর অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ল,—ভালই আছে। চল্, উঠবি তো ? তোকে ধর্মতলার মোড়ে নামিয়ে দিই। এখন তো এখান থেকে বাসফাসও পাবি না। সাড়ে সাতটা বাজতে যায়।

প্রবীরকে নামিয়ে দেওয়ার পর ড্রাইভারকে রেড রোড হয়ে, রেসকোর্স ঘুরে বাড়ি যেতে বলল সুবীর। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। অনেক দিন আগে, জয়ার সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর পরই, ছোট বৃষ্টিকে নিয়ে বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তাদের দেখে চিৎকার করে দোতলার বারান্দা থেকে জ্যাঠতুতো দাদা বলছিল জ্যাঠাইমাকে,

—ফেরিঅলাটা মেয়ে নিয়ে এসেছে দেখলাম ? তা তোমাদের আদরের সুবুর বউটা আর কোন বেটাছেলে পাকড়াও করতে পারল ?

ওইটুকু মেয়ে ঠিক বুঝে নিয়েছিল বিদ্রূপটা। তারপর থেকে কিছুতেই আর ও বাড়িতে যেতে চাইত না। সুবীর বললেও নয়। মেয়েটা বড্ড বেশি অভিমানী। সিটে হেলান দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল সুবীর। জানলার নামানো কাচে হাত রাখছে বার বার। আজ এত হাওয়া কম কেন ?... মেয়েটা কি আর কোনদিন কথা বলবে না তার সঙ্গে ?

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। সুবীর ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়েই আছে।

ড্রাইভার ডাকল,—সার, এসে গেছি।

সুবীর চমকে তাকিয়েছে। কখন এত ঘুমিয়ে পড়েছিল ! থতমত চোখে তাকাল চারদিকে। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবীর ক্লান্ত পায়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল।

এখনও আর কত ওঠা নামা বাকি আছে জীবনের !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজীব চেঁচিয়ে ডাকল বৃষ্টিকে,

—কাম অন্ বেবি, উই'ল বি টুগেদার হিয়ার হোল নাইট।

বৃষ্টি শুনতে পেল না। প্রচণ্ড শব্দে লেকের জল থরথর কাঁপছে। পাখিরা চমকে উঠছে আতঙ্কে। শব্দের ধাক্কায় পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার জোগাড়। শব্দ নয়, নাদ। এখানে এলে বোঝা যায় শব্দকে কেন পুরাণে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। প্রবল দাপটে ড্রাম বাজাচ্ছে এক ঝাঁকড়াচুল দাড়িঅলা যুবক। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়াইয়ান গিটার, জ্যাজসেট্, সিন্থেসাইজার। কমনীয় মেয়েলি চেহারার একটি ছেলে জমকালো পোশাক পরে, স্প্যানিশ গিটার হাতে গোটা স্টেজে নেচেকুঁদে গান গেয়ে চলেছে। মুক্ত অডিটোরিয়ামে প্রকৃতির নীচে রাতভর আজ পশ্চিমী রকের জলসা। শ্রোতাদের বয়স পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ। প্রত্যেকেই এমন ভাবে তাল দিচ্ছে যেন সে না তাল দিলেই বাজনার ছন্দ কেটে যাবে।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরেই তার দলবলকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। চতুর্দিক এমন ধোঁয়াটে আর শ্রোতার ভিড় এমন জমাট, যে পাঁচ-সাত হাত দূর থেকেও নিজের বন্ধুদের চিনে নেওয়া কঠিন।

রাজীব উঠে এসে টানল বৃষ্টিকে,

—হোয়াটস্ রঙ ? কখন থেকে চিল্লাচ্ছি !

—আমিও তো খুঁজছি তোদের। শুভ আসেনি ?

—ডোন্ট্ নেম দ্যাট বাগার। রকে নাকি ওর মাইগ্রেন হয়।

কথার সঙ্গে দুলে চলেছে রাজীব। বৃষ্টিও এক পায়ে তাল দিচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল। মাইগ্রেন না আরও কিছু। আসলে বাড়িতে বসে শুভ এখন অ্যানুয়ালের প্রিপারেশন চালাচ্ছে। চালাক ছেলে। পরীক্ষার কথা মনে হতেই বৃষ্টি আরও বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল। সামনেই একদল ছেলেমেয়ে হাই হুই চিৎকার করছে।

—ওফ্, আজ ওয়েদার যা স্টাফি। আর কে কে এসেছে রে ?

—ওই তো জিমি, জিন্ডা, পেপসি, রানা...আরও তিনচার জন আছে, তুই চিনবি না।

জিন্ডা, জিন্সের পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বার করল, এক চুমুক খেয়ে এগিয়ে দিল রাজীবকে। রাজীব গলায় অল্প ঢেলে বোতল ফেরত দিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আহ্, ইউ সুইটি পাই, সব সময়ে পকেটে মজুত রাখিস্ কি করে ?

—দ্যাটস্ দি আর্ট। ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট্ ইট ডিয়ার।

জিমির চোখ স্টেজের দিকে। দু হাত মাথার ওপর তুলে জোর জোর তালি বাজাচ্ছে, তার কানের ঝোলা দুল একই সঙ্গে নাচছে টিং-টিং। বৃষ্টির মন প্রথমে সামান্য খুঁত-খুঁত করছিল। আজই প্রথম সারা রাত বাড়ির বাইরে কাটাবে। সুধাকে অবশ্য বলে এসেছে কেউ যেন তার জন্য চিন্তা না করে। কেন যে বলতে গেল ! নিখিলমামার কথাতেই কি !...

পরশু দিন হঠাৎই নিখিল বৃষ্টির কলেজে হাজির। বৃষ্টি সামনেই বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। কাল থেকে মীনাক্ষি এক মাথা সিঁদুর পরে কলেজে আসা শুরু করেছে। এই নিয়ে বৃষ্টির বন্ধুবান্ধবরা দারুণ উত্তেজিত। বাড়ির অমতে সেই ছেলেটাকেই বিয়ে করেছে মীনাক্ষি, চলে গেছে ছেলেটার বাড়িতে। তাই নিয়ে জোর তুফান চলছিল। বৃষ্টিকে অবশ্য অলোচনাটা তেমন স্পর্শ করছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে কলেজে থাকতে হয়, সেই জন্যই থাকা এখন।

বৃষ্টিকে দেখে নিখিলমামা স্বভাবমতই হৈ-চৈ করে উঠেছিল,—এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। হঠাৎই মনে হল, আরে তুই তো এখন কলেজে। তাই একটু টুঁ মেরে গেলাম। বাড়ি গেলে আজকাল তো তোর দেখাই পাওয়া যায় না।

—গিয়েছিলে বুঝি ? বৃষ্টি নিখিলমামাকে দেখে কম অবাক হয়নি,—কবে গিয়েছিলে ?

—এই তো পর পর দু'দিন সন্ধেবেলা ঘুরে এলাম। একদিন তো তোদের পার্কে জোর ইলেকশন মিটিং চলছিল। বাবলু বলল এর মধ্যে কবে নাকি রাজীব গান্ধীও আসছে মিটিং করতে। কবে রে ?

—কি জানি। এখন তো রোজই মিটিং মিছিল।

বৃষ্টি এখন পরিপার্শ্বের কোন খবর রাখে না। এই তো সুদেষ্ণা, তৃষিতা আর দেবাদিত্য সেদিন জোর তর্ক জুড়েছিল বি জে পি কংগ্রেস নিয়ে।

দেবাদিত্য বৃষ্টিকে প্রশ্ন করেছিল, —কাকে ভোট দিবি রে বৃষ্টি ?

তৃষিতা বলে উঠেছিল, —আমি বাবা স্টেট্ অ্যাসেমব্লিতে কাকে দেব ঠিক করে ফেলেছি।

সুদেষ্ণা বলল,—অ্যাই বলবি না। সিক্রেট। সিক্রেট।

এবার প্রথম ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে বলে সুদেষ্ণা তৃষিতারা রীতিমত রোমাঞ্চিত। ছেলেমানুষি। বৃষ্টির এখন কলেজের বন্ধুদের আর ভাল লাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। একদিন দেবাদিত্য জ্ঞান দিতে এসেছিল, বৃষ্টি, শুভকে যা মানায় তোকে তা মানায় না।

বৃষ্টি বিরক্ত হয়েছে,—তুই তোর মত ছ্যাবলামি নিয়ে থাক্ না। আমায় নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বৃষ্টির স্নায়ু আজকাল খুব বেশি টান-টান থাকে। সায়নদীপ ছেলেটা তাকে যখন তখন ধরছে রাস্তায়। একদিন হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই গার্জেন হয়ে বসেছে। আজও বিকেলে বেরোনোর সময় পথ আটকেছিল,

—চললে কোথায় ?

বৃষ্টি কটকট করে তাকিয়েছে,—তাতে তোমার কি দরকার ?

—কখন ফিরছ ?

—সেটাও তোমাকে বলতে হবে নাকি ?

—তা নয়, আমি তো আর রোজ মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব না, বাড়ি চিনে ফিরতে পারবে তো ?

বৃষ্টি খেপে লাল। তখনই ঠিক করেছে রাত্রে আজ ফিরবেই না। সুধাকে যদিও সে কথা বলেনি। তবু যা বলেছে, তাই ঢের। নিখিলমামা বার বার না বললে হয়ত সেটুকুও...

নিখিলমামা বলেছিল,—কোথায় যাস্ বাড়িতে বলে যাস্ না কেন রে ? কেউ তোর খবর দিতে পারে না। কিডন্যাপড্ হয়ে গেলে আমরা কোথায় খোঁজ করব ?

বৃষ্টির মনের কোণে চোরা সন্দেহ। মা নিখিলমামাকে খোঁজ নিতে পাঠায়নি তো ? নিখিলমামার মুখ দেখে অবশ্য সন্দেহের মেঘ কেটে গেছে। নিখিলমামা গোয়েন্দা হতেই পারে না। সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে রাখলে যে খুঁজে বার করতে পারে না, সে হবে গুপ্তচর ? কপটতা করবে ? ছোটবেলায় না তার সঙ্গে নিখিলমামার চুক্তি হয়েছিল দু'জনে মিলে পায়ে হেঁটে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা ঘুরবে ! হাসতে হাসতে বলেছিল,

—শাঁকচুন্নিকে কিডন্যাপ্ করবে এমন ভূত আছে নাকি কলকাতায় ?

—আছে রে আছে। ভূত সর্বত্র আছে।

বৃষ্টি সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল। ভূত যে আছে সেটা সেও টের পায়। এই জিমিরই হাবভাব ভাল নয়। কারণে অকারণে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। দু একদিন আনন্দের অছিলায় তাঁকে জড়িয়ে ধরারও চেষ্টা করেছিল। এইসব ভূতেদের সামলানোর ক্ষমতা বৃষ্টির আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে বৃষ্টি থামল। গাঁজার নেশা রপ্ত হওয়ার পর সাদা সিগারেটে আর তেমন আরাম পায় না। পার্ক স্ট্রিটের এক পানের দোকান থেকে সে প্রায়ই অল্প অল্প গাঁজা কিনে আনে। জিমি তাকে চিনিয়ে দিয়েছে দোকানটা। বিশেষ একটা কোড বলে চাইতে হয়।

বৃষ্টি ঠুকে ঠুকে সিগারেট থেকে তামাক বার করে ফেলল। ব্যাগে রাখা গাঁজাটুক সযত্নে ভরল সে জায়গায়, দেশলাই কাঠি দিয়ে চেপে চেপে কাগজে ঠেসে দিল, দু হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে নিল ভাল করে।

জিমি পাশে উঠে এসেছে। বৃষ্টি দেশলাই জ্বালানোর আগেই হাত ধরে থামাল,

—ওয়ান্ট সামথিং মোর হার্ড ? ম্যাসকুলাইন ?

বৃষ্টির ভুরু জড়ো।

প্যান্টের হাঁটুর চেন খুলে জিমি প্লাস্টিকের ছোট্ট মোড়ক বার করল। রাজীব দেখেই চিনে ফেলেছে,

—তুই কোন্ ঠেক থেকে রোজ ম্যানেজ করছিস্ রে ? আমাদের ওদিকে পুলিশ হেভি ঝামেলা করছে, পাড়াগুলোও হয়েছে তেমনি, দোজ বাগারস্ আর সিম্পলি মেকিং ইট্ হেল্।

জিমি রাজীবের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। সব রহস্য সকলকে জানাতে নেই। বৃষ্টিকে ইশারায় স্টেজের পিছনে যেতে বলল,

—এখানে কেমন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি। বাইরে একটা দারুণ গলতা আছে, চল্।

জিমির সঙ্গে রাজীবও উঠেছে,—যাবি বৃষ্টি ?

বৃষ্টি দোমনা। জিমির সঙ্গ তার একদম ভাল লাগে না। এদিকে আজ আরও চড়া নেশার জন্য তার শরীর ছটফট করছে।

মেয়েলি ছেলেটার গান থেমেছে। পরের জনের প্রস্তুতি শুরু হল। রাজীব একবার জিজ্ঞাসা করল,

—কে উঠছে রে এবার ? মার্কো রেঙ্গান্ ? ফার্টাডোর প্রোগ্রাম কি পরে ?

জিমি উত্তর দিল না। সামনের ছেলেমেয়েদের সরিয়ে সে বাইরে যাওয়ার রাস্তা করছে। চারটে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গান ধরেছে,

ফিফটিন্ মেন ইন ডেড ম্যানস্ চেস্ট...ইয়ো হোহো হো...

অ্যান্ড এ বটল্ অফ রাম্।

জলদস্যুদের গানের কি পরিণতি !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অডিটোরিয়ামের বাইরে এসে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে শব্দগুলো। লেকের জলের ধারে, তিনটে প্রকাণ্ড গাছের মাঝখানে ছোট্ট ঝোপের আড়াল। কেউ এখানে বসে থাকলে আট-দশ হাত দূর থেকেও দেখা যায় না। জিমি রাজীব অভ্যস্ত পায়ে পৌঁছে গেছে সেখানে। পিছনে সম্মোহিতের মত বৃষ্টি।

জিমি পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। গোল করে কাগজ পাকাচ্ছে। রাংতার ওপর এক চিমটে ব্রাউন সুগার রাখল। অন্ধকারে জিমির মুখ যেন অরিজিতের মত। অরিজিৎ আজকাল সর্বক্ষণ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কবিতা আওড়ায়।

রাংতার ধোঁয়া নাকে টানার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি প্রথমটা কেমন অনুভূতিশূন্য হয়ে গেল। অন্ধকার দুলে উঠল নাগরদোলার মত। অসংখ্য নীল বুদবুদ নাচছে চোখের সামনে।

জিমি বৃষ্টির কাঁধে হাত রাখল —এনজয়িং ?

বৃষ্টি অভ্যাসমত হাত সরিয়ে দিল। আবার নাক ডোবাল ধোঁয়ায়। রাজীবের কাঁধে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করল, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে।

রাজীব মাথায় হাত রাখল,—কি বলছিস্ রে ?

বৃষ্টি কিছুতেই চোখ খুলতে পারছিল না। জড়ানো স্বরে তবু বলতে চাইছে, আই হেট দেম, আই হেট দেম, আমি ওদের ঘেন্না করি।

তিনটে ছেলে মেয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় এমনভাবে একে অন্যের গায়ে পড়ে আছে যে কাউকে পৃথক করা যায় না। বৃষ্টি বারকয়েক উঠে বসার চেষ্টা করেছিল, আপনা থেকেই পড়ে গেছে। রাজীব বা বৃষ্টির তুলনায় জিমি অনেক পাকা নেশাড়ু। বৃষ্টিকে সে কাছে টেনে নিল। তার কাঁপা কাঁপা হাত বৃষ্টির বুকের ওপর। বৃষ্টির কোন অনুভূতিই নেই। তার চোখ লেকের জলে স্থির।

ওপার থেকে সোনালি আলো এসে পড়েছে জলে। দেখতে দেখতে বৃষ্টির মনে হচ্ছিল জলটা বুঝি এখখুনি লাফ দিয়ে চলে যাবে পৃথিবীর বাইরে। মাঝে মাঝেই জল ফিনকি দিয়ে উঠছে। বৃষ্টি একা সেই দুরন্ত জলের মাথায় ভাসতে থাকল। ঘন ঘন রঙ বদলাচ্ছে অন্ধকার। কালো। সাদা। নীল। সোনালি। সবুজ। কাল্পনিক তুলি দিয়ে বৃষ্টি রঙগুলোকে ধরার চেষ্টা করল অন্ধকারের ক্যানভাসে। অনেক অনেকদিন পর সে ছবি আঁকছে।

আচমকাই বৃষ্টির বুক হুহু করে উঠল। নিজের খেয়ালে আঠেরো বছরের বৃষ্টি একটা খেলা শুরু করতে চেয়েছিল। মাকে না মানার খেলা। বাবাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচাই করার খেলা। সেই খেলাই তার কাছে বুমেরাং হয়ে আসছে। কি করে এখন সে বাবা মাকে বোঝায় এভাবে কষ্ট পেতে তার একটুও ভাল লাগছে না। এই জিমি, রাজীব, সবাই, সবাই খুব খারাপ। তার একটাও বন্ধু নেই। একটাও। সায়নদীপ কি সত্যি তার বন্ধু হতে চায় ?

বৃষ্টির নির্জীব চোখ বিশ্ব ঘুরে খুঁজছে কাউকে। কে সে ?

রাত্রি দশটায় তিনজনকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে লেক থানার সাবইন্সপেক্টর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অঞ্চলটা ভাল নয়। প্রায়শই রাতে তাঁকে রাউন্ডে বেরোতে হয়।

—কে রে ? কে ওখানে ?

মুখে জোরালো টর্চের আলো পড়তে বৃষ্টির চোখ আরও ধাঁধিয়ে গেল। আবছা আবছা একটা স্বর কানে আসছে। শেষ পর্যন্ত কে তাকে নিয়ে যেতে এল ?

বৃষ্টি আলোর পিছনে শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট কায়া দেখল।

সাবইন্সপেক্টরের সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন প্লেন ড্রেসে।

—দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্র বাড়ির ছেলে মেয়ে ! এত রাতে এখানে বসে হচ্ছেটা কি, অ্যাঁ ? পাতা-খাওয়া পার্টি !

—ওঠ। ওঠ্।

—আরে, ওই ছেলেটা না ! এই শালা...

বৃষ্টির মুখের আরও কাছে আলো এগিয়ে এল।

গভীর রাতে থানা থেকে ফোন পেয়ে জয়া প্রথম ধাক্কায় হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রিসিভার ক্রেডলে রাখতেও ভুলে গেছে। দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

কাল পরশু দু দিন বৃষ্টি খুব একটা রাত করে ফেরেনি। আজ সন্ধেবেলা জয়া সুধার মুখে শুনেছিল বৃষ্টি নাকি কোথায় ফাংশান শুনতে গেছে, ফিরতে রাত হবে। মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল একটু। যাক্, তবু বলে তো গেছে। এটাই এখন জয়ার কাছে বিরাট পাওয়া।

ফোনের শব্দ শুনে বাবলু সুধাও উঠে এসেছে। দুজনেই জয়ার দিকে নির্বাক তাকিয়ে। জয়ার মুখ কাগজের মত সাদা। ঠোঁট কাঁপছে। কোনক্রমে বলতে পারল,

—বৃষ্টিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিশাহারা জয়া নিজের ঘরে ঢুকল একবার। বেরিয়ে এল। কাকে ডাকে এখন ? নিখিলের বাড়িতে ফোন নেই। ফিরোজকে ডাকবে ? রমেনদাকে ? রমেনদার চারদিকে অনেক জানাশুনো আছে। সিনিয়ার আর্টিস্ট কাউকে বললেও সাহায্য পেতে পারে। প্রকাশদা। মাস্টারমশাই। সুনীলদা। ফোনের কাছে গিয়ে নোটবুক উল্টোতে লাগল জয়া। পরমুহূর্তে হাত থেকে পড়ে গেল নোটবুকটা।

জয়া ভিতরের প্যাসেজে বার তিন-চার পায়চারি করল। মনে হচ্ছে কেউ তার পাঁজরে তীক্ষ্ণ শলাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রথমে অনুভূতি অসাড় হয়ে গিয়েছিল, তারপরই অসহ্য যন্ত্রণা। এই পরিস্থিতিতে কি যে করতে হয় ?

অস্থির কাঁপা কাঁপা হাতে জয়া ডায়াল ঘোরাল।

রীতা ঘুম চোখে বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়েছে,

—হ্যালো।

—সুবীরকে একটু ডেকে দেবেন ?

—কে বলছেন আপনি ?

—আমি বৃষ্টির মা। জয়া। খুব আরজেন্ট দরকার। যদি কাইন্ডলি...

—এখখুনি দিচ্ছি, ধরুন।

মাঝে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। জয়ার মনে হল কয়েক যুগ।

সুবীর ফোন ধরল,—কি হয়েছে ? কি হয়েছে বৃষ্টির ? কোন অ্যাক্সিডেন্ট ?

জয়া প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

—কি হল ? কিছু বলছ না কেন ? বৃষ্টি কোথায় ?

—এখখুনি একবার লেক থানায় আসতে পারবে ? বৃষ্টিকে পুলিশে তুলে নিয়ে গেছে। লেকে বসে ড্রাগ নিচ্ছিল।

এত রাত্রে...! সুবীর প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেল। এখন আর ওসব জানার সময় নেই।

—আমি এখখুনি পৌঁছে যাচ্ছি।

ঘর থেকে ব্যাগ নিয়ে জয়া দৌড়ে বেরিয়েছে রাস্তায়। ল্যান্সডাউনের দিকে একটা মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। চারদিকে রাত্রি শুনশান। একটা দুটো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে দুর্দম গতিতে। মোড়ের পানের দোকান বন্ধ হল এইমাত্র। কলকাতা ঘুমিয়ে পড়ছে।

জয়া ট্যাক্সির দরজা ধরে দাঁড়াল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—খুব আর্জেন্ট ভাই। লেক থানা।

থানার নাম শুনেই বোধহয় ড্রাইভার আপত্তি জানানোর সুযোগ পেল না।

জয়া পৌঁছনোর আগেই সুবীর পৌঁছে গেছে থানায়। ইতিমধ্যেই সে ডিউটি অফিসারের সামনের চেয়ারে বসে। কোণে, একটা বেঞ্চিতে ঘাড় গোঁজ করে বসে রয়েছে বৃষ্টি। পাশে দুলছে দুটো ছেলে। জয়ার পিছন পিছনই পাজামা পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সী এক সুদর্শন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেছেন। তাঁরও উত্তেজিত চোখ ঘুরে ফিরে বেঞ্চির দিকে। সুবীরের পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে,

—কি করি বলুন তো এই ছেলেকে নিয়ে?

ডিউটি অফিসার ভদ্রলোককে দেখে লেখা বন্ধ করেছেন।

—সো মিস্টার মুখার্জি, দিস্ ইজ থার্ড টাইম। এভাবে তো অনন্তকাল চলতে পারে না। আপনার মুচলেকায় আর ভরসা করি কি করে?

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে অফিসারের হাত চেপে ধরলেন,

—এবারের মত ছেড়ে দিন প্লিজ্। নেক্সট্ টাইম হলে আপনি যা খুশি করবেন। লকআপে পেটাবেন, কোর্টে চালান দেবেন, যা আপনাদের ইচ্ছে। ...আমি কিচ্ছু বলতে আসব না। এবার। প্লিজ্ এবারকার মত।

ডিউটি অফিসার হাত ছাড়িয়ে নিলেন,

—আমি স্যারকে ফোন করে দেখছি। বাট দিস্ ইজ লাস্ট টাইম। অ্যান্ড আই মিন ইট।

ভদ্রলোকের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। দেখেই বোঝা যায় বেশ প্রভাবশালী মানুষ।

ডিউটি অফিসার ফোন করছেন; ভদ্রলোক সুবীরের দিকে তাকালেন,

—ছেলেটা এরকম ছিল না জানেন। জয়েন্টে চান্স না পাওয়ার পর থেকেই...কোথা থেকে যে সব ড্রাগ পেড্লারগুলোর সঙ্গে ভাব হল! লোকগুলোকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে মেরে ফেলা উচিত।

ডিউটি অফিসার রিসিভার কানে রেখে মিটিমিটি হাসছেন। ফোন নামিয়ে চোখ রাখলেন ভদ্রলোকের দিকে,

—কিছু মনে করবেন না স্যার, লাস্ট সেপ্টেম্বরে তিনটে ড্রাগ পেড্লার ধরেছিলাম, এমনভাবে কেস বেঁধেছিলাম সেন্টেন্স্ হতই, অন্তত পাঁচ বছর; আপনিই তাদের হয়ে মামলা লড়ে... আপনার মত নামি মানুষ, দামি লইয়ার...গ্রিপের থেকে বেরিয়ে গেল লোকগুলো...বলতে বলতে নিস্পৃহ স্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকেছেন কনস্টেবলকে,—বিমল, ওই জীয়ন মুখার্জি মানে সাহেবের জিমিকে সাহেবের গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো তো।

ভদ্রলোক তবু মাথা নামিয়ে বসে রইলেন অল্পক্ষণ। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ঘাড় নিচু করেই বেরিয়ে গেছেন।

পাশের টেবিলের সাবইন্সপেক্টর হাই তুললেন,

—ভাল দিয়েছিস মাইরি। শালা যত সব চোর ছ্যাঁচোরের হয়ে মামলা লড়বে...আর এখানে এসে...ছেলেটাকে একটু পিটিয়ে নিতে পারলি না? আলালের ঘরের দুলাল। আলালটি এবার নমিনেশন পেলে যে কি হত! এম পি হলে...

জয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। ডিউটি অফিসার চোখে প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে এতক্ষণে তাকিয়েছেন তার দিকে।

সুবীর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

—জয়া রায়। মেয়ের মা।

ডিউটি অফিসার চেয়ারে হেলান দিলেন। টেবিলের ওপর রাখা রুলটা তুলে নিজের তালুতে ঠুকছেন আস্তে আস্তে।

—কি করেন বলুন তো আপনারা? একটা মেয়েকে সামলাতে পারেন না? একটাই তো মেয়ে আপনাদের, না কি?

সুবীর জয়া নীরব। জয়া একবার শুধু মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়েরও চোখ এদিকে। ভাষাহীন চোখ।

—দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে নতুন ধরেছে। অফিসার গলা ওঠালেন,—রোজ তো এসব কম দেখছি না। ভদ্র বাড়ির মেয়ে, দেখে তো মনে হয় বাড়িতে আপনাদের লেখাপড়া, কালচার টালচার আছে, কি করে ওইসব বজ্জাত পাংকগুলোর সঙ্গে মেশে? কিরকম বাপ মা মশাই আপনারা? মেয়ের খোঁজখবর রাখেন না?

সুবীর জয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছে। কি করে বলে তাদের মেয়েকে তারা ভয় পায়। সুবীরের বুকের ব্যথাটা হঠাৎই চাড়া দিয়ে উঠল।

—আজকের মত ছেড়ে দিচ্ছি। নিয়ে যান। এবার কিছু নোট্‌ফোট করলাম না। ডিউটি অফিসারের বোধহয় সুবীর জয়াকে দেখে এবার করুণা হয়েছে। গলার স্বর কোমল হল,—এখনও সময় যায়নি। একটু গাইড করুন মেয়েকে। আমিও তো বাবা। আমারও ওই বয়সী একটা মেয়ে আছে। বুঝি কোথায় লাগে। তার ওপর মেয়ে বলে কথা,...বড় হয়ে গেছে। কত কি ঘটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারে জানেন ? বলতে বলতে গলা আরও নামিয়েছেন,—কি অবস্থায় পেয়েছি ওকে জানেন ? ওপেন এয়ারে রক ফক কি সবের ফাংশন চলছিল, তার একটু দূরে ওই দুটো পাংকের সঙ্গে লেকের ধারে জড়াজড়ি করে পড়েছিল। নেশায় বুঁদ হয়ে। ছি ছি ছি।

সুবীর জয়ার কানে যেন কেউ গরম সিসে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। জয়ার মনে হল এসব শোনার পরও সে বেঁচে আছে কি করে ? সুবীরের চোখ মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখার দিকে। কী ভীষণ উত্তাপ !

ডিউটি অফিসার হাত নেড়ে ডাকলেন বৃষ্টিকে,

—অ্যাই, এদিকে শোন, এসো এখানে।

বৃষ্টি উঠল না। বোবা চোখে প্রতিক্রিয়াই হল না কোন।

রাজীব জুল-জুল করে তাকাচ্ছে চার পাশে। ডিউটি অফিসারের দিকে চোখ পড়তে জড়ানো প্রশ্ন করল,

—আমি ?

—না, তুই না। তোর বাপ্ তো এখনও এল না। যদি না আসে তুই আজ গেছিস্।

বলেই ডিউটি অফিসার হাসি হাসি মুখে সুবীরের দিকে ফিরলেন,

—দেখেছেন মেয়ের অবস্থা ! ব্রাউনসুগার নিয়েছে। এখন ঘণ্টাতিনেক মুখে বাক্যি আসবে না। প্রথম দিনের কিক্ তো। তবে বুঝছে সব। একটু আগে তো কাঁদছিল ফোঁচ ফোঁচ করে। কি পড়ে আপনার মেয়ে ?

জয়া অস্ফুট উচ্চারণ করল,—ফার্স্ট ইয়ার। হিস্ট্রি অনার্স।

—কোন্ কলেজ ?

—প্রেসিডেন্সি।

—বাহ্ ! কি মেয়ের কি অধঃপতন !

ডিউটি অফিসার কপাল চাপড়ে হায় হায় করে উঠলেন।

—গাড়ি আছে সঙ্গে ?

সুবীর মাথা নাড়ল। আছে।

—যান্, মেয়েকে দুজনে মিলে ধরে তুলে নিয়ে যান। ফর হেভেনস্ সেক, ওই মেয়েকে আর যেন থানায় দেখতে না হয়। তাহলে কিন্তু আপনাদের কপালেও দুঃখ আছে।

এর পরও দুঃখ বাকি থাকে !

সুবীর মেয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জয়াও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে দু'হাত ধরে টেনে তুলেছে মেয়েকে। বৃষ্টির বোধহীন চোখে ভাষা ফুটল। স্বপ্নের মধ্যে বাবা মার হাত ধরে হাঁটছে। হাঁটছে...হাঁটছে...দু চোখ টলটল করে উঠল। এত বছর ধরে তবে কি এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিল সে!

গাড়ির সামনে এসে সহসা ঘোরটুকু কেটে গেছে। এই স্বপ্ন তো মুহূর্তের।

গোটা রাস্তা বৃষ্টি গাড়িতে কাঠ হয়ে বসে রইল। প্যান্টশার্ট পরা রক্ত মাংসের স্ট্যাচুর মত। গাড়ি থেকে নেমে দুজনকেই ঠেলে সরিয়ে, সুধার হাত ধরে চলে গেছে নিজের ঘরে। একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না।

জয়া ডাইনিং টেবিলে এসে বসে পড়ল। এতক্ষণ ধরে বাঁধ দিয়ে রাখা কান্না প্রবল বেগে ছিটকে আসতে চাইছে। টেবিলে মাথা রেখে হুহু করে কেঁদে ফেলল জয়া।

সুবীর ভেতরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে গিয়ে গাড়িতে বসেছে। বেশ খানিকক্ষণ স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে বসেই রইল। তারপর কাঁপা হাতে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

॥ ১৭ ॥

সায়নদীপের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না বৃষ্টি। দু-তিন দিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যেন মুখোমুখি না হতে হয়। কিন্তু আজ এমনভাবে ঝট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল!

শহর জীবনের একটা মস্ত গুণ অনেক ঘটনা দিনের আলোতে ঘটলেও অপ্রকাশ্য থেকে যায় বহু দিন। তেমন আবার বড় দোষ যত গোপনেই ঘটে যাক না কেন, বিশেষ করে সেই ঘটনায় যদি কেলেংকারির গন্ধ থাকে, কেউ না কেউ তার সাক্ষী থাকবেই। সেদিন রাত্রি একটার সময় থানা থেকে ফিরলেও বৈশাখের খোলা জানলা দিয়ে এক আধটা চোখ উঁকি দেয়নি, এ তো হতেই পারে না। অবিনাশবাবুর ছেলের বউ অথবা বৃদ্ধ বিশুদাদু নিদেনপক্ষে কোন মানদা বা রামু। বৃষ্টি সেটা জানে বলেই কেমন একটা লজ্জা ভর করেছে তাকে। অথচ তার তো এমন হওয়ার কথা নয়। সেই রাতই বৃষ্টির নেশা করে ফেরার প্রথম রাত নয়। আগেও অনেক বেসামাল অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। তার জন্য তার কোন লজ্জাবোধ ছিল না, আত্মগ্লানি তো নয়ই।

পুলিশে ধরার পরেই বৃষ্টি বুঝতে পারল, সংকোচ কুণ্ঠা সবটুকু বোধহয় এখনও মুছে দিতে পারেনি সে। নাহলে পুলিশ অফিসারের অশ্রাব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গালিগালাজে, নেশার ঘোরেও, কেন অপমানিত বোধ করছিল !

সে প্রথমে বাড়ির ঠিকানা, ফোন নাম্বার বলতে চায়নি। পুলিশ অফিসার রুল তুলে ভয় দেখিয়েছিলেন তাকে,

—লেকে বসে পাতা খেয়ে ছেলেদের সঙ্গে লদকালদকি করার সময় বাড়ির লোকের কথা মনে ছিল না ? এখন তাদের নাম শুনেই খুকিপনা ? ন্যাকামো ? একটা রুলের ঘা পড়লে...

শুধু অপমান নয়, ভয়ও অসাড় স্নায়ুর ভেতর শুঁয়োপোকার মত ওঠানামা করছিল সে সময়। ফোন নাম্বার বলার পর বার বার মনে হচ্ছিল কতক্ষণে মা আসবে ; তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে ওই নরক থেকে। মার আগে বাবা এল।

বাবা মার অমন বিবর্ণ পাংশু মুখ, বাবা যেন এক ভাঙাচোরা মানুষ, মা দুমড়ে যাওয়া প্রতিমা, কল্পনারও অগোচরে ছিল বৃষ্টির। তুরীয় অবস্থাতেও মনে হচ্ছিল বিধ্বস্ত দুটো মানুষ তাকে কালো খনির অন্ধকার থেকে তুলতে এসেছে। এখন সায়নদীপের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, এই ছেলেটাও কি পূর্বাভাস পেয়েছিল কিছু ? নাহলে সেদিনই বা ওরকম ইঙ্গিত করে কি করে ?

দগ্ধ দিনের পর বৈশাখের উত্তাপ কমাতে ফিনফিনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। বৃষ্টি মাথা নিচু করে জিজ্ঞাসা করল,

—তোমাদের বাড়িতে নাকি দু-তিন বার ডাক্তার এসেছিল ? সুধামাসি বলছিল। তোমার মার কি শরীর খারাপ ?

—তা জেনে তোমার কি লাভ ? নিজের বাড়ির লোকেদের ব্যাপারেই তোমার চিন্তা আছে কোন ?

বৃষ্টি মুখ তুলল,—কেন থাকবে ? কেউ তো খারাপ নেই।

নিজের কথাতে নিজেই আজ তেমন সায় পেল না বৃষ্টি। যেন কথাটা তার মনের কথা নয়।

সায়নের মুখে বিদ্রূপের হাসি। বৃষ্টি সব সময় এমন হাবভাব করে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মানসিক অবস্থা তার নখদর্পণে। সমগ্র মানুষজাতির সুখের সমুদ্রে বৃষ্টি যেন একাই শুধু নিঃসঙ্গ দুঃখের দ্বীপ।

পার্কের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়েছে দুজনে। পিকলু রনিরা পার্কের ঘাসে বসে আড্ডা মারছে। বৃষ্টির সঙ্গে সায়নের কথা বলা, মাখামাখি তারা পছন্দ করে না। সায়নের মত ছেলে বৃষ্টির সঙ্গে মিশবে কেন ?

সায়ন বলল,—খারাপ নেই ? নিজের মা বাবার কতটুকু খবর রাখো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানো তাদের অবস্থা ?

ভেতরে রাগ দপ্ করে উঠলেও বৃষ্টি রাগতে পারল না,—এটা আমার পারসোনাল ব্যাপার নয় কি ?

—যখন একটা কলেজে পড়া মেয়ে রোজ রাত দশটায় বাড়ি ফেরে, মাঝে মাঝে টলতে টলতে, তখন ব্যাপারটা পারসোনাল থাকে না। তোমার কি মনে হয়, যখন কোন বাবা মা ড্রাগ নেওয়া মেয়েকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসেন, তখনও ব্যাপারটা পারসোনাল থাকে ?

বৃষ্টি কোণঠাসা বেড়ালের মত তাকিয়ে। সায়ন ভ্রূক্ষেপও করল না,

—কি এত দুঃখ তোমার ? বাবা মার ডিভোর্স হয়ে গেছে ? স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারেননি, আলাদা হয়ে গেছেন। সেটা সম্পূর্ণ তাঁদের পারসোনাল ব্যাপার। এই যে রনির মা বাবা সকাল-সন্ধে দু'জনে দু'জনকে অভিশাপ দ্যান্, এটাই ঠিক ? এক সঙ্গে থাকা কি দু'জনে দু'জনকে দুরমুশ করার জন্য ?

কোণঠাসা বেড়াল আর সংযত থাকতে পারল না। রাস্তার আলোয় তার ছায়া মৃদু কাঁপছে,—রনির বাবা মা আলাদা হয়ে গেলেই সব সমাধান হয়ে যেত ? রনির বাবা আরেকটা বিয়ে করে ফেলতেন আর রনির মা...

—তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন ?

—করেছেন মানে ? একটা ছেলেও আছে। মার নেহাত হয়ে ওঠেনি তাই। নইলে আমি ওদের কে ? ফালতু।

সায়ন নয়, যেন নিজের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়েছে বৃষ্টির।

সায়ন বলল,—ও। সেই জন্য তুমি মদ খাও ? ড্রাগ নাও ? একটা গ্রোন্আপ মেয়ে তার এতটুকু বোধ নেই, কোন মানুষই শুধু স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে পারে না। নিজের মত করে আরেকবার জীবনটাকে গড়ে তুলতে চাওয়া অন্যায় ? অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে সারা জীবন আপস করে চলতে হলে তার পরিণতি কি হয় জানো ? জানো না। আমি জানি। তুমি তো জান আমার বাবা মারা গেছে, কিভাবে মারা গেছে জানো ? সায়নের স্বরে উত্তেজনার ছাপ।

বৃষ্টি বলল,—পিকলু রনিদের কাছে শুনেছিলাম। অ্যাক্সিডেন্ট।

—না। পিকলু রনি কিছুই জানে না। আমার বাবা সুইসাইড করেছিল। কেন করেছিল জানো ? মায়ের চাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে।

অতর্কিতে ধাক্কা খেয়েছে বৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়নের গলা কেঁপে গেছে,—আমার মাকে তো দেখেছ ? মনে হয়নি শান্ত, ঘরোয়া ? আমার মা কিরকম ছিল জানো ? অত্যন্ত লোভী, স্বার্থপর টাইপ। নিজের সুখ ছাড়া কিচ্ছু চিনত না পৃথিবীতে। শুধু টাকা, গয়না, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিআর...। মায়ের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে ঘুষ নিতে শুরু করেছিল বাবা। লোভ বাড়তে বাড়তে ক্যাশ থেকে চুরি। ধরাও পড়ল। তারপর অ্যারেস্ট, হাজত, সাসপেনশন্। যেদিন বেলে ছাড়া পেল তার পরের দিনই ট্রেনে গলা দিল বাবা। এরকম বাবা মার ছেলে হয়ে কি করা উচিত ছিল আমার ? ছিনতাই ? ওয়াগন ভাঙা ? মদ ? ড্রাগ ? তোমার বাবা মা তোমার জন্য ভাবেননি, তাই তোমার এত অভিমান, এত দুঃখ। আর আমার ? চোর বাবা আর লোভী মাকে দেখে কি শিক্ষা পেতে পারতাম আমি ?

আমূল বদলে গেছে সায়ন। অন্য কেউ যেন সায়নের গলায় কথা বলছে। পূর্বপুরুষের পাপের কথা, অসহিষ্ণুতার কথা, অনুশোচনার কথা, সন্তাপের কথা।

—আমি কিন্তু বাবা মার ওপর রাগ করে বসে থাকিনি। ওই ঘটনার পর মা একদম পাল্টে গেছে, বুঝতে পেরেছে অন্যের ওপর নিজের লোভ লালসা চাপিয়ে দিলে কি হয়। আমার বাবার সেই ডেডবডিটার মুখ আমি এখনও চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর...শ্মশানের হাওয়ায় চাদর উড়তেই বীভৎস মুখ...ক্ষত বিক্ষত...

হঠাৎই নিজের অজান্তে সায়নের হাত চেপে ধরেছে বৃষ্টি। সায়নের চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করছে।

সায়ন মুখ ঘুরিয়ে নিল,

—আমি তো সেই পুরনো দুঃখ আঁকড়ে ধরে বসে থাকিনি। একটাই তো জীবন মানুষের। সেটাও যদি অন্যের অপরাধের বিচার করতে গিয়ে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শেষ করে ফেলি তবে আমার রইল কি ? বাবা মার ডিভোর্স হয়ে গেছে বলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে হয়ত অস্বস্তি হয়েছে, এড়িয়ে যেতে চাও তাদের আর আমার বাবার অ্যারেস্ট হওয়ার খবর নিউজপেপারে বেরিয়েছিল। স্কুলে সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাত। যেমন চিড়িয়াখানায় দেখায় আর কি। একটা বন্ধুও ছিল না আমার। নট এ সিঙ্গল্ ওয়ান। কাউকে মনের কথা বলতে পারিনি। নিজের মাকেও না। এ পাড়ায় এসে তাও দু-একজনের সঙ্গে মিশতে পারি, কথা বলতে পারি। কতটা রাগ হওয়া উচিত ছিল আমার ? বাবা মার ওপর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূক্ষ্ম সর্ষে দানার মত কষ্ট বুকের ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে বৃষ্টির। এই বয়সের একটা ছেলে এক দিনের জন্যও বুঝতে দেয়নি কি ভয়ানক এক অন্তর্দাহের পাহাড় বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ ! তাই বোধহয় ছায়ার মত পাহারা দিতে চেয়েছে বৃষ্টিকে। তার খারাপ হওয়ার ইচ্ছাগুলোকে। তার যন্ত্রণা পাওয়ার শৌখিন খেলাটাকে।

সায়ন রেলিঙে ভর রেখে নিশ্চল।

ঝুপ করে আলো নিভে গেল। অনেক দিন পর আজ আবার লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক অন্ধকার দুটো ছায়াকে আরও আবছা করে দিয়েছে।

বৃষ্টি সায়নের হাতে চাপ দিল,

—আয়াম সরি। আমি জানতাম না।

—জানার তো কথাও নয় তোমার। কিন্তু যাদের তুমি চেষ্টা করলে জানতে পারতে, বুঝতে পারতে তাদেরকেও তো তুমি...বলতে বলতে এক ঝটকায় সায়ন হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। দ্রুত চলে গেছে নিজেদের ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতর।

বৃষ্টি তবু দাঁড়িয়ে আছে। টেরও পায়নি কখন চোখে জল এসে গিয়েছে তার। রুমাল বার করে এদিক ওদিক তাকিয়ে মুছে নিল মুখটা। বাড়ির দিকে ফিরছে।

AMARBOI.COM

তিন-চার দিন কেটে গেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্য বৃষ্টিদের ক্লাস বন্ধ হব হব। বৃষ্টি ক্লাসে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে, কারুর সঙ্গে তার কথা বলতে ভাল লাগে না। বন্ধুরা তাকে দেখে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ফিসফাস করে আড়ালে,

—কি ব্যাপার বল্ তো ? সেদিন থানা থেকে কিছু ...

সবাই জেনে গেছে সেদিনের ঘটনাটা। রাজীব মারফত শুভই জানিয়েছে। ক'মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া বৃষ্টির আবার কি হল ! এ কি কোন নতুন পর্বের সূচনা !

সুদেষ্ণা বলেছে,—থাক গে। ঘাঁটাস না ওকে। কি বলতে কি উল্টোপাল্টা বলে দেবে। যা চণ্ডালের মত রাগ !

দেবাদিত্য বার বার ভেবেছে, তাদের কি কিছুই করার ছিল না ? চোখের সামনে মেয়েটা ভুল রাস্তায় চলে গেল। ভেবেছেই শুধু, সাহস সঞ্চয় করে বৃষ্টিকে গুছিয়ে বলতে পারেনি কিছুই। তার ভাবনাগুলো সব ভাবনার স্তরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে যায়। প্রকাশ করতে গেলেই ঠাট্টা হয়ে পড়ে।

শুভই সাহস করে কথা বলার চেষ্টা করেছিল দু-এক বার।

—তুই রাজীবদের সঙ্গে সেদিন ড্রাগ নিতে গেলি কেন? দেখেছিস্ তো আমিও ওদের অ্যাভয়েড করি আজকাল।

বৃষ্টি শুকনো চোখে তাকিয়ে থেকেছে। সন্ধ্যার আড্ডাটা একবারের জন্যও আকর্ষণ করেনি তাকে। কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে। বাস থেকে নেমে বার বার এদিক ওদিক তাকায়। পার্কের ভেতরে, বাইরে, রাস্তায়, ফুটপাথে কোথথাও সায়ন নেই। সেদিন হনহন করে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর কর্পূরের মত উবে গেছে শহর থেকে।

বৃষ্টি পর দিনই, রাস্তায় না দেখে, গিয়েছিল সায়নকে খুঁজতে।

করবী বৃষ্টিকে আদর করে ডেকেছিল,

—এসো। কেমন আছ তুমি?

বৃষ্টি অবাক। সায়নের মা এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন একদিন নয়, বৃষ্টি তাঁর অনেক দিনের চেনা।

বৃষ্টি করবীকে দেখে ভাবছিল এই সেই মহিলা যার কথা বলতে গিয়ে সায়ন... !

AMARBOI.COM

—সায়ন নেই?

—না। বুবলু তো আজ সকালেই দিশেরগড় চলে গেল খেলতে। এসো না, ভেতরে এসো।

—না। আজ যাই। বৃষ্টি ইতস্তত করেছিল,—কবে ফিরবে সায়ন?

—ঠিক নেই। আমার শরীর ভাল নেই বলে যেতেই চাইছিল না। ক্লাবের সবাই জোর করল, প্রসপেক্টের ব্যাপার, ওখানে নাকি টাটার স্পটার আসবে।

—আপনার এখন শরীর কেমন?

—এখন আমি ভালই আছি। যাওয়ার আগে শাসিয়ে গেছে, যেন ঘর থেকে না বেরোই। আমিও দিব্যি ছুটি নিয়ে বসে আরাম করছি।

—তাহলে দু-চার দিনের মধ্যে ফিরছে না?

—কে জানে। টিম্ হেরে গেলে হয়ত পরশুই ফিরে আসবে। নইলে আরও কয়েক দিন...

কত দিন? আর কত দিন? বৃষ্টির যে এখখুনি সায়নকে দরকার। হারছে না কেন? হেরেও তো ফিরে আসতে পারে।

বাড়িতে ফিরে বৃষ্টি সারাক্ষণ সায়নের কথাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যিই কি বৃষ্টির বেঁচে থাকা, বৃষ্টির জীবন, অন্যেরা তার সঙ্গে কি রকম আচরণ করছে তার ওপরেই নির্ভর করবে ? সে কি একটা শিশু ? বাবা হাঁটতে হাঁটতে হাত ছেড়ে দিল, সে পড়ে গেল। মা হাত ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল, বৃষ্টি দাঁড়িয়ে রইল। যেন নিজের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই গড়ে ওঠেনি তার !

বৃষ্টির প্রতি দিনই মনে হয় আজ তাকে বাবা ফোন করবে। সুধাকে জিজ্ঞাসা করেছে দু একবার। ভালমামার ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে সন্ধেবেলা। অ্যানুয়াল পরীক্ষা নিয়ে টুকিটাকি আলোচনা করেছে। সব সময় চাপা অস্থিরতা, বাবার ফোন আসবে। টেলিফোন বাজলে চমকে উঠেছে। কার সঙ্গে কথা বলছে মা, ভালমামা বা সুধামাসি ?

জয়ার সঙ্গে বৃষ্টি মুখোমুখি হয়েছে খুবই কম। কয়েকবার মনে হয়েছে মা বুঝি কিছু তাকে বলতে চায়। জয়া কয়েক পলক থমকেছে। বৃষ্টিও। তারপর দুজনে দু দিকে চলে গেছে। জয়ার রাতের খাবার সুধা স্টুডিওতেই দিয়ে আসে। এক সঙ্গে টেবিলে বসে খাওয়ার পাট এ বাড়ি থেকে উঠে গেছে।

বৃষ্টির কান্না পায়। মা যেন আর কোনদিনই কথা বলবে না বৃষ্টির সঙ্গে ! বাবাও আর জীবনে কখনও ফোন করবে না।

এখন একা একা বৃষ্টিকে সারা রাত শুধু জাগতে হবে।

AMARBOI.COM

॥ ১৮ ॥

থানা থেকে ফেরার পর সব শুনে রীতা যে অত রেগে যাবে সুবীর ভাবতেও পারেনি।

—হল তো ? আমি জানতাম ওই মেয়ে বাপ মাকে না ফাঁসিয়ে ছাড়বে না।

সুবীর থামানোর চেষ্টা করেছিল। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না তার। বৃষ্টি কি ভাবে ঘোলাটে চোখে তার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল ! এই অভিমান কি শুধু সে মেয়ের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়নি বলেই ? যদি তাই হয়, তবে তাকে যে কোন একটা জীবন বেছে নিতে হবে। হয় মেয়ের ভবিষ্যৎ, নয় এভাবে ধুকপুক ধুকপুক করে, এক পা জলে ডুবিয়ে, অন্য পা জমিতে রেখে, কোনরকমে বেঁচে থাকা। সারা রাত সেদিন জেগে কাটিয়েছিল সুবীর।

পর দিন সকাল থেকেই ভেবেছে মেয়েকে ফোন করে। বৃষ্টির সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া খুব দরকার। রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়েছে, ফোর সিক্স ফাইভ সেভেন....অর্ধেক নম্বর ঘুরিয়ে থেমে গেছে। মেয়ে যদি ফোন না ধরে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই ধরবে না। ফোন করার আগেই তাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সুবীর সারাক্ষণ রীতা আর রাজার সামনে বসে রইল। বার বার সে রাজাকে দেখছিল। কী ঘন কালো চোখের পাতা, মায়াকাড়া জাপানী পুতুলের মত মুখ। রীতাও কেমন নিরুদ্বেগ।

সুবীরের সিদ্ধান্তটা বার বার পিছলে যাচ্ছিল। রীতা জয়া নয়। রীতার নিজস্ব কোন চাহিদা নেই, নিজস্ব কোন লক্ষ্য নেই, নিজস্ব কোন স্বপ্ন পর্যন্ত নেই। যা কিছু আছে সবই সুবীরকে কেন্দ্র করে। অথবা রাজাকে। উদ্বেগহীন মানুষকে কি নির্মম আঘাত করা যায় ?

আরও কয়েকটা দিন দ্বিধায় কেটে গেল সুবীরের।

রীতাও বোধহয় কিছু আঁচ করতে পারছিল। কদিন ধরেই সুবীর কি যেন ভাবে সর্বক্ষণ। যেন কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রীতা ধৈর্য রাখতে পারল না,

—কি ভাঁজছ বলো তো কদিন ধরে ?

সুবীরের দৃষ্টি শূন্য।

রীতা আবার প্রশ্ন করল,

—কি চাও বলো তো পরিষ্কার করে।

সুবীর হঠাৎই মরিয়া। যদি রীতাকে রাজি করানো যায়।

—মানে বলছি আর কি, তুমি যদি মাস দুয়েকের জন্য রাজাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ঘুরে আসো...

—কেন ?

—না, এমনিতেও তো রাজার বড় একটা মামারবাড়িতে যাওয়া হয় না। আমি সে কদিন বৃষ্টিকে এখানে এনে, মানে এই দুমাসে.... মেয়েটার নেশা টেশা যদি ছাড়ানো যায়.....

রীতা হতবাক মুখে সুবীরের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ঠিক এই কথা একদম আশা করেনি। ছ বছরেও মানুষটা তার আপন হল না। কত নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করল কথাটা। যে নিঃসঙ্গ সুবীরকে সে বিয়ে করেছিল, তার অনুরাগ, আবেগ সব মরে ভূত হয়ে গেছে। ছোটবেলায় দেখা শীতকালের হুড়ু ফলসটার কথা মনে পড়ল রীতার। এক গভীর নিঃস্ব জলপ্রপাত। জলের দাগ আছে, অস্তিত্ব নেই। সে না হয় এখন ব্যবহার করা একটা পুরনো শরীর। কিন্তু রাজা ! রাজাকেও তেমন করে সুবীর ভালবাসতে পারল কোথায় ! বৃষ্টিই সবটুকু জুড়ে বসে আছে। বৃষ্টি ! না বৃষ্টির মা ! মেয়ের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে সুবীর বোধহয় এখনও মাকেই খোঁজে। এ নিয়ে যুদ্ধ করা ছায়ার সঙ্গে লড়তে যাওয়ারই সামিল। ছায়াকে যুদ্ধে জিততে দেবে না রীতা।

রীতা মুখ ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করল,

—কবে যেতে হবে ? কাল, না আজই ?

সুবীরের মুখে মুহূর্তের জন্য রঙমশাল জ্বলে উঠল। রীতা এত সহজে রাজি হবে ভাবতেও পারেনি। সুবীর রীতার হাত জড়িয়ে ধরল,

—তুমি... তুমি আমাকে.....

রীতা হাত ছাড়িয়ে নিল।

—আজ গোছগাছ করে নিই, কাল সকালেই চলে যাব।

সত্যি সত্যি রীতা জামাকাপড় গোছানো শুরু করল সে রাত্রেই। নিজের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, স্যুটকেসে থাক থাক সাজাল, ছেলের জামাকাপড় একটা একটা করে ভাঁজ করে তার ওপর। ওইটুকু ছেলে কি বুঝল কে জানে, সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরে আছে রীতাকে। বাবার দিকে সভয়ে তাকাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়ছে মার পিছনে।

সুবীরের বুকটা মুচড়ে উঠল। একি দেখছে সে ! রাজা তো নয়, যেন বৃষ্টি জয়াকে আঁকড়ে ধরে আছে। মেয়ের চোখে আতঙ্ক।

পলকে সুবীরের কি যে হয়ে গেল। মনে হল ভীষণ জোরে কেউ মুগুর চালাচ্ছে তার বুকে। সেই আঘাত তীব্র যন্ত্রণা হয়ে কাঁকড়াবিছের কামড় বসাল হৃৎপিণ্ডে। গলগল করে সুবীর ঘামতে শুরু করল। বুক চেপে কোনক্রমে বসে পড়ল বিছানায়।

রীতা প্রথমটা খেয়াল করেনি। রাজা ডুকরে ওঠায় চমকে তাকাল,

—একি ! কি হল তোমার ! অত ঘামছ কেন ?

সুবীরের মুখ থেকে অস্ফুট কিছু শব্দ ছিটকে এল। অনেক কষ্টে বুকটাকে দেখাতে পারল শুধু।

রীতা কম্পিউটারের গতিতে মস্তিষ্কে ছকে ফেলল তাকে এখন কি কি করতে হবে। প্রথমেই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে ফোন করল। এখখুনি আসুন।

ডাক্তার এসেই ই সি জি করল। অ্যাটাক তত মারাত্মক নয়। হৃদয়ে ধাক্কা লাগলেও প্রাচীর এখনও অক্ষত। বেশ কয়েক দিন বিশ্রাম প্রয়োজন। টোটাল বেডরেস্ট। শরীর ও মনের। ডাক্তারবাবুর মতে ওয়াচে রাখার জন্য এখন কিছুদিন নার্সিংহোমই নিরাপদ।

রীতা ঠিক এই আশঙ্কাটাই করছিল। যেভাবে মনের ভেতর উত্তাল ঝঞ্ঝা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে সুবীরের। ভয়ঙ্কর রাগ হল বৃষ্টি আর জয়ার ওপর। সুবীরকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত ওদের বোধহয় শান্তি নেই।

মস্তিষ্কের ছক মতই প্রথম দিন খবর দিল না বৃষ্টিকে। বাপের বাড়িতে টেলিফোন করল, ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িতে খবর পাঠাল বিজয়কে দিয়ে। ছোট বোন আর মা খবর পেয়েই তার কাছে চলে এসেছে, বাবা ভাই নার্সিংহোমে দৌড়াদৌড়ি করছে, বোন অফিস কামাই করে দু দিন ধরে সামলালো রাজাকে। প্রবীর, প্রবীরের বউও ছুটে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

সুবীর কোন সময়ই পুরোপুরি জ্ঞান হারায়নি। কড়া ট্র্যাংকুলাইজার তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে মাত্র। ঘুম ভাঙলেই তার চোখ কাউকে খুঁজছে। রীতা হাঁ হাঁ করে উঠছে,

—উঁহু, কোন কথা নয়। এখন একদম কথা নয়। পরে সব শুনব। প্লিজ।

রীতার বাবা বললেন, —হ্যাঁরে, এরকম হঠাৎ কেন হল রে! এত সুস্থ সবল ছিল!

প্রবীর বলল,— সেদিন অফিসেই ওর মুখচোখ আমার ভাল লাগেনি। আমি জানতাম একটা কিছু.....

রীতার একবার মনে হল বাবাকে সব কথা খুলে বলে। পারল না। তার স্বামী আগের পক্ষের মেয়ে নিয়ে বিষম সমস্যায় আছে, তাকে চলে যেতে বলছে বাড়ি ছেড়ে, এ কথা বলে বেড়ানো তার পক্ষে খুবই অপমানজনক। আত্মমর্যাদা নেই তার? বিয়ের ছ বছর পর বাবা মাকে কি বলা যায় কি ভয়ঙ্কর নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সে? হয় ওই মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সুবীরকে, নয়ত মানুষটা নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধে মরবে যার পরিণাম হবে এইরকম। এই ভবিতব্যই কি তার ভাগ্যে লেখা ছিল?

সুবীরকে অবশ্য আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি ভুলিয়ে রাখতে পারল না রীতা। তৃতীয় দিনই সুবীর প্রশ্ন করল,

—বৃষ্টি আসেনি? বৃষ্টিকে খবর দিয়েছ?

কি নিষ্ঠুর লোক। রাজা নয়, সুবীর বৃষ্টিকে খুঁজছে। রীতা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো,

—কাল সবাই খুব ব্যস্ত ছিল তো, তাছাড়া তোমার অফিসের লোকজন এসে গেল অনেক, আজ ফোন করে দেব।

কথাটা বলেই রীতা বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে। সুবীর তার দিকে নির্নিমেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে। রীতা অফিসে ফোন করেছে, নিজের বাবা মাকে ডেকেছে, প্রবীরদেরও খবর পাঠিয়েছে, শুধু বৃষ্টিকেই.....

রীতার মা বললেন,— ঠিকই তো, মেয়েটাকে খবর দিসনি তুই ?

রীতা কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইল। তারপর ফোন করল নার্সিংহোম থেকেই।

টেলিফোন পেয়ে বাবলু প্রথমে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল। সুবীরদার মত প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষের হার্ট অ্যাটাক ! একটু সময় নিয়ে প্রশ্ন করল,

—কবে হয়েছে বললেন ? তিন দিন আগে ?

—হ্যাঁ, ...মানে ডাক্তাররা বলছিলেন খুব একটা ভয়ের কিছু নেই তাই..... হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে ছেড়েও দেবে।

বাবলু ফোন রেখে কয়েক মিনিট চুপ করে চিন্তা করল। খবরটা কাকে আগে দেবে ? জয়া ? না বৃষ্টি ? বৃষ্টি এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে তবু কিভাবে সে খবরটাকে নেবে কে জানে !

বাবলু হুইল চেয়ার চালিয়ে জয়ার ঘরেই ঢুকল।

AMARBOI.COM

॥ ১৯ ॥

বৃষ্টির হাত বুকে চেপে চুপ করে শুয়ে আছে সুবীর। বাথাটা তার এখন অনেক কম।

গতকাল সকালেই টেলিফোন পেয়ে বৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছিল নার্সিংহোমে। করিডোরে দাঁড়িয়ে রীতা তখন কথা বলছিল প্রবীরের সঙ্গে। রীতার চোখের নীচে কাজলের চেয়েও ঘন কালো দাগ, দেখেই বোঝা যায় তার ওপর দিয়ে একটা বড় সড় ঝড় বয়ে গেছে। প্রবীরের হাতে ছোট্ট একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। মুখে অশান্ত উদ্বেগ। প্রবীর উত্তেজিত ভাবে বলছিল,

—কেন, এখনও লিকুইড্ ডায়েট কেন ? ডাক্তার তো কাল বলছিলেন এবার একটু একটু করে... মা সেই জন্যই তো গলা মুরগি পাঠিয়ে দিল। এটা দিতে অসুবিধে কি আছে ?

রীতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামনে হঠাৎ বৃষ্টিকে দেখেই সে ত্রাসতাড়িত।

বৃষ্টি চঞ্চল চোখে তাকাল,

—কেমন আছে বাবা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীতা তাড়াহুড়ো করে বলে ফেলল,—একটু বেটার। তুমি যাও না ভেতরে গিয়ে দেখে এসো। এমন ভাবে বলল যেন বৃষ্টি চোখের সামনে থেকে সরে গেলেই সে বাঁচে।

প্রবীর নির্বাক হয়ে দেখছিল বৃষ্টিকে। কত দিন পর দেখল তাদের বাড়ির মেয়েটাকে ? প্রায় ন দশ বছর। সময় কি দ্রুত সব বদলে দেয় ! শুককীট থেকে রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলেছে। প্রবীরের হঠাৎই মনে হল, এ মেয়েকে বোধহয় তাদের ন্যায়রত্ন লেনের গলিতে মানাতও না। ওখানে আলো বাতাস এত কম !

বৃষ্টি ততক্ষণে পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়েছে। ঢুকতেই নাকে মৃদু ওষুধের গন্ধ। সাদা চাদরে ঢাকা সুবীরের লম্বা ফর্সা শরীর যেন বিছানায় নিষ্প্রাণ, মুখ জানলার দিকে ফেরানো। আকাশ দেখছে। টানা পর্দার ফাঁক দিয়ে, কাঁচের শার্সির ওপারে, যতটা আকাশ দেখা যায় ততটুকুই। গোটা আকাশটাকেই যে হাতের মুঠোয় ধরতে চেয়েছিল, তার ওইটুকু আকাশের ফালিই সম্বল এখন।

খুব আস্তে, যেন দেওয়ালও না শুনতে পায়, এভাবে ডেকেছে বৃষ্টি,

—বাবা...

সুবীরের মুখ ঘুরল, এক পলক খুঁজল শব্দের উৎসকে, তারপরেই বৃষ্টির দিকে চোখ আটকেছে। সঙ্গে সঙ্গে বুক উথলে উঠেছে তার। পরক্ষণেই প্রবল ভয়ের আলোড়ন। মুখ বিকৃত হয়ে গেল, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল সুবীর।

বৃষ্টিও আতঙ্কে জমে গেছে। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই ছুটে এসেছে বাইরে,

—তাড়াতাড়ি এসো, বাবা কিরকম করছে !

প্রবীর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল ডাক্তারকে খবর দিতে। রীতা ধড়মড় করে সুবীরের কেবিনে। তার মিনিটখানেকের মধ্যেই নার্স। কর্তব্যের সঙ্গে বিরক্তির ঝাঁঝ মিশিয়ে বলেছিল,

—আপনারা বাইরে দাঁড়ান। ডক্টর আসছেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি আর রীতা। পাশাপাশি। দুজনের মনেই তখন এক চিন্তা, তবু দুজনের মন যেন কত আলোকবর্ষ দূরে। দুজনেই চায় কেবিনের ভেতরের মানুষটা ভাল হক, সুস্থ হক, একজনের বুকে অজানা ভবিষ্যতের জন্য একরাশ আশংকা, অন্যজনের মধ্যে জমে থাকা অপরাধের গ্লানি। বৃষ্টির মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল, সেই কি তবে তার বাবার একমাত্র মানসিক চাপ ? সে আসতেই রীতাও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল, যেন বৃষ্টি একটা হিংস্র জন্তু। বাঘের হাত থেকে গ্রামের লোক যেভাবে নিরীহ গরু ছাগল বাঁচায়, সেভাবেই রীতা যেন আগলে রাখতে চায় সুবীরকে।

রীতাকে দোষ দিতে পারল না বৃষ্টি। গত কয়েক মাসের উন্মত্ত আচরণের প্রতিটি দৃশ্যই তার চোখের সামনে। দিনের পর দিন অত্যাচারের শাবল চালিয়ে সেই তো রীতার শক্ত মাটিটাকে আলগা করে দিয়েছে। নাহলে রীতা সুবীরের স্ট্রোক হওয়ার তিন দিন পরে খবর দেয় তাকে ! এই মহিলার ওপর বিদ্বেষ আর ঈর্ষা ছাড়া আর কোন অনুভূতি ছিল না বৃষ্টির। কিন্তু ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থেকে সত্যিই কি কিছু পাওয়া যায় ! বৃষ্টি কি পেল !

প্রবীরের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার ঢুকলেন ঘরে। বৃষ্টির কনুই-এর কাছে হাতের চাপ। রীতা নিজের অজান্তেই বৃষ্টির হাত আঁকড়ে ধরেছে। খরস্রোতা নদীতে ডুবন্ত মানুষ যেভাবে ভাসমান কচুরিপানাকেও খামচে ধরে।

নিজের মনের আশঙ্কা ছাপিয়ে হাতটার অসহায়তা ছুঁয়ে যাচ্ছিল বৃষ্টিকে। এখখুনি যদি সুবীরের কিছু হয়ে যায়, যতই কষ্ট হক, কতটুকুনি বিপদ হবে বৃষ্টির ? তার নিজস্ব আশ্রয় আছে, খাওয়াপরার চিন্তা নেই, মাকে যতই নির্লিপ্ত মনে হোক সেই মা মাথার ওপর ছাতার মত রয়েছে, রীতার কি আছে ? অভ্যস্ত সুখের জীবন ছেড়ে রাজাকে নিয়ে কিভাবে কাটাবে বাকি জীবনটা ? রীতার বাবা মার অবস্থা ভাল নয়, নিজের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে, জয়ার মত বিশেষ কোন গুণও নেই তার। হাতটা যেন এই সব কথাগুলোই বলতে চাইছিল বৃষ্টিকে। শিকড়-ওপড়ানো অসহায়তার কাছে নিজের কষ্ট, অভিমান সব কিছুই কি ক্ষুদ্র মনে হল বৃষ্টির। সে কি তবে সেই কাশীর মহিষী করুণা যে নিজের শীত কমাতে অন্যের ঘরে আগুন লাগিয়ে উত্তাপ জোগাড় করতে চেয়েছিল !

বৃষ্টিও নিজের অজান্তে হাত রেখে ফেলেছিল রীতার হাতে, —চিন্তা কোরো না, বাবা ভাল হয়ে যাবে।

মিনিট দশেক পর ডাক্তার আর প্রবীর বেরিয়ে এল,

—ঘাবড়াবার কিছু নেই, সাডেন টেনশন থেকে একটা এক্সাইট্‌মেন্ট্ এসেছিল, সিডেটিভ দিয়েছি, এখন ঘুমোবেন কিছুক্ষণ।

প্রবীর এসে বৃষ্টির মাথায় হাত রাখল,—আমাকে চিনতে পারছিস্ ? আমি তোর জেঠু।

চিনেছে বৃষ্টি। কিছু কিছু মানুষকে চিনিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলেই চিনে ফেলা যায়। বাবার সঙ্গে মিলও আছে অনেক। অতটা লম্বা ছিপছিপে না হলেও মুখের ধাঁচ একই ধরনের। একই রকম গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি।

বৃষ্টি নিজেও বুঝতে পারল না কেন যে চোখে আচমকা জল এসে গেল তার। একেই কি তবে নিকটজনের টান বলে ?

প্রবীর বলল,—মন খারাপ করছিস কেন ? তোকে দেখে সুবু একটু বেশি খুশি হয়েছিল তো...

খুশি, না ভয় ? বাবার সেই ভয়ার্ত মুখটা বৃষ্টির বুকে গেঁথে গেছে। বোধহয় চিরজীবনের মত।

সেই মুখ এখন অনেক শান্ত, স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটো অল্প নড়ে উঠছে। আলগা তন্দ্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছে সুবীর। ...একটা বাচ্চা ছেলে শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনের নিয়ন বাতি দেখছে। জ্বলছে নিভছে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন... বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বদলে হয়ে গেল স্কুলের ক্লাস। বাংলা ক্লাসে অমূল্যস্যার লিখতে দিয়েছেন, বড় হয়ে তোমরা কে কি হতে চাও। বাচ্চা ছেলেটা লিখেছে, বড়লোক হব, অনেক বড়লোক। মাস্টার মশাই বলছেন, প্রথমে টাকাটাই চিনলি রে বাপ ? পড়াশুনো করে আগে কিছু তো একটা হ, তারপর বড়লোক হবি।...ক্লাসশুদ্ধ সবাই হাসছে। সব্বাই।... দৃশ্য বদলে গেল। ছেলেটার কাঁধে পাউডার লিপস্টিকের ব্যাগ, জ্যাম জেলি আচারের শিশি, ওষুধে ভরা ভারী ব্রিফকেস্...দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে...অসংখ্য গলিঘুঁজি...হঠাৎ একটা চওড়া রাস্তার মোড়ে জয়া। রাস্তাটা ঘন সবুজ, রাস্তার দুদিকে মৃতদেহের স্তূপ ..জয়া আর সুবীর দুজনে মিলে দৌড়ল কিছুক্ষণ। তারপর অন্য রাস্তায় চলে গেল জয়া, সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে, আধফোটা ফুলের মত। বৃষ্টি।...আবার দৌড়। এবার পাশে রীতা, রাজা...কোন কোন মোড়ে আচম্বিতে দেখা হচ্ছে বৃষ্টির সঙ্গে। অজানা বাঁকে এসে এক পলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। ...আবার দৌড়...রীতা, রাজা...জঙ্গলের গাছপালার ফাঁকে বৃষ্টির মুখ...নদীর জলে ভেসে উঠল বৃষ্টির মুখ...সেই ছেলেটা ছুটতে ছুটতে আয়নায় দেখা সুবীরের মত পুরোদস্তুর লোক হয়ে গেছে...হঠাৎ তার মুখটা একটা ঘোড়ার মুখ হয়ে গেল...আবার সুবীর... বৃষ্টি নেই, রীতা নেই, রাজা নেই...ঘোড়া একা দৌড়চ্ছে সরু গলি দিয়ে...ন্যায়রত্ন লেনের গলি, অন্তহীন গলি...গলি ক্রমশ অন্ধকার হচ্ছে...ঘোড়ার মুখ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁজলা উঠছে..হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়া...

সুবীর চোখ খুলল।

বৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকেছে,

—কিছু বলবে ?

সুবীর দু'দিকে মাথা নাড়ল।

—কি অসুবিধে হচ্ছে ?

—একটু জল খাব।

মাথার পাশের টেবিলে রাখা কাটগ্লাসের জগ থেকে বৃষ্টি জল গড়িয়ে দিল। সুবীর দু চুমুক খেল মাত্র। আবার চোখ বুজেছে।

—তোর মাকে একটা কথা বলতে পারবি ?

বৃষ্টি স্থির চোখে তাকাল সুবীরের দিকে।

—তোর মার সমস্ত ইজেল, ক্যানভাস, রঙ, তুলি আমি ফেরত পাঠিয়েছিলাম তবু একটা স্কেচ আমার কাছে রয়েই গেল। আমাকে এঁকেছিল তোর মা। পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় বসে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন।

বৃষ্টিকে কেউ যেন সমূলে নাড়িয়ে দিল। বাবা মার সম্পর্ক নিয়ে তার এতদিনকার ধারণা, বিশ্বাস চিড় খেয়ে যাচ্ছে। সম্পর্কের সব সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার পরও এ কোন্ গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে আছে তার বাবা মা ! গ্রন্থিটা কি বৃষ্টি !

নাকি আরও গভীর কোন চেতনা ! বৃষ্টি বুঝতে পারছে না।

কাল রাত্রে নার্সিংহোম থেকে ফিরবার সময় দেখেছিল মা ছাদে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই নীচে নেমে এসেছিল। ভালমামা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করছে,

—কেমন আছে এখন সুবীরদা ? কি দেখে এলি ?

ভালমামার গলায় উৎকণ্ঠা। তবে তার থেকেও বেশি উদ্বেগ যেন মার মুখে। বৃষ্টির চোখে চোখ পড়তেই মা মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিজের মুখোশপরা ছবির মানুষগুলোর মতই লুকিয়ে ফেলল নিজেকে।

বৃষ্টি বলেছিল,—এখন একটু বেটার। ডাক্তার তো বলছেন ভয়ের কিছু নেই।

মা নিঃশব্দে ঢুকে গিয়েছিল নিজের ঘরে। বৃষ্টি বুঝেছিল তার জন্য নয়, তার উত্তরটা শোনার জন্যই এতক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়েছিল মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক রাত অবধি বিছানায় ছটফট করেছিল বৃষ্টি। সায়নদীপই ঠিক। শুধু একটা দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সম্পর্ককেই বিচার করা যায় না। করাটা বোকামি। প্রতিটি মানুষই কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে নিজের কাছেই অসহায়। বাবা মার ঝগড়া, হিংস্রতা, একসঙ্গে থাকতে না পারা যতটা সত্যি, ততটাই সত্যি অন্ধকার ছাদে মার একা দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বাবার কাছে গোপনে থাকা মার পুরনো স্কেচ্।

বৃষ্টি খাট থেকে নেমে পড়েছিল। শৈশবের মত কখন পায়ে পায়ে ছাদে উঠে গেছে টেরও পায়নি।

জয়ার স্টুডিওতে এখন প্রায় সারা রাতই আলো জ্বলে। বেশির ভাগ দিন স্টুডিওতে পাতা ক্যাম্বিসের খাটেই ঘুমিয়ে পড়ে জয়া। নীচে আর নামে না।

বৃষ্টি কাচের শার্শিতে চোখ রেখেছিল। চতুর্দিকে রঙের দোয়াত, টিউব, তুলি ব্রাশ নিয়ে জয়া ক্যানভাসের সামনে নিথর বসে।

অনেকদিন পর স্টুডিওটাকে দেখছিল বৃষ্টি। ধুলোপড়া কয়েকটা ক্যানভাস কোণে জড়ো করা। দেওয়ালের পিঠে অবহেলায় পড়ে বহুদিন আগের পেন্টিং। কন্টি পেনসিলগুলো ঘরময় গড়াগড়ি খাচ্ছে। জয়া কি ঝকঝকেই না রাখত তার স্টুডিওটাকে!

বৃষ্টি দেখল মার সামনে রাখা ক্যানভাসে একটা দুটো রঙের আঁচড় পড়েছে মাত্র। রঙ তুলিতে কি যেন ধরতে চাইছে মা ; পারছে না।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টির মনে নেই। হঠাৎ মা তাকিয়েছে তার দিকে। প্রথমে দৃষ্টি দূরমনস্ক, দেখছে কিন্তু দেখছে না। ক্রমে চোখ পলকহীন। সেই পলকহীন চোখ ভেদ করে চলে গেল বৃষ্টিকে। সেই দৃষ্টির টানে বৃষ্টি কখন ঢুকে গেছে স্টুডিওতে। দুজনে পাশাপাশি বাক্যহীন বসে রইল। দীর্ঘক্ষণ।

জীবন তো একটাই। সেই জীবন কতভাবেই না ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে মানুষ। জীবনের মানে খুঁজছে। নিজেদের মত করে। জয়া, সুবীর, রীতা, ফিরোজ, নিখিল, শিপ্রা, বৃষ্টির বন্ধুবান্ধব। সায়নদীপও। অন্যের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বৃষ্টিই শুধু হারিয়ে ফেলছিল নিজেকে।

সুবীর আবার চুপ করে শুয়ে আছে। বৃষ্টি তার মাথায় হাত রাখতে গেল। ঠিক তখনই রীতা এসেছে। সঙ্গে রাজা। বৃষ্টিকে দেখেই রাজা মুহূর্তে ভয়ে কাঠ। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ফর্সা মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি হাসার চেষ্টা করল।

রাজা একটুও ভরসা পেল না। মাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

বৃষ্টির চোখ ঝাপসা হয়ে এল। রাজার মুখ আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। বদলাতে বদলাতে কখন বৃষ্টির মুখ হয়ে গেল। সেই ছোট্ট বৃষ্টি। মার হাত চেপে ঠকঠক করে কাঁপছে। বাবা ফিরেও তাকাচ্ছে না।

বৃষ্টি আর দাঁড়াল না। মন্থর পায়ে বেরিয়ে এল নার্সিংহোম থেকে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। এবার বৃষ্টির জনসমুদ্রে একলা হাঁটার পালা। বৃষ্টিকে পাশে রেখে একটা লম্বা মিছিল চলে গেল। আর চারদিন পরে ভোট। বৃষ্টি এবার প্রথম ভোট দেবে।

সন্ধ্যা নামল শহরে। রাস্তার বাতিগুলো সব একে একে জ্বলে উঠেছে। সায়নদীপ।

সায়নদীপ এখনও দিশেরগড়ে। জিতছে। অবিরাম জিতছে। সায়ন হারতে জানে না। তার জন্য এই শহরে অপেক্ষা করছে বৃষ্টি। একজন দুঃখী মানুষই শুধু তার বন্ধু হতে পারে এখন।

হৃদয়ের জমা কষ্ট হৃদয়েই রয়ে গেল। থাক। অভিমান আর যন্ত্রণার দানা না হয় মুক্তো হয়েই জমা থাক বুকে। রাজা ভাল থাকুক।

আর একটাও বৃষ্টি যেন তৈরি না হয় কোথ্থাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~